সূচিপত্র।

গদ্য।

——000——

নবজীবন।

৫মভাগ। } আশ্বিন, ১২৯৫। } ১ম সংখ্যা।

দুর্গোৎসব।

একি দৃশ্য অকস্মাৎ অতি চমৎকার;
ভারত ধরিল যেন নূতন আকার!
কোথা গেল রোগ শোক,
উৎসবে মেতেছে লোক;
আচম্বিতে মুঞ্জরিত বিশুষ্ক বল্লবী;
চির দুঃখার্ণবে উঠে আনন্দ লহরি॥

তমো ঘন ঘোর নিশা যেন পোহাইল!
সৌভাগ্য আকাশে রবি গৌরবে উদিল॥
অতি অপরূপ শোভা,
জনগণ মনোলোভা,
সাজিল অখিল কিবা কনক কিরণে!
ভারত জাগিল যেন নবীন জীবনে॥

ধীর ধাবমান বনে বর্ষে সুধানীর;
সাহারে শ্যামল ক্ষেত্র দুলায় সমীর।
বিমর্ষ বিষাদ নাশে;
প্রফুল্ল প্রমোদ ভাসে;
হর্ষ হাস্য সবাকার বদন উজলে;
স্বর্গ-সুখ মর্ত্তে যেন যাদু মন্ত্র বলে॥

বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ী ঝাঁঝর কাঁসর,
নহবতে বাজে কিবা সানাই সুন্দর!
বাজে কত জগঝম্প,
দামামা ডগর ডম্ফ,
বীর দর্পে বাজে ঢাক বাজে কত ঢোল;
নভো ভেদি উঠিতেছে উৎসবের রোল।

লইয়া ধূনার ধূম চলে সমীরণ,
সৌরভে আমোদ করি ভূতল গগন;
আম্র পত্র কত দ্বারে,
দুলিতেছে মালাকারে,
সম্মুখে কদলী তরু পূর্ণ ঘট আর,
—শুভ কার্য্যে সদা সাক্ষী—শোভিতেছে দ্বার॥

কোথাও নর্ত্তকী নাচে কোথাও সঙ্গীত,
দেখিছে শুনিছে লোক হয়ে পুলকিত॥
বান্ধবের সম্মিলন,
গৃহানন্দে কত জন,
মগ্ন হয়ে গেছে ভুলে দাসত্ব অর্গল;
দেশ ব্যাপী সুখ স্রোত বহিছে কেবল॥

কিসের আনন্দ এত কিসের উল্লাস?
কেন রে ভারতে এই উৎসব উচ্ছ্বাস?
কেন এই জন রাজি,
অভিনব বেশে সাজি,
বিহারিছে, শোক তাপ দুর্গতি ভুলিয়া?
কেন এই বাদ্যোদ্যম ভুবন ভরিয়া?

নবজীবনম্

জান না জান না কি রে কেন এ আহ্লাদ ?
কেন যে ভুলেছে সবে বিক্ষোভ বিষাদ ?
যিনি দীন—দয়াময়ী,
যাঁরে সেবি রাম জয়ী ;
অনাদ্যা, আনন্দময়ী, আরাধ্যা জগতে,
সেই দেবী মূর্ত্তিময়ী আজি রে ভারতে ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দুর্গা জগৎ জননী,
পাপ তাপ দুঃখ হরা দুর্গতি দলনী,
সেই শিবা শিবঙ্করী,
এসেছেন কৃপা করি,
ভারত আকাশে তাই সুখ সূর্য্যোদয় ;
তাই রে ভারত আজি আনন্দ আলয় ॥

তাই রে সুধার স্রোত হৃদে প্রবাহিত ;
চিত্তের জলন্ত চিতা তাই নির্ব্বাপিত ॥
তাই সুখী সর্ব্বজনে,
শোক শঙ্কা নাহি মনে,
তাই এই বাদ্যোদ্যম বিজয়ের বোল ;
সমাজ সাগরে তাই হর্ষের হিল্লোল ॥

দাসত্ব দুর্গতি কারো মনে নাহি আর,
হাস্য-লাস্য শোভিতেছে [illegible] সবার ॥
কিবা ধনী কিবা দীন,
গৃহী কিবা উদাসীন,
বাল বৃদ্ধ নরনারী সবে পুলকিত ;
বিশ্বব্যাপী মহোৎসবে সকলে মিলিত ॥

এসেছেন মহেশ্বরী, মহামহোৎসব !
বিশেষ উল্লাসী তায় বঙ্গবাসী সব ॥
দেখ প্রায় প্রতি ঘরে,
চণ্ডীপাঠ ভক্তি ভরে,
করি’ লোক পুজে দেবী বিবিধ প্রথায়,
ঘটে, পটে, প্রতিমায় অথবা শিলায় ॥

অর্থদান বস্ত্রদান করে কতজন ;
কতজন করে কত ভক্ষ্য বিতরণ ॥
যেমন বিবিধ দান,
সেইরূপ নৃত্য গান,
তুষিতেছে, মোহিতেছে মানস সবার ;
মহা দিন মহোৎসব আনন্দ অপার ॥

এ হেন উৎসবে কেহ থেক না নিদ্রায়,
যোগ দেহ সবে এই অপূর্ব্ব পূজায় ॥
এই পূজা পূর্ব্ব হতে,
প্রাচীন পুরাণ মতে,
যুগে যুগে প্রচলিত পুণ্যভূ ভারতে,
হেন মহা পূজা আর নাহি রে জগতে ॥

যিনি দেবী মহেশ্বরী, যাঁহা হতে হয়
বিশ্বের সৃ[illegible] রক্ষা বিশ্বের বিলয় ॥
শক্তিরূপা সারাৎসারা,
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
চরাচর ব্যাপ্ত যিনি চির বিদ্যমান ;
শাস্ত্রে বলে, যাঁর যোগে ব্রহ্ম ক্রিয়াবান,

অদ্বিতীয়া অরূপয়া অনাদ্যা অসীমা ;
অনন্ত জগৎ যাঁর প্রকাশে মহিমা,
জ্যোতি যাঁর তমো নাশে,
যাঁর তেজে বিশ্ব ভাসে,
ভবের ভাবিনী মহা দেবী ভগবতী,
তুষিতে ভক্তের মন যিনি মূর্ত্তিমতী,

যাঁহার করুণা-বলে ত্রিদশ আলয়ে
সদানন্দে দেবগণ থাকেন নির্ভয়ে ॥
যিনি শূল লয়ে করে,
আরোহিয়া সিংহোপরে,
অসুর নাশিনী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
করিলেন পদতলে দানব দলন,

সেই মহাদেবী এই দুর্গা দশভূজা ;
ভারত করিছে আজি তাঁরি মহা পূজা ॥
যোগধ্যান কর সবে,
মহানন্দ লাভ হবে,
প্রশস্ত মানস হবে ভক্তে দেহে বল,
হইবে আপন হিত পরের মঙ্গল ॥

করুক বিধর্ম্মীগণ যতই বিদ্রূপ ;
কিন্তু ইহা মহা পূজা কহিনু স্বরূপ ;
ব্রহ্মময়ী আরাধনা,
যে পূজার সংকল্পনা,
সে পূজার পূজ্যবস্তু নহে রে পুতুল ;
যে বলে পুতুল পূজা সেই রে বাতুল ॥

অতএব এস এস মিলিয়া সকলে,
জগত জননী পূজ পূজ কুতূহলে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের পাশে,
গললগ্নী কৃত বাসে;
পুষ্পাঞ্জলী পাদপদ্মে দেহ অবিলম্বে;
উচ্চ স্বরে বল জয় জয় জগদম্বে॥

আবাহন।

আও জগ-জননী, পশুরাজ-বাহিনী, গজরাজ-গামিনী,
কামিনী রে!
চল চল লাবণী, শতদল-দলনী, দশন-জ্যোতি, জিনি
দামিনী রে!
ঘন-ঘোর—কুন্তল, তারকা—চুল-ফুল, ভানু-শশী-অনল,
লোচন রে!
অম্বর—শির-চূড়, হুঙ্কার—মেঘ-ঝড়, ঝঙ্কার—পিকবর-
বচন রে!
দশ-ভুজ বিকাশি, বিরাজ দশ-দিশি, কটাক্ষ—দিবানিশি
বিভাত রে!
নিশ্বাস পরশন, দ্রুতগতি পবন, আঁখি-উনমীলন
প্রভাত রে!
অলি-কুল-গুঞ্জিত কলি-ফুল-মুঞ্জিত, শশী-রশ্মি-বঞ্চিত
চরণ রে!
কর—বন-গৌরব, পরশন—সৌরভ, চম্পক—হেম-রাগ
বরণ রে!

প্রেমক-নিঝর, ঝরত বিঝপর, কোমলে তব ভব
কমলা রে!
তুহুঁরে বীণা-পাণি, তুহুঁরে ধন-রাণী, শকতি স্বরূপিণী
অমলা রে!
অরাতি-বিঘাতিনী, মুকতি-প্রদায়িনী, ভকতি-বিধায়িনী,
বরদা রে।
কমল-বিহারিণী, অচল-নিবাসিনী, মহেশ-সোহাগিনী
সারদা রে।
অলসি-শশী পরি, নলিনী-হৃদে ধরি, ডগমগ সুন্দরী
শরত রে।
তবু আজু জননী! সুমলিন বয়নী, হেরিয়া নন্দিনী
ভারত রে!
সবহুঁ বিরাজিত—গগন সুললিত, যমুনা পুলকিত—
বিলাস রে!
কোথি সো সমস্বর, ভকতি নিরঝর, পরাণ ভরপূর
উলাস রে?
যবহুঁ তেযাগল, ও পদ-শতদল, তুহাঁর সুত দল—
বেহুঁষ রে।
পর-পদ-গরল, ঐছন উছালল, তৈখন ভাগল,
পৌরুষ রে!
নাশ মা অমা-ঘোর, ভারতে দেহ ভোর, মোচহ আঁখি লোর,
জননী রে।
পুজন আরাধন, পুহুপ চন্দন, ঢারিব ও চরণ—
নলিনী রে!

মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥ ৩৩॥

পদচ্ছেদঃ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাণাং, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, অপুণ্য-বিষয়াণাং, ভাবনাতঃ, চিত্ত প্রসাদনম্।

পদার্থঃ। মৈত্রী—সৌহার্দ্দং, করুণা—কৃপা, মুদিতা—হর্ষঃ, উপেক্ষা—ঔদাসীন্যং, সুখাদিশব্দস্তদ্বাহুল্যলাভায় ধর্ম্মধর্ম্ম্যর্থভেদাৎ সুখিতাদিবাচী ততশ্চ সুখিত, দুঃখিত, পুণ্যবদ পুণ্যবন্ত স্তএব যথাক্রমং বিষয়া আশ্রয়া যাসাং তা স্তাসাং ভাবনা—উৎপাদনং, চিত্তমন্তঃকরণং, তস্য প্রসাদনং নির্ম্মলতা, সমাধিপ্রতিবন্ধকরাগদ্বেষধর্ম্মাদিমলাপসারণং ইতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং ভাবনাতঃ চিত্ত প্রসাদনং ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। মৈত্র্যাদীনি পূর্ব্বাণি সুখাদিষূত্তরেষু যথা সংখ্যং যোজ্যানি এতা মৈত্র্যাদ্যা যথাক্রমং সুখিতেষু, দুঃখিতেষু, পুণ্যবৎসু, অপুণ্যবৎসুচ ভাবয়েৎ তথাহি সুখিতেষু সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রী কুর্য্যাৎ, নতু তেষাং সুখং দৃষ্ট্বা তান্ প্রতি ঈর্ষ্যাং কুর্য্যাৎ, দুঃখিতেষু করুণাং কুর্য্যাৎ কথং নু নামৈষাং দুঃখিত্ব-বিমুক্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব কুর্য্যাৎ নতু নিশ্চেষ্টতামবলম্বেত, পুণ্যবৎসু মুদিতাং হর্ষং কুর্য্যাৎ তেষাং পুণ্যকার্য্যানুমোদনেন আনন্দং সূচয়েৎ, নতু কিমেতে পুণ্যবন্ত, ইতি বিদ্বেষং কুর্য্যাৎ, অপুণ্যবৎসু উপেক্ষাং ঔদাসীন্যমেব ভাবয়েৎ, নানুমোদনং, ন দ্বেষং কুর্য্যাৎ। এবং দ্বেষরাগাদি প্রতিপক্ষীভূত মৈত্র্যাদি ভাবনয়া-পাপাসংভিন্নো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততস্তমঃক্ষয়ে "চিত্তং নির্ম্মলং ভবতী-ত্যর্থঃ। "সমুৎপাদিতপ্রসাদঞ্চ চিত্তং সম্প্রজ্ঞাত সমাধিযোগ্যং সম্পদ্যতে। রাগদ্বেষাবেব মুখ্যতয়া ভেদ মুৎপাদয়তস্তৌ চ সমুন্মূলিতৌ স্যাতাং ততঃ প্রসন্নত্বাৎ মনসো ভবত্যেবৈকাগ্রতা। ইতি নিষ্কর্ষঃ।

অনুবাদ। সুখিত, দুঃখিত, পুণ্যবান্ এবং অপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাচারী মনুষ্যদিগের প্রতি যথাক্রমে স্নেহ, দয়া, হর্ষ এবং ঔদাসীন্য করিতে পারিলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়।

সমালোচনা। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনই যোগাভ্যাসের মূল ভিত্তি। চিত্তের নির্ম্মলতা বা প্রসাদ আবার সেই একাগ্রতার মূল। যদবধি চিত্তে মলস্বরূপ রজো ও তমোগুণের কণামাত্র অবস্থান করে তাবধি রাগ দ্বেষ আদি বৃত্তি দ্বারা চিত্ত অস্থির হইয়া বেড়ায়। কিন্তু ঐ রাগ দ্বেষাদির মূল কারণ স্বরূপ চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নির্ম্মল সত্ত্বময় হয়, তখন তাহাতে আর কোন বৃত্তির উদয় হয় না, কাযেই চিত্ত স্থিরতা বা একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্তই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন 'প্রসাদনং স্থিতি নিবন্ধনং'—চিত্তের প্রসন্নতাই স্থিতি বা একাগ্রতার মূল। চিত্তের সেই প্রসন্নতা কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি তৎ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

এই সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমে মৈত্রী প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। মৈত্রী শব্দের অর্থ স্নেহ, সৌহার্দ্দ বা বন্ধুতা; করুণা শব্দের অর্থ কৃপা, দয়া, নিঃস্বার্থ ভাবে পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা; মুদিতা শব্দের অর্থ আনন্দ বা হর্ষ; এবং উপেক্ষা শব্দের অর্থ ঔদাসীন্য অর্থাৎ পক্ষপাত বা বিপক্ষতা কিছুই না করা; সুখ শব্দের অর্থ সুখযুক্ত ব্যক্তি; এইরূপ দুঃখ শব্দের অর্থ দুঃখিত; পুণ্য শব্দের অর্থ পুণ্যবান্; অপুণ্য শব্দের অর্থ অপুণ্যবান্ বা পাপী; ভাবনা শব্দের অর্থ করা এবং চিত্ত প্রসাদন বলিতে চিত্তের নির্ম্মলতা। এক্ষণে দেখ সূত্রে এক দিকে মৈত্র্যাদি চারটি যেমন উক্ত হইয়াছে, অন্যদিকে সুখাদিও চারটি উক্ত হইয়াছে, অতএব উহাদের পরস্পরের যথাক্রম সম্বন্ধ বলিতে হইবে। তা হলেই সুখিতের উপর মৈত্রী, দুঃখিতের উপর করুণা, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে; সেইরূপ অনুবাদে উক্ত হইয়াছে।

আজ কাল যেমন বাজারে বাজারে মার্কিণ থানের মত যোগও মার্কিণ হইতে আমদানী হইয়া সাহেবের হাউসে ১০৲ টাকা করিয়া তোলার হিসাবে এবং দেশী মহাজনের নিকট ৫৲ টাকা তোলার হিসাবে বিক্রী হইতেছে, তুমি সংসারে থাকিয়া আহার, বিহার, রাগ, দ্বেষ যেমন আবশ্যক তা সকলি কর, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই—ইচ্ছা হইলে পাঁচটি মুদ্রা ট্যাঁকে করিয়া বাগবাজারে যাইলেই এক তোলা যোগ কিনিয়া আনিতে পারিবে; তাহার পর সেই তোলা টুকুকে তোলাপাড়া করিয়া বাড়ান তোমার হাত,—কিন্তু যে সময় যোগ শাস্ত্রের আবিষ্কার হয়, এবং যখন হাতে কলমে যোগ অনুষ্ঠান করিয়া মুনিগণ তাহার নিয়ম শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করেন, তখন যোগ এত সুলভ ছিল না। তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে একজন্মের নয়, দুইজন্মের নয়,

শতসহস্র জন্মের কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠানের পর শত সহস্রের মধ্যে যদি একজনের যোগ সিদ্ধি হয়। তাই আজ মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের ভিত্তি স্থাপনের এই কঠোর নিয়ম করিলেন। সূত্রটি শুনিতে তত কঠোর নয় বটে কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া হাতে কলমে ইহার উপদেশ মত কার্য্য করিবার সময়ই ইহার কাঠিন্য প্রতীত হইবে। এই সূত্রে যে কয়টি কথা বলা হইয়াছে তাহার সকলগুলির এক সাধারণ উদ্দেশ্য চিত্ত হইতে অহং ভাব দূর করা, সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া অনন্ত জগতের সহিত এক প্রাণ হওয়া।

এই সূত্রের মর্ম্মার্থ যদি কেহ আমাদিগকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে বলেন তা হলে আমরা এইরূপে প্রকাশ করি। যদি কেহ যোগী হইতে চাও, তবে অগ্রে আপনার চিত্ত হইতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য প্রভৃতি মলাগুলি দূরীভূত করিয়া চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করিতে শেখ। এই অনন্ত জগতের অনন্ত প্রাণীর সহিত এক প্রাণ এক মন হইয়া পরের সুখকে আপনার সুখ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া জ্ঞান এবং তদনুসারে কার্য্য কর। যে কেহ করুক না কেন, জগতে সৎ কার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে শিক্ষা কর; এতদূর অবধি জগতের সহিত এক হও, কিন্তু পাপীর সহিত মিশাইও না। অশ্বারোহী যেমন দ্রুত বেগে যাইবার সময় সম্মুখে কোন বিপদ্ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রশ্মি আকুঞ্চন করিয়া স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ তুমিও জগতের সহিত এক-প্রাণতায় ভাসিয়া যাইতে যাইতে যেখানে পাপ দেখিবে, সেই স্থানেই অমনি তটস্থ হইয়া দাঁড়াইবে। সেখানে এক প্রাণতার বেগকে অবরুদ্ধ করিয়া চলিবে। ইহাই সূত্রের মর্ম্মার্থ।

আমরা আজকাল অনেক বর্ত্তমান সভ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে পরের সুখে হাসিতে এবং পরের দুঃখে কাঁদিতে দেখিতে পাই বটে কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে হাসি ওষ্ঠপ্রান্তের ভূষণ মাত্র হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নির্গত নয় এবং সে অশ্রুজল চক্ষুর উপরিভাগ আর্দ্র-কারী মাত্র, ভিতরে যে শুষ্কতা, সেই শুষ্কতা। পরের সহিত আত্মার যে ভিন্নতা সেই ভিন্নতাই আছে অথচ হাঁসি কান্নাও আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি সেরূপ হাঁসি, কান্নার কথা বলেন নাই, দুর্ভিক্ষের কান্না কেঁদে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া শেষে স্ত্রীর অলঙ্কার গড়াইবার কথা বলেন নাই। যে হাঁসি হৃদয়ের উদ্বেলিত অন্তস্তলের সমুজ্জ্বল উচ্ছ্বাসরূপে নির্গত হইয়া কেবল ওষ্ঠপ্রান্ত নয়, চতুঃপার্শ্বস্থিত পদার্থনিচয়কেও সুধা ধৌতের ন্যায় পবিত্র করে, সেই হাসির

কথা বলিয়াছেন এবং যে অশ্রুজল কেবল নিজের-সম্বন্ধে নহে পরন্তু অপরের বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়কেই সমভাবে আর্দ্র করে, তাহারই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই অসীম ধরামণ্ডলের মধ্যে কয়জন লোকের মুখে সেইরূপ হাসি দেখা যায় এবং কয়জনের নেত্র হইতেই বা সেরূপ অশ্রু নির্গত হয়? তাই বলিতেছি কথাটী শুনিতে সহজ কিন্তু কাজে করা বড় কঠিন। ৫ টাকা ১০ টাকার কর্ম্ম নয়, সমুদয় জীবন ব্যয় করিয়াও যদি কেহ ঐরূপ হাসি কান্না ক্রয় করিতে পারেন, তা হলেও আমরা তাহাকে লাভবান বিবেচনা করি।

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

পদচ্ছেদঃ। প্রচ্ছর্দ্দন—বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

পদার্থঃ। প্রচ্ছর্দ্দনং—কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাৎ মাত্রাপ্রমাণেন বহির্নিঃসারণং, বিধারণং—প্রাণায়ামঃ, ইতি ভাষ্যং, প্রাণায়ামশ্চ প্রাণস্য (বায়োঃ) আয়ামঃ-গতিবিচ্ছেদঃ, সচ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং বাহ্যস্যান্তরাপূরণেন, পূরিতস্য বায়োস্তত্রৈব নিরোধেন; বা অথবা, প্রাণস্য কৌষ্ঠবায়োঃ।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) প্রাণস্য প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং মনসঃ স্থিতিং প্রসাদয়ে দিতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। বা শব্দো বক্ষ্যমাণচিত্তৈকাগ্রতা সাধনোপায়ান্তরাপেক্ষী বিকল্পার্থঃ পূর্ব্বেণ চ সমুচ্চয়ার্থঃ। বিজ্ঞানভিক্ষুস্তু বা শব্দোহপ্যর্থে, আভ্যামপি চিত্তস্য প্রসাদনং কুর্য্যাৎ। ইত্যাহ। সূত্রেণানেন প্রাণায়ামশ্চ দোষ নির্হরণ দ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং সামর্থ্যং সূচিতম্ প্রাণায়ামশ্চ রেচক পূরক কুম্ভক ভেদেন ত্রিবিধ ইতি কেচিৎ তচ্চিন্ত্যং; প্রাণায়ামশ্চ বিজ্ঞেয়ো রেচক পূরক কুম্ভকা ইত্যাদি স্মৃতিভি স্ত্রয়াণামেব মিলিতানাং প্রাণায়ামত্ব কথনাৎ, তত্র প্রচ্ছর্দ্দনেন রেচকঃ, বিধারণেন চ পূরক কুম্ভকাবুক্তৌ; বিজ্ঞান ভিক্ষুস্তু বিধারণাস্য কুম্ভক এবার্থঃ সচ পূরকং বিনা ন সম্ভবতীতি পূরকস্যার্থাগমঃ। প্রাণায়ামস্য চিত্ত প্রসাদনপূর্ব্বকস্থিতিসাধনত্বং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমেব তথাহি—প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষানিতি।

অনুবাদ। অথবা প্রাণ বায়ুর রেচন এবং বিধারণ অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিবে।

সমালোচন। আমরা অনেকবার বলিয়াছি শাস্ত্রকারেরা এক একটি কার্য্য সিদ্ধির উপায় নানা প্রকার দেখাইয়াছেন; কারণ সকলেই এক প্রকার উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম, কাযেই যিনি যে উপায়কে আপনার ক্ষমতা সাধ্য বিবেচনা করিবেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বে যে উপায় বলা হইয়াছে তাহা চিত্তের বিকাশ দ্বারা অসীম জগতের সহিত এক-প্রাণ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয় সুতরাং উহার অনুষ্ঠান অতীব দুঃসাধ্য; এই মায়াময় সংসারে যদিও অন্যের মায়া কাটান যাইতে পারে কিন্তু আপনার মায়া কাটান এক প্রকার অসম্ভব বলিলে চলে। কাযেই ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে অতি অল্প লোকই সক্ষম। কাযেই উপায়ন্তর বলার আবশ্যক।

পূর্ব্ব উপায়ে যেমন চিত্তের বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে, এ উপায়ে ঠিক তাহার বিপরীত। ইহাদ্বারা চিত্তের যতদূর সম্ভব ততদূর সঙ্কোচ করিবার কথা বলা হইয়াছে। জগতের কোন পদার্থের সহিত সম্পর্কের আবশ্যকতা নাই, নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে একাকী কেবল নাসিকায় হাত দিয়া বসিয়া নিশ্বাসের সহিত ক্রীড়া করিলেই হইবে। যদি তুমি চিত্তকে বিস্তার করিয়া জগতের সহিত এক প্রাণ হইতে না পার, তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি নির্জ্জন গৃহে একাকী বসিয়া প্রাণায়াম কর, তাহা হইলেও তোমার চিত্ত পাপ শূন্য হইয়া একাগ্র হইবে। প্রাণায়ামের তিনটি ক্রিয়া (১) রেচন অর্থাৎ নাসিকারন্ধ্র দ্বারা অল্পে অল্পে অভ্যন্তরস্থিত বায়ুর নিষ্কাশন, ঐ ক্রিয়াই প্রচ্ছর্দন শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। (২) পূরণ অর্থাৎ নাসিকারন্ধ্র দ্বারা বিশেষ যত্নসহকারে বাহ্য বায়ুর অল্পে অল্পে অভ্যন্তরে প্রবেশন। (৩) কুম্ভক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পূরণ করিয়া নাসিকারন্ধ্র বন্ধ করিয়া অভ্যন্তর বায়ুর নিরোধ, বহির্গত হইতে না দেওয়া। মহর্ষি পতঞ্জল পূরণ ও কুম্ভক এই দুইটি ক্রিয়াকেই বিধারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই তিনটি মিলিত হইয়া একটি প্রাণায়াম হয়, কেহ কেহ বা ইহার প্রত্যেকটিকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন। প্রাণায়াম দ্বারা যে চিত্তের একাগ্রতা ও নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয় কেবল শাস্ত্র প্রমাণ নয়, যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে তখন মন কেবল বায়ুর ক্রিয়াতেই আসক্ত থাকে, কাযেই উহাতে আর কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। প্রাণায়ামের বিষয় হঠযোগ দীপিকাতে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছিল দ্বিতীয়াধ্যায়ে যোগাঙ্গের মধ্যে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে, এখানেও প্রাণায়ামের কথা বলা হইল, অতএব এক প্রাণায়ামের দুইবার কথন হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ

না হয় কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি এখানে প্রথম যোগ সাধনের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যুত্থান অর্থাৎ যোগ ভঙ্গের বিষয় বলা হইয়াছে; কাযেই বিষয় ভেদ হওয়ায় দোষ নাই।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী॥ ৩৫॥

পদচ্ছেদঃ। বিষয়বতী, বা, প্রবৃত্তিঃ, উৎপন্না, মনসঃ স্থিতি-নিবন্ধনী।

পদার্থঃ। বিষয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দা বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাঃ সা বিষয়বতী, বা অথবা, প্রবৃত্তিঃ প্রজ্ঞা, উৎপন্না জায়মানা মনসশ্চিত্তস্য স্থিতি নিবন্ধনী স্থিতিং একাগ্রতাং নিবধাতি সম্পাদয়তীতি একাগ্রতাসম্পাদনীত্যত্র।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) বিষয়বতী প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। গন্ধরসরূপ শব্দস্পর্শান্যতমবিষয়িন্যপি প্রজ্ঞা চিত্তস্য স্থৈর্য্যং সম্পাদয়তীতি বা।

অনুবাদ। গন্ধ, রস, শব্দ, রূপ এবং স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ের প্রকৃত আস্বাদ জ্ঞান হইলে ও চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ হয়।

সমালোচন। ভাষ্যকার এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নাসিকাগ্রে চিত্ত সংযোগ করিলে এক প্রকার দিব্য গন্ধের জ্ঞান হয়; ঐ দিব্য গন্ধ জ্ঞানকে গন্ধ প্রবৃত্তি বলে; এইরূপ জিহ্বাগ্রে চিত্তের সন্নিবেশ করিলে দিব্য রসের জ্ঞান হয়, উহাই রস প্রবৃত্তি; এই পাঁচটি বিষয়ের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে চিত্তের সন্নিবেশ অনুসারে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে এক একটি পৃথক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ঐ সকল প্রবৃত্তির যে কোন একটা প্রবৃত্তি ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া সমাধি লাভের পথ উন্মুক্ত করে। ইহার ভাবার্থ এই যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয়ের ভোগ হয় সেই ইন্দ্রিয়ে মনোনিবেশ করিলে সেই বিষয়ের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলৌকিক আস্বাদ অনুভূত হয়, তাহাতে মন আকৃষ্ট হইয়া আর অন্যদিকে যায় না, কেবল ঐ বিষয়ের স্মরণ করে, কাযেই উহার একাগ্রতা সম্পাদিত হয়।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী॥ ৩৬॥

পদচ্ছেদঃ। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।

পদার্থঃ। বিশোকা—বিগতঃ শোকো রজঃ পরিণামো যস্যাঃ সুখময়

সত্ত্বাভ্যাসবলাদ্রজোবিপাকরহিতা ইতি যাবৎ, বা অথবা, জ্যোতিষ্মতী, জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ স প্রশস্তো ভূয়ান্ বিদ্যতে যস্যাঃ সা।

বা (অথবা) বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি রুৎপন্না চিত্তস্য স্থিতি নিবন্ধনী ভবতীশেষঃ।

ভাবার্থঃ। চিত্তস্য ত্রিধৈব স্থিতিঃ। (১) জ্ঞানাত্মিকা, (২) সুখ দুঃখাত্মিকা, (৩) প্রযত্নাত্মিকাচ। প্রযত্ননিয়মাৎ কথং চিত্তস্য প্রসাদনমিতি ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্রে দর্শিতং, সুখদুঃখ বৃত্ত্যাত্মকস্য চিত্তস্য কথং প্রসাদনত্তমিতি দ্বাত্রিংশ সূত্রে দর্শিতং। কেবলজ্ঞানাত্মিকায়া বৃত্ত্যা কথং চিত্ত প্রসাদনং ইত্যস্মিন্ সূত্রে দর্শ্যতে। যদা চিত্তং জ্ঞানে প্রযুক্তং ভবতি তদা জ্ঞান স্বরূপা সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ চিত্তং ব্যাপ্নোতি, প্রকাশয়তি চ। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ। রজ পরিণামের সম্পর্ক শূন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও চিত্তের একাগ্রতা সংশোধিত হয়।

সমালোচন। এই সূত্রের আলোচনা পর সূত্রের সহিত একত্রে করা যাইবে।

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্॥ ৩৭॥

পদচ্ছেদঃ। বীত-রাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্।

পদার্থঃ। বীতরাগবিষয়ং—বীতঃ পরিত্যক্তঃ রাগো বিষয়াভিলাষো যেন তৎ বীতরাগং যোগিনাং চিত্তং, তদেব বিষয়ঃ আলম্বনং যস্য তৎ তাদৃশং বা অথবা চিত্তং ব্যাখ্যাতং। কেচিত্তু বীতরাগবিষয় মিত্যেতৎ পদং বীতৌ পরিত্যক্তৌ রাগবিষয়ৌ যেন ইতিব্যুৎপাদয়ন্তি।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনং ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। অথবা প্রথম যোগাভ্যাসার্থী যোগী বীত রাগাণাং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রমুখানাং সিদ্ধ পুরুষাণাং চিত্ত মালম্বনীকৃত্য স্বচেতসং স্থিরতাং প্রসাধয়েৎ। অন্যেতু বীতৌ পরিত্যক্তৌ রাগ বিষয়ৌ যেন তাদৃশং চিত্তং সন্ন্যাসিন শ্চিত্ত মিত্যর্থঃ সমাধি সিদ্ধয়ে প্রভবতীতি চক্ষতে।

অনুবাদ। বিষয়াভিলাষ শূন্য কোন মহা পুরুষের চিত্তকে আশ্রয় করিয়াও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে পারে।

সমালোচন। পূর্ব্বে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত যে সকল উপায়

বলা হইল যদি কেহ যে সকল উপায়ের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হও, তবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি কোন সিদ্ধ পুরুষের চিত্তকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিষয়ই অনবরত চিন্তা করিতে থাক, তাহা হইলেও তোমার চিত্ত অচিরে একাগ্রতা লাভ করিতে পারিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্যের চিত্ত নির্ম্মল স্ফটিক কাচের মত; ইহার নিকট সম্মুখে যেরূপ বস্তু থাকে, তাহাই অবিকল চিত্তে প্রতিফলিত হওয়ায় চিত্ত সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে কোন মহাপুরুষের নির্ম্মল চিত্তকে আলম্বন করিলে যোগীর চিত্তও ঠিক তাদৃশ বিরক্ত ও নির্ম্মল স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কাযেই অনায়াসে স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি নিজে নির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা চিত্তের নৈর্ম্মল্য সাধনে অসমর্থ হও, তবে তাদৃশ কোন নির্ম্মল চিত্তকে ধ্যান কর, তা হলে সেই সিদ্ধ পুরুষের চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়াতে তোমার চিত্তও তৎকালে সেই রূপ নির্ম্মল স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে সুতরাং সেই আলম্বনীভূত চিত্তের মত অনায়াসে একাগ্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

পদচ্ছেদঃ। স্বপ্ন-নিদ্রা-জ্ঞান-অবলম্বনং বা।

পদার্থঃ। প্রত্যস্তমিত বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তে মনোমাত্রেণৈব যত্র ভোক্তৃত্ব মাত্মনঃ সঃ স্বপ্নঃ। নিদ্রা তু পূর্ব্বোক্তলক্ষণা। তয়োর্যজ্জ্ঞানং স্বপ্নাবস্থায়াং নিদ্রাবস্থায়াঞ্চ যাদৃশং জ্ঞানং ভবতি তাদৃশং জ্ঞানং আলম্বনং যস্য এবং ভূতং যোগিনশ্চিত্তং বা অথবা।

অন্বয়ঃ। স্বপ্ন নিদ্রা জ্ঞানাবলম্বনং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যৎ স্বপ্নে নিদ্রায়াঞ্চ জ্ঞানং তদ্যদি যোগী জাগ্রদাবস্থায়াং অবলম্বেত, তথাহি যথা নিদ্রায়াং সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যশ্চিত্তং নিবর্ত্ততে তথা জাগ্রদবস্থায়ামপি যদি যোগিনশ্চিত্তং সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তেত; যথাচ স্বপ্নে সর্ব্বং মিথ্যা তথা জাগ্রদবস্থায়ামপি সর্ব্বং মিথ্যেত্যতি বিজানীয়াৎ ততঃ সমাধিঃ সিদ্ধ্যতি। বাচস্পতি মিশ্রস্ত্বেবং ব্যাখ্যাতবান, যদা খলুবং স্বপ্নে বিচিত্র সন্নিবেশ বর্ত্তিনী মুদুকীর্ণামিব চন্দ্রমণ্ডলাৎ, কোমল মৃণাল শকলানুকারিভি রঙ্গ প্রত্যঙ্গৈ রূপেতাং কামপি কামিনীং দৃষ্টা প্রবুদ্ধঃ প্রসন্নমনা তামেব স্বপ্ন জ্ঞানাবলম্বনী ভূতাং অনুচিন্তয়ৎ তস্য তদেকাকার মনস স্তত্রৈব চিত্তং

স্থিতিপদং লভতে। এবং সুখমহমস্বাপ্স মিতি প্রত্যবমর্ষী ভবতি তথা ভূত জ্ঞানালম্বনস্যাপি চিত্তস্যৈকাগ্রতা সিদ্ধতি।

অনুবাদ। স্বপ্ন তন্দ্রা এবং নিদ্রাকালীন জ্ঞানকে আলম্বন করিয়াও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে পাবে।

সমালোচন। স্বপ্ন বলিতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইলে কেবল মনের দ্বারা যে আত্মার ভোগাবস্থা; নিদ্রা ত পূর্ব্বে উক্ত হইযাছে। এই স্বপ্ন এবং নিদ্রাবস্থায জ্ঞানকে আলম্বনকারী চিত্তও স্থিরতা লাভ করে। এই কথাটি দুই দলে দুই রকমে প্রকাশন করেন। কেহ বলেন স্বপ্নাবস্থায় যে স্বর্গ, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, নন্দনকানন বিহার, মন্দাকিনীতে অপ্সরাগণের সহিত লীলাখেলা ইত্যাদি জ্ঞান হয, ঐ সকল জ্ঞানের মধ্যে যে কোন জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে পাবে। এইরূপ নিদ্রাবস্থায় যে জ্ঞান, যাহা পরে অনুভূত হয 'সুখ মহ মস্বাপ্সং।' ইত্যাদি ঐ জ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ হইতে পাবে। কেহ বলেন নিদ্রাবস্থার জ্ঞান কিনা—নিদ্রা অবস্থার স্বরূপ জ্ঞান; নিদ্রাবস্থায় যেমন সমুদয বৃত্তি হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয, যোগী যদি যদি জাগ্রৎ অবস্থায় ও স্ব চিত্তকে সেইরূপ সমুদয বিষয হইতে নিবৃত্ত করিতে শেখান, তা হলে অচিরে একাগ্রতা লাভ হয়। এইরূপ স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান যেমন অলীক, এই জগৎও সেইরূপ অলীক, এইরূপ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুশীলন করিলেও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে।

যথাভিমত ধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

পদচ্ছেদঃ। যথা—অভিমত—ধ্যানাৎ বা।

পদার্থঃ। অভিমতং অভীষ্টং অনতিক্রম্য ধ্যান চিন্তনাদ্বা।

অন্বয়ঃ। বা (অথবা) যথাভিমত ধ্যানাৎ চিত্তমেকাগ্রতাং লভতে ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। কিং বহুনাং যদেবাভিমতং হরিহর মূর্ত্যাদিকং তদেবাদৌ ধ্যায়েৎ। তস্মাদাপিধ্যানাত্তত্র লব্ধ স্থিতি কস্য চিত্তস্যান্যত্রাপি বিবেক পর্য্যন্ত সূক্ষ্মেষু বিনৈব সাধনান্তরং স্থিতি যোগ্যতা ভবতীত্যর্থঃ। কেচিৎ যথাভিমতে বস্তুনি বাহ্যে চন্দ্রাদৌ, অভ্যন্তরে নাড়ী চক্রাদৌ বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরং ভবতীত্যাহুঃ।

অনুবাদ। আপনার ইচ্ছামত যে কোন বস্তুর ধ্যান করতঃও চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সমালোচন। 'মৈত্রী করুণা' ইত্যাদি (৩৩) সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'যথাভিমত ধ্যানাদ্বা' (৩৯) এই সূত্র অবধি মনের একাগ্রতা সাধনের উপায় বলা হইল। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই মনের স্থিতি সাধনের নিমিত্ত ছয়টী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারী ভেদে যে উপায় ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা প্রত্যেক সূত্রের 'বা' দ্বারা জানা যাইতেছে। যে যেরূপ অধিকারী হইবে, যাহার শক্তি যেরূপ, সে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। যোগের মূলভিত্তি চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন; চিত্তের স্থিরতা বা একাগ্রতা না হইলে কখনই যোগের আরম্ভই হইতে পারে না! অতএব এই কার্য্যটি যাহাতে সকল প্রকার অবস্থার লোকই সম্পাদন করিতে পারে, সেইজন্যই এত প্রকার উপায় বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শেষ উপায়টি অতি পরিষ্কার এবং সহজ। আপনার যে বস্তু ভাল লাগিবে, তাহারই চিন্তা কর, মনের একাগ্রতা হইবে। তুমি, সূর্য্যোপাসক; প্রত্যহ স্বীয় রশ্মি জাল বিস্তার করিয়া ঘোর নৈশ অন্ধকার হইতে জগতের বিমোচনকারী ভগবান ভাস্কর তোমার অভীষ্ট দেব, তাঁহার আরাধনা, তাঁহার ধ্যান তোমার ভাল লাগে, তুমি তাঁহারই ধ্যান কর। তুমি গাণপত্য —সেই সিন্দূরের মত ঘোর রক্তবর্ণ লম্বোদর চতুর্ভুজ গজানন মূর্ত্তিটি তোমার বড় ভাল লাগে, আচ্ছা তুমি তাঁহারই ধ্যান কর। এইরূপ তুমি শৈব হও, তবে সেই রজত গিরির মত বিশাল শিব মূর্ত্তির ধ্যান কর, বৈষ্ণব হও, প্রলয় কালীন মেঘের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু মূর্ত্তি ধ্যান কর, আর তুমি শাক্ত মহা শক্তির ভয়ঙ্করী কালী মূর্ত্তি অথবা পরম মনোহর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির ধ্যান কর,—যে দেবতা তোমার অভীষ্ট, তাঁহারই ধ্যান কর। ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সেই মূর্ত্তিটি তোমার মনে অঙ্কিত হইলে, তোমার চিত্ত সেই আকারে পরিণত হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইবে, আর কোন বস্তুর জ্ঞান হইবে না, কাযেই চিত্ত হইতে অন্য বৃত্তি গুলি দূরীভূত হইবে। তা হলেই তোমার চিত্ত স্থির হইবে।

আধুনিক তান্ত্রিক হঠ-যোগ-কারীরা বলেন যে নাড়ী চক্রের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা চিন্তা করিলেও, মনের স্থিরতা হয়। এই নাড়ীর চক্রের চিন্তাকে তাঁহারা অজপারূপ বলেন। উহার প্রক্রিয়া এইরূপ; আপনার যত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হয় সেই সকল ক্রিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করাই যোগীর প্রধান লক্ষ্য। একদিনের

প্রাতঃকাল হইতে অপর দিনের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমাদের যত শ্বাস প্রশ্বাস হয়, তাহার সংখ্যা একুশ হাজার ছয় শত। তা হলে প্রত্যেক শ্বাস এবং প্রশ্বাস ক্রিয়াতে চারি সেকণ্ড করিয়া লাগে। এই প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এক একটি গায়ত্রী মন্ত্রের স্বরূপ; এই নিমিত্ত সমুদয় শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার নাম অজপা জপ অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ শূন্য গায়ত্রী জপ। এই কল্পিত গায়ত্রী জপ নাড়ী চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতিরূপে কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুষ্ঠিত হয়। নাড়ীর চক্রের অধোভাগে মূলাধার নামক একটি স্থান আছে, গণপতি তাহার অধীশ্বর, ঐ গণপতির আরাধনার্থ ছয় শত শ্বাস এবং প্রশ্বাস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। লিঙ্গের সমীপে স্বাধিষ্ঠান নামক স্থান আছে, উহার অধিপতি ব্রহ্মা, তাঁহাকে ছয় সহস্র শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অর্পিত হয়। এইরূপ সমুদয় নাড়ী চক্রের বিশেষ বিশেষ স্থানের অধিপতি বিশেষ বিশেষ দেবতার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার অর্পণের কথা আছে। এরূপ পথ অতি জটিল, মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় যোগানুষ্ঠানের এরূপ কঠিন পথ, বোধ হয়, কখন মনে করেন নাই।

ভাল উক্ত উপায় আশ্রয় দ্বারা যেন মনের একতা সিদ্ধ হইল, চিত্তের একাগ্রতা হইলে লাভ কি? আমি যে যত্ন করে চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ করিব, তাহাতে আমার কি ফল লাভ হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত মহর্ষি পতঞ্জলি পর সূত্রের অবতারণা করিলেন। যথা—

পরমাণু পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

পদচ্ছেদঃ। পরমাণু পরমমহত্ত্ব—অন্তঃ, অস্য, বশীকারঃ।

পদার্থঃ। পরমাণুর্নামাতি সূক্ষ্মঃ পদার্থঃ যস্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্তন্তরং ন বিদ্যতে, পরমমহত্ত্বঞ্চাতিস্থূলং যস্মাৎ স্থূলতরং ন কিমপি বর্ত্ততে তয়োর্ভাবঃ পরমাণু পরমমহত্ত্বং তদেবান্তো যস্য সঃ পরমাণু পরমমহত্ত্বান্ত ইতি বশীকারস্য বিশেষণং, অস্য চিত্তস্য বশীকারো নাম কামচারাঽপ্রতিরোধঃ, বিধেয়ত্বমিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। অস্য পরমাণু পরমমহত্ত্বান্তো বশীকারোভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। এভিরুপায়ৈশ্চিত্তস্য স্থৈর্য্যং ভাবয়তো যোগিনঃ সূক্ষ্মবিষয় ভাবনাদ্বারেণ পরমাণ্বন্তঃ বশীকারঃ অপ্রতিঘাতরূপো জায়তে, কচিৎ পরমাণু পর্য্যন্তে সূক্ষ্মে বিষয়েঽস্য মনো ন প্রতিহন্যাৎ ইত্যর্থঃ, এবং স্থূলমাকাশাদিপর্য্যন্তং ভাবয়তো ন কচিৎ চেতসঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যং ভবতীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। (উপরি উক্ত যে কোন উপায় দ্বারা চিত্তের স্থিরতা সিদ্ধ হইলে এই জগতের মধ্যে) সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু হইতে সর্ব্বোপরি স্থূল বস্তু পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুর উপর চিত্তের বশীকার অর্থাৎ আধিপত্য লাভ হয়।

সমালোচন। পূর্ব্বে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনার্থ যে সকল উপায় কথিত হইল, উহাদের মধ্যে নিজের সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুসারে যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তকে একবার স্থির করিতে পারিলে, সে চিত্ত এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কি পরম সূক্ষ্ম অথবা কি মহাস্থূল যাবতীয় পদার্থ অবাধে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। আজকাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্দুমাত্র জলের মধ্যে অর্দ্ধ বিন্দু শোণিতের মধ্যে, গৃহের সূক্ষ্ম রন্ধ্র দ্বারা পতিত পবন হিল্লোলে আন্দোলিত সূর্য্যদেবের কিরণ জালের মধ্যে শত সহস্র কীটাণুর লীলা খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হই বটে, এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষাও সুদূরস্থিত বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর গ্রহের কেবল আকৃতি প্রকৃতি নয় তাহাদের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণকারী উপগ্রহগুলি অবধি সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেও সমর্থ হই বটে; কিন্তু সেই অবধিই তাহাদের শক্তির পর্য্যবসান হইয়াছে; অণুবীক্ষণ যন্ত্র কীটাণু অবধিই দেখাইতে সক্ষম এবং দূরবীক্ষণের গতি নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অবধিই হইয়া থাকে, তাহার অধিক নয় এবং উভয়ই আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে। আলোক না থাকিলে কি অণুবীক্ষণ কি দূরবীক্ষণ কাহারই কার্য্যকারিতা থাকে না। কিন্তু স্থিরতা প্রাপ্ত চিত্ত কীটাণু কি, কীটাণুদিগের প্রত্যঙ্গ সঞ্চারী শোণিত কণার মধ্যে যে অমেয় কীটাণু ক্রীড়া করে, তাহাদিগেরও শোণিতে অসংখ্য কীটাণু দেখিতে সমর্থ হয়; এই রূপ দূরবীক্ষণ বড় বেশী তোমার মস্তকোপরি গগনমণ্ডলে বিরাজমান জ্যোতিষ্কদিগের সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করাইতে সক্ষম, তাহার অধিক নয়, তাহার ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পার্শ্বে যে অনন্ত আকাশে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত কাল হইতে বিরাজমান সে সমস্ত দূরবীক্ষণের সাহায্যে কখনই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু স্থিরতা প্রাপ্ত চিত্ত, মনুষ্য হৃদয়ে যাহার পরিমাণ ধারণা করিতে অক্ষম, সেই মহাকাশে তরঙ্গায়িত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়। তুমি প্রাণপণ করিয়া তাড়িত বার্ত্তাবহের সাহায্যে একদিনের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যের ক্রিয়া যদি জানিতে পার ত তোমার চূড়ান্ত বাহাদুরী হয় কিন্তু একাগ্রতা প্রাপ্ত চিত্ত কেবল মনুষ্যের নয়, কেবল এই নদ নদী গিরি কানন সমুদ্রাদি ও তৎ তৎ স্থানস্থিত জীব অজীব সমাকীর্ণ বাহ্য জগতের

নয়, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরের বস্তু নিচয়ের উপাদানীভূত পরমাণুপুঞ্জ প্রত্যেকে প্রতিস্তরে কি ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাও এক কালে দর্শন করিতে সক্ষম। ফল একাগ্রতা প্রাপ্ত চিত্তের গতিরোধক কেহ নাই। যোগীর যখন যে বস্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, উহা দ্বারা তখনই সেই বস্তুর জ্ঞান কবিতে সমর্থ হন। একাগ্রতা প্রাপ্তিই চিত্তের সম্পূর্ণতা লাভ। একাগ্রতা প্রাপ্ত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণ বিমল ভাব ধারণ করে, তখন আর উহার পরিশোধনের নিমিত্ত অভ্যাসাদির অনুষ্ঠান অপেক্ষিত হয় না।

মুর্খ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নীলার ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়াছে, এ জ্বর আর ছাড়িতেছে না। বিনোদ নীলাকে ফেলিয়া বিশু বাবুর বাড়ী রাঁধিতে যাইতে পারেন না, এদিকে ঘরেও কিছু খাইবার নাই। দুদিন রাতে বিনোদ শুদ্ধ জল পান করিয়া আছেন। নিষ্ঠুর গ্রামে এমন লোক নাই যে একবার আসিয়া ইহাদের দশা দেখিয়া যায়।—সকলেই স্বার্থপর, আপনার লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং বিনোদিনী একবার বিশু বাবুর বাড়ী, একবার কবিরাজের নিকট, অনাহারে এবং চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়াও ছুটোছুটি করিয়াছেন ও কতজনের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন, কেহই আসে না। কেবল দিবসে, নীলার সঙ্গে যে সকল গ্রামস্থ বালক বালিকা খেলা করে, তাহারা দেখিতে আইসে, এমন কি কেহ দুখানি বাতাসা, কেহ এক টুকরা মিছরি, কেহ বা একটা দাড়িম বা পেয়ারা নীলার জন্য লইয়া আইসে, এবং আপন আপন ক্ষুদ্র দেহে বিনোদিনীর যথাসাধ্য সাহায্য এবং নীলার শুশ্রূষা করিয়া থাকে।

আহা এই জন্যই কি বালিকাগণ হিন্দুদিগের অর্চ্চনীয়া। এই জন্যই কি

ইহারা মহামায়ার অবতার বলিয়া প্রবাদিত। বালক বালিকারা স্বগায় প্রকৃতি বিশিষ্ট, উহারা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কিছুই বুঝে না। উহারা সদাই প্রেমে ভোর, সদাই আনন্দময়, উহাদের শত্রু মিত্র ভেদ নাই, আপন পর ভেদ নাই—উহারাই মহৎ,—চৈতন্যের মহাপ্রেম, বুদ্ধ দেবের অহিংসা,—উহারাই শিক্ষা দিয়াছে; নহিলে এ হেন প্রেত-পূর্ণ স্থানেও বালক বালিকায় সেই স্বর্গীয় ভাব কেন! সেই প্রেমের অজস্র ধারা নীলার কুটীরে বহিবে কেন? দৈবাং যথার্থই বলিয়াছেন—

বিষ-দন্ত কাল, যত দংশে—
বালকের কোমল শরীরে,
দিয়ে বিষ, হবে তার মধু।
কাল চাহিনা তোমারে ভাই?
ধীর-বিষে নাহি প্রয়োজন।
দাও তব তীব্র হলাহল—
—এখনি ঢালিয়া করি পান—
—যাই চলি যথা নাই তুমি।"

এই বিপদ কালে, এই ভীষণ পশু দলের হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা জালে জড়িত হইয়া, কেবল কোমল বপু—ক্ষুদ্র দেব দেবী বৃন্দের কোমল কৃপাই বিনোদিনীর এক মাত্র ভরসা স্থল হইয়াছে।

এইভাবে দুদিন গেল; দেখিলেন, টাকা বই আর উপায় নাই। ভাবিলেন, বিশুর মাতা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে গলার চিক্ ও হাতের অনন্ত রহিয়াছে, তাহার একখানি বেচিয়া যাহা পাইব, তাই দিয়া নীলার চিকিৎসা ও নিজের আহার চলিতে পারিবে।

এই মনে করিয়া অতি কষ্টে বিশু বাবুর বাড়ী গেলেন; তাঁহার মাতা মালা জপ করিতেছেন; প্রথমত—যাইয়া বর্তমান দুরবস্থার কথা বিবৃত করিলেন; দুরবস্থার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার শুষ্ক মুখের একটি কৈশিকা কি একখানি পেশীও নড়িল না, কাঁপিল না; বুড়ী শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে বলিল,—"এখনকার কি, তাই বল, বেশী কথা শুনিতে গেলে আমার জপের গোলমাল বেধে যায়: কি বলবে বল?"

বিনোদ বলিলেন, "আর বলবার কি আছে,—আমার গয়না ক খানি চাই"—

"গয়না চাও ? তোমার গয়না ? না———"

"আমার গয়না বৈ আর কার গয়না চাইতে আস্‌ব।"

"কার কাছে রেখেছ, বোয়ের কাছে না বিশুর কাছে ?"———

"বোয়ের কাছে না বিশুর কাছে" এই সর্ব্বনেশে প্রশ্ন শুনিয়াই বিনোদের মাতায় বজ্রপাত হইল। গলা শুকাইয়া গেল। একটু পরে, কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আপনারই কাছে রেখেছি।"

"কি আমার কাছে রেখেছিস্—এত বড় মিথ্যা কথা, ছেনাল মাগী। আমি চোর,—এত বড় আস্পর্দ্ধা ধত্তো রে কে আছিস বাড়ীতে"—এই গোলমাল শুনিয়া বিশু বাবুর স্ত্রী এবং দুই তিন জন দাসী দৌড়িয়া আসিল, বুড়ী আরো অধিকতর ক্রোধে বিনোদের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

একটি দাসী স্বভাবত মুখরা ও নির্ভীকা,—বিনোদের দশা দেখিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কেন—বউ ঠাক্‌রাণ—তুমিও ত সে দিন বলেছিলে, এখনও ভুতোর মার দু তিনশ টাকার গহনা আমাদের কাছে আছে—তাথাকে ত, তবে আর দাঁড়িযে এ তামাসা দেখছ কেন—দাওনা ফেলে ?"

"এঁ, আমি কবে বলেছি,—হারামজাদী আমার নামে মিথ্যা কথা, আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোকে ঝাঁটা মেরে দূর কত্তে পারি।" এই বলিয়া বিশু বাবুর স্ত্রী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মুখরা দাসীর নাম রমা। রমা কাঁদিয়া বলিল 'হা ধর্ম্ম ! তুমি কি এ দেশে নাই।'

বিনোদ তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, যে রমা দাসীর বদনে স্বর্গীয় ভাতি জ্বলিতেছে। ধীরে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, 'রমা—বিধাতা কেন তোমায় দাসী করিয়াছে !' রমা কিছু বলিল না, তথা হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদ আর সেখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তিনিও ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিলেন। অঙ্গুরীর ব্যাপারে যতদূর দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইযাছিলেন, এ বারে সেরূপ হইলেন না, কেবল মনে মনে এই বলিলেন, 'জগদীশ যদি অনাহারে ও অচিকিৎসায় মারিবার ইচ্ছা থাকে, তবে মার, তোমার উপর আত্ম সমর্পণ করিলাম।' বিধাতার উপর আত্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়-ভার একটু লঘু হইল।

বাড়ীতে যাইয়া দেখিলেন—একখানি (পেইড্) ডাকের চিঠি ঘরের দাবায়

রহিয়াছে। চিঠিখানি তাঁহার মাতুলালয়ের এক সমবয়সিনী লিখিয়াছেন। চিঠিতে আর আর সংবাদের পরে লেখা আছে "আমার স্বামীর পত্রে জানিলাম, ২২শে আষাঢ় সন্ধ্যার সময়, সোড়ানের সমর ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামের ভুবন ডাক্তার কাটা গিয়াছে।"

বিনোদ চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, কেননা, ঠিক সেই তারিখে সেই সময়ে ভুবন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলে, "ভুবন! 'আর একবার শেষ দেখা দিব, কিন্তু এ শরীরে নয়'—এই সত্য পালন করিতে কি মরিয়াও তুমি আমায় দেখা দিলে? মহাপুরুষ, তোমারই প্রণয় প্রগাঢ়। হায় কেন এই প্রণয় দেশের হিতে অথবা ঈশ্বরে স্থাপন করিলে না, তুমি মহাপুরুষ হইতেও মহাপুরুষ হইতে পারিতে।"

সপ্তম অধ্যায়।

বিনোদ পত্রখানি পাঠ করিয়া, নীলার পার্শ্বে বসিয়া নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতেছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে রমা আসিয়া চুপে চুপে বলিল "ঠাকুরাণী ঈশ্বর প্রসাদে এ দিন আপনার থাকিবে না,—আপনি সারা দিন অনাহারে আছেন, তার উপর গহনা ক খানির শোক, তা যা হোক এই ধরুণ"। বলিয়া এক সের চাউল কয়েকটি বেগুন ও আলু দিয়া কহিল "যান—আপনি পাক করুণ, আমি নীলার কাছে বসি"—

বিনোদের চক্ষে অশ্রুধারা বহিল,—বলিলেন, "রমা তোমার শরীরে যত দয়া তার ষোল ভাগের এক ভাগও কি তোমার মুনিব সংসারের কারো হৃদয়ে নাই?"—

রমা হাসিয়া বলিল, "গৌণ করিবেন না, যান রান্না ঘরে, আমি অনেকক্ষণ থাকিতে পারিব না।"

বিনোদ পাক গৃহে গেলে, রমা অস্থি চর্ম্মাবৃত নীলার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নীলা একবার চক্ষু মেলিয়া বলিল "মা আজ কি তুমি খাবে না?" রমা বলিল, "তিনি ও ঘরে পাক করিতেছেন।" নীলা দেখিল এ মা নয়, এক

দৃষ্টের রমার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। কিছু কাল পরে বলিল, "মা,কি বাড়ীতে আজ রাঁধে।" রমা "হাঁ" বলিয়া নীরব হইল। সহসা নীলার মুখ প্রফুল্ল ও লাবণ্য বিশিষ্ট হইল। এই প্রফুল্ল বদন দেখিয়া রমা বুঝিতে পারিল, যে বাড়ীতে বহুকাল উনন জলে নাই, সেই বাড়ীতে আজ মা রাঁধিতেছেন,—এই কথা শুনিয়াই নীলা এত পীড়িতা অবস্থায়ও খুসী হইয়াছে। রমা ঠিক বুঝিয়াছিল; কেননা একটু পরেই নীলা হাসিয়া বলিল "রমা মা রাঁধিতেছে—আমায় তুলিয়ে নে দেখাতে পারিস?" রমার চক্ষে জল আসিল বলিল, "তোমার যে দুর্ব্বল শরীর, আর যে জ্বর, তোমায় বাইরে নিয়ে গেলে শরীর আরো খারাপ হবে, জ্বর আরো বেশী হবে, তুমি যেও না মা, তুমি এই গুলি নিয়ে খেলা কর।" এই বলিয়া ট্যাঁক হইতে খুলিয়া কি কতগুলি ভারি পদার্থ নীলার হস্তে দিল, নীলার প্রসারিত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হাত নুয়াইয়া পড়িল। নীলা বিস্মিত হইয়া বলিল "রমা তুই এত টাকা কোথায় পাইলি?"

রমা বলিল "টাকা তোমার মায়ের, এই টাকা দিয়া কবিরাজ আনিয়া তোমাকে ভাল করিবেন।"

নীলা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি আপনি ভাল হব, এ টাকা থাকিলে, মা আর পরের বাড়ী রাঁধিবে না।" নীলার গণ্ড বহিয়া এক স্রোত অশ্রু পড়িল।

বালিকা মরিতে চাহে, তথাপি মায়ের কষ্ট দেখিতে চাহে না; বালিকার মনের এ ভাবও রমা বুঝিতে পারিল। হাসিয়া তাহার গালে চুম খাইয়া বলিল,—"আর তোমার মা পরের বাড়ী যাইবে না,—এত সামান্য, তাঁর আরো টাকা আছে।" নীলা এই কথা শুনিয়া চক্ষু মুদিয়া—ভাবিতে লাগিল এ কি স্বপ্ন? বালিকা ঘুমাইল; স্বপ্নেও তাহাই দেখিতে লাগিল। টাকা গুলি ছড়াইয়া বিছানার এক পাশে রহিল। রমা তাহা একত্র করিয়া নিদ্রিতা বালিকার অঞ্চলে বান্ধিয়া বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিল।

বিনোদের রন্ধন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা তোমার জায়গা করি?" রমা বলিল, "আপনি আগে খান, পাতে যা থাকে আমি প্রসাদ পাইব।"

এত দুঃখ ও ক্ষতি হইলেও বিনোদ আজ অতি পরিতৃপ্ত হইয়া উদর পূরিয়া সিদ্ধান্ন ভোজন করিলেন—বহুকাল স্বামী গৃহ ত্যজে এ কাজ হয় নাই। স্ব গৃহে স্ব পাক—এতই মধুর।

অষ্টম অধ্যায়।

বিশু বাবু একটি দাসী আনিতে বলেন, ভূতনাথের পিতা কিছুদিন ত্রিপুরায় ছিলেন, তিনি তথা হইতে একটি পাহাড়ী স্ত্রীলোক আনিয়া দেন। তাহার একটি কন্যা ছিল। পার্ব্বতী রমণী মরিয়া গিয়াছে; তাহার সেই কন্যাটি এখন বড় হইয়াছে; তাহারই নাম "রমা।"

রমা শৈশবে এ দেশে আসিয়াছে; তাহার আহার ব্যবহার কথা বার্ত্তা সকলই বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। এখন তাহার বয়েস আঠার বৎসর। রমা অতি সুন্দরী; তাহার বর্ণ পদ্ম ফুলের মত; মাথায় অনেক চুল; চক্ষু একটু ছোট হইলেও—বর্ণ অপরাজিতার তুল্য ও অতিশয় উজ্জ্বল; ভ্রূ অল্প; কেবল দোষের মধ্যে নাসিকা কিঞ্চিৎ চাপা,—কিন্তু অন্য সকল পার্ব্বতী রমণীর ন্যায় তত চাপা নহে; ওষ্ঠ লাল ও সুন্দর; দন্তগুলিও পরিপাটী। শরীর বলশালী এবং বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট, কিন্তু সুদীর্ঘ ও স্থূলাবয়ব নহে।

রমার প্রকৃতি স্বাধীন, দয়া পূর্ণ এবং ক্রোধ পূর্ণ। মিথ্যা কথা কহিবার বা সহিবার অভ্যাস নাই। সকলেই উহাকে ভাল বাসে। কেহ বাসে গুণের জন্য, কেহ রূপের জন্য। কিন্তু রমা নিজে রূপের গৌরব কিছুই করে না। অথবা লোক যে রূপ-পিপাসী হয় ইহাও তাহার বিশ্বাস নাই। কেননা অদ্যাবধি কাহারো—রূপে সে মুগ্ধ হয় নাই। যদি কাহাকেও রমা ভাল বাসিয়া থাকে, তবে সে তাহার দুঃখের জন্য। কত দুঃখীকে রমা ভাল বাসে, তাহার সংখ্যা নাই। শুদ্ধ মানুষকে যে, সে ভাল বাসে এমন নহে,—জীব জন্তুও তাহার ভালবাসার পাত্র। সে খাইয়া যখন বড় এক থালা অন্ন লইয়া বাহির হয়, তখন কত পাখী উড়িয়া তাহার স্কন্ধে ও মাথায় আসিয়া বসে, কত বিড়াল কুকুর তাহার বক্ষ পদতলে আসিয়া দাঁড়ায়।

রমা বুঝিয়া রাখিয়াছে টাকা না হইলে পরের উপকার করা যায় না; এই জন্য রমা টাকার লালসা করে, নতুবা, শুদ্ধ খাইতে পরিতে পাইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিত।

রমাকে পুরুষ মাত্রেই ভাল বাসে, এই জন্য যে, যাহারা দিতে পারে, তাহাদের কাছে টাকা চাহিলে পায়, সুতরাং রমা চাহিলেই টাকা পায়। রমা দাসী বটে, কিন্তু সে অনেক দাসের রাণী। এলিজেবেথের ন্যায় রাণীর এসেক্স, লেসেকস, লিষ্টর পদানত। যে বলে, যে চতুরতায়, এলিজেবেথ,

ইংলণ্ডের স্বাধীন সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, সেই বলে, সেই চতুরতায়, রমা দুঃখীর দুঃখ নাশ করিয়া থাকে।

বিশু বাবু পাষাণ ও কৃপণ হইলেও রূপ-পিপাসায়, তিনিও রমাকে ভাল বাসেন, চাহিলে টাকা দেন। কিন্তু রমা তাঁহাকে মুনিব হইলেও হিংস্রক জন্তুর ন্যায় ভয় ও ঘৃণা করে। বিশু বাবু কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি রমাকে যত ভাল বাসেন, সে তাঁহাকে ততটা ভাল বাসে না। কেননা একদিন তাঁহার পত্নী পিত্রালয় গেলে, রমা তাঁহার শয়ন গৃহে পান দিতে গিয়াছিল, তিনি পান লইবার ছলে রমার গালে চুম্বন করেন, রমা ক্রোধে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া বলিয়াছিল—"খবরদার, দোতালার নীচে ফেলিয়া দিব।"—তথাপি তিনি উহার রূপে এত মুগ্ধ যে, দীর্ঘকাল তাহাকে বাটীতে না দেখিলে ছটফট করেন, এবং আর কাহাকে ভালবাসে, সেইখানে গিয়াছে, এই সন্দেহে, আসিলেই প্রহার করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে মধুর চুম্বন সহিতে পারে না, সে অনায়াসে এই প্রহার সহ্য করে।

পাঠক যদি মনে করেন রমা দুষ্কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে,—সেই ভয়ে রমার জন্য এত মসী ব্যয় হইল। চাহিলে পাইত বলিয়াই রমা টাকা চাহিয়া লইত। তাহার এক পয়সাও অসৎ কার্য্যে উপার্জ্জিত বা অসৎ কার্য্যে ব্যয়িত হইবার নহে।

নবম অধ্যায়।

আহারান্তে বিনোদ নীলার কাছে গিয়াছেন, রমা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেছে। এমত সময় কে আসিয়া তীব্র কণ্ঠে "রমা! রমা! তুই এখানে"—বলিয়া প্রাঙ্গন মধ্যে দাঁড়াইল। কণ্ঠের কর্কশ ধ্বনিতে বাটী কম্পিত হইল। নীলা কাঁদিয়া জাগিল। রমা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, বিশ্বনাথ চৌধুরী বনামে বিশু বাবু। রমা ভ্রূক্ষেপও করিল না,—আপন কাজ করিতে করিতে দৃঢ় স্বরে উত্তর করিল—

"এখানে,"

"এখানে কি করিতেছিস,"—এই বলিয়া বিশু উন্মত্তের ন্যায় যাইয়া রমার চুল ধরিল,—রমা বলিল,—

"ছেড়ে দাও, তোমার বউ আমায় তাড়িয়েছে—আর তোমার বাড়ী যাব না"—

"যাবি নে,—কুটনীর বাড়ী থাকিবি, মনে করেছিস্" বিশু বাবু এই বলিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। রমার ক্রোধ হইল। এই প্রথম ক্রোধ, আগে এরূপ অনেক প্রহার সহিয়াছে—আজ তাহা পারিল না। এ বাঙ্গালীর ক্রোধ নহে, এ সেই পার্ব্বত্য ক্রোধ। রমা ভীষণাকার ধারণ করিয়া প্রথম আপন চুল গুচ্ছ বিশ্বনাথের মুষ্টি হইতে ছাড়াইয়া লইল। পরে তাহার মাথায় এমন কঠিন চপেটাঘাত করিল, যে বিশ্বনাথ ঘুরিয়া ভূমিশায়ী হইল,—বিনোদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "রমা কি করিস"—রমা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পতিত বীরের মুখে আর একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া—সক্রোধে নীরবে প্রস্থান করিল।

বিনোদ হতবুদ্ধি হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইতি মধ্যে বিশ্বনাথ ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়াই সম্মুখে বিনোদকে পাইয়া নিরপরাধিনী বিনোদের প্রতি আক্রমণ করিল। বিনোদের চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই নৃশংস ব্যাপারেরও উপসংহার হইল। বিনোদ লজ্জায় অভিমানে এবং বেদনায় কান্দিতে কান্দিতে গৃহ মধ্যে লুক্কায়িতা হইলেন।

যে কয়েকজন ভদ্রলোক ও ছোট লোক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে, রামধন নামে পরিণত বয়স্ক একজন চণ্ডাল আসিয়াছিল, সে বলিল, "বাবু—যার ভাত, গাঁয়ের লোকে খেয়ে মানুষ হয়ে গেছে, যার টাকায় গাঁয়ের লোক টাকাওয়ালা,—আজ তুমি তানার ব্রাহ্মণীর গতরে হাত তুল্লে—তানার কেউ থাকলে পাত্তে না"—

"শালা যত বড় মুখ, তত বড় কথা," এই বলিয়া বিশু বাবু পুনরায় সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। দুর্ভাগ্য বশত যুদ্ধ হইল না, সকলে ধরিয়া থামাইয়া দিল।

তখন রামধন বলিতে লাগিল—"বাবু কি কব তোমারে, তোমার বাবা মোকে রামধন দাদা বলে কথা কইতো, আর তুমি বল শালা,—তোমার ঠাকুদ্দাদা বাড়ী বাড়ী পূজো করে চাল কলা এনে খেত, তুমি হয়েছ জমীদার।

শালা বল্‌বে না কেন ?—খাজনা দিয়া মাটিতে বসত করি, না হয় উঠে যাব, যারে খাজনা দেব, সেই মাটি দেবে,—অত আর রেজায়ের ধার ধারি না।"

অপর যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারা বিও বাবুকে লইয়া চলিল—বিও বাবু যাইবার বেলা, রামধনের দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল, "বেটী তোকে দেখিব," রামধন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া তাহার উত্তর দিল। বিও বাবু তাহা দেখিতে পাইল না।

জনাবণ্য পরিষ্কৃত হইলে, রামধন রোরুদ্যমানা বিনোদের নিকট আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, "মা এ গাঁয়ে মানুষ নাই, মুই আগুতে এলে, কোন শালা আপনার গতরে হাত তোলে, একবার দেখে নিতুম—মা আজ তুমি দুঃখী হয়েছ, তুমি যা ছিলে তাত মুই জানি—মা তুমি দুঃখ করো না; বেটা বাঁচি থাকলে, আবার তোমার সুখ হবে। মা চণ্ডাল বলে—রামাকে ঘৃণা করো না, মুই তোমার পায়ের নফর, তু করে ডাকলেই হাজির হব।"

বিনোদ নিজের দুঃখ ভারে সদাই ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিতেন, কখন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেন না, আজ তিনি রামার সঙ্গে একটি মাত্র কথা কহিলেন,—

"রাম কে বলে তোমায় চণ্ডাল, তুমিই ব্রাহ্মণ।"

রামা অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভূমিতলে পড়িয়া অতি ভক্তি সহকারে একটি প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দশম অধ্যায়।

বিনোদ সীতার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কান্দিলেন; পরে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে বসিলেন। এমন সময় কে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া আসিয়া দাঁড়াইল; বিনোদ চাহিয়া দেখিলেন রমা,—এবারে রমার আবার দয়া পূর্ণ শান্ত মূর্ত্তি।

বিনোদ চমকিয়া উঠিলেন, রমা ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া চুপে চুপে কহিল, "ঐ বালিশের নীচে কাপড়ে বাঁধা যাহা পাইবেন, তাহা দিয়া সীতার চিকিৎসা করাইবেন, এবং নিজেও যতদিন চলে বাড়ীতে

রাখিয়া যাইবেন,—আমার সহিত আবার দেখা হইবে, এখন দাসী চলিল"—এই বলিয়া বিনোদের পদধূলী আবার লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। বিনোদকে কিছুই বলিবার অবকাশ দিল না।

বিনোদ বিস্মিতা হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। বালিশের নীচে কি আছে দেখিবার জন্ত কৌতূহল জন্মিল। ধীরে ধীরে নিদ্রিতা নীলার বালিশের নীচে হাত দিয়া যাহা ছিল তাহা আনিয়া দেখিয়া আরো বিস্মিতা হইলেন।

মনে মনে বলিলেন, "রমা কি মানুষী না দেবী? রমা আমায় তার সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছে?" পরে একটি একটি করিয়া গণিয়া দেখিলেন—বায়ান্ন টাকা ও দুটী সিকি ও একটি দুয়ানী। টাকা গুলি পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব সুখের কথা মনে পড়িল, চক্ষে জল আসিল।

* * * * * * *

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া উহার দুটী সিকি একটি দুয়ানী এবং চারিটি টাকা বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট, একটি ছোট মেটে ঘটে পূরিয়া ঘরের মেঝের প্রোথিত করিলেন। এ বারে আর সাহস করিয়া অপরের নিকট রাখিলেন না। তৎপর পরিষ্কার করিয়া গৃহ লেপন করিয়া, কবিরাজের বাড়ী গমন করিলেন।

কবিরাজের নাম বংশীধর চক্রবর্ত্তী—কলিকাতার রমানাথ প্রভৃতি যে শ্রেণীর কবিরাজ ছিলেন, ইনি সে শ্রেণীর কবিরাজ নহেন। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি পড়া থাকিলেও ইনি একজন সাধারণ কবিরাজ, কিন্তু ধরণটা বড় একটা ডাক্তারের মত। বুট জুতা, সাহেবী কোট, কোটের পকেটে একটি থরমোমিটার ও হাতে একটি ষ্টেথস্কোপ না হইলে ইহাঁর চলে না। চিকিৎসা প্রণালীও ঐরূপ নববিধান গোচের। কবিরাজ, হাকিমি, হোমিওপেথি, এলোপেথি সকলই ইহাঁর দ্বারস্থ। বয়েস চল্লিশের নীচে, চেহারাটা জাঁকাল বটে।

বংশীধর প্রাতে উঠিয়া "মহাজ্বরহন্তারক" বটিকা প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহার এই মহৌষধের গুণে দেশে বিলক্ষণ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে। বংশীধরের মৃত্যু হইলে পাছে এই ঔষধটি লোপ পায় এইভয়ে, দেশের লোকের উপকারের জন্ত, এ স্থলে উহা প্রস্তুতের উপায় লিখিত হইল। ভরসা করি আপাতত ইহা কেহই প্রকাশ করিবেন না, তাহা হইলে বংশীধর নিশ্চয়ই

গ্রন্থকারের উপর চটিয়া যাইবেন। ঔষধ তৈয়ার কারবার নিয়ম এই—"চল্লিশ ভাগ কুইনাইন, একভাগ অহিফেন, একভাগ রসাঞ্জন, একভাগ ছোট এলাচি চূর্ণ, আর একভাগ গমের আটা। জ্বর ছাড়িলে শুষ্ক দুগ্ধ সহ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক এক বটিকা ধন্বন্তরি স্মরণ পূর্ব্বক সেবনীয়, জ্বর একবারে পালাইবে। কুইনাইনের অভাবে গুলঞ্চের পালো বা আতীশ চূর্ণেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পেক্ক-বন্ধন মিশাইতে হইবে।"

যাহা হউক বংশীধর ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল—এমন সময় বিনোদ তাহার বাড়ীর ভিতরে আসিয়া তাহার মায়ের হাতে দুটী টাকা দিয়া কান্দিয়া বলিলেন, "আমার অধিক দিবার সাধ্য নাই, সম্প্রতি এই দিলাম, পরে ভাল হইলে আরো চারি টাকা দিব, আপনি আপনার ছেলেকে একটু ভাল করিয়া বলিয়া দিন, উনি যেন মনোযোগ করে আমার নীলার চিকিৎসা করেন। এখনই দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।"

বংশীধরের মা যথার্থই ভাল করিয়া দু কথা বলিলেন, বংশীধর তাহাতে বলিল—"ভাল করিয়া দিব, একবারে আর দুটী টাকা দিতে বল, আর যাহা হয় পরে দিবেন, আমার সব দামী ঔষধ জান ত মা?"

বিনোদ নিজ কাণে এই কথা শুনিতে পাইয়া তখনই বলিলেন, "সঙ্গে ত আর টাকা আনি নাই, নীতাকে দেখিতে গেলে পর আর দুই টাকা দিব।"

মনুষ্য মাত্রেই ইচ্ছা করিলে পরের উপকার করিতে পারে। ব্যবসায়ীগণের ব্যবসায়ে না নিলে চলে না, তাই বলিয়া যে গরীব দুঃখীর উপরও নিষ্ঠুরতা করিতেই হইবে, এমন কোন যুক্তি ব্যবসা-বিজ্ঞানে লিখিত নাই।

বংশীধর বিনোদের দুঃখের অবস্থা—দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন, নীলার চিকিৎসা করিয়া চারিটি টাকা না লইলে—মনুষ্য সমাজে তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি সেরূপ শ্রেণীর চিকিৎসক নহেন। অনেক চিকিৎসক ব্যাধি মুক্তি করাকেই সন্তুষ্টির পরিণাম জ্ঞান করেন। রোগী মরুক বা বাঁচুক বংশীধর টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট। পল্লী কি সহরে আজিও এই শ্রেণীর চিকিৎসকই অধিক; সাধারণ চিকিৎসকগণের উপর একটু গবর্ণমেণ্টের আঁটা আঁটি থাকিলে ভাল হইত। পরীক্ষা না দিয়া উকীল মোক্তারী করিতে পারা যায় না, কিন্তু কোন্ ব্যবস্থা ক্রমে পরীক্ষা না দিয়া চিকিৎসক হইতে পারা যায়, বুঝিতে পারি না। এক দিকে বিষয় সম্পত্তি, অপর দিকে

জীবন, ইহার কোনটী গুরুতর? এই প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সমস্ত মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

অনেক চিকিৎসকের স্বভাব এই, যে সকলের আগে ডাকিবে, তাহার বাড়ী সকলের শেষে যাইতে হইবে, অথবা অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তত গৌণ করিয়া যাইতে হইবে। কেননা তাহা না করিলে পসার হয় না, রোগীর বাড়ী যাইয়া বলা চাই—"একাকী কত রোগী দেখিব, প্রায় পঞ্চাশটী রোগী দেখিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে" ইত্যাদি।

বিনোদ প্রাতে বংশীধরকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং বংশীধর হিসাব মত অপরাহ্নে তাহার বাড়ী গমন করিলেন। বিনোদ আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

বংশীধর ধীরে ধীরে জুতা খুলিয়া নীলার পার্শ্বে ভাল করিয়া বসিলেন,—কিছুকাল পরে বিনোদকে বলিলেন, "আপনার হাত দিন।" বিনোদ বংশীধরের সহিত কথা কহেন না। নীলা হাত বাড়াইয়া বলিল "দেখুন।" বংশী বলিলেন, "আগে তোমার মায়ের দেখিব।"

এই কথায় বিনোদ কিছু ভীতা হইলেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নীলার অসুখ বলেই আপনাকে আনা হয়েছে, আমার নিজের কোন অসুখ নাই।"

এই বারে কবিরাজ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝিতে পারেন নাই, আগে আপনার নাড়ী দেখিলে আপনার কন্যার নাড়ী দেখিয়া বৈলক্ষণ্য অনুভব করিতে পারিব, এই জন্য আপনার হাত দেখিতে চাই।"

বিনোদের বুদ্ধি কিছু পরিষ্কার, বলিলেন, "নিজের নাড়ী আগে দেখিয়া নীলার হাত দেখুন।"

এইবারে কবিরাজ হারি মানিলেন, বিনোদের পরামর্শানুরূপই কাজ করা হইল।

নীলার হাত দেখিয়া কবিরাজ বলিলেন, "জ্বর এখন বেশী নাই—আমাশয় কিরূপ, রক্ত পুঁইজ নির্গত হয় কি না?"

বিনোদ বলিলেন, "রক্ত পুঁইজ পড়ে।"

"মল দুর্গন্ধ কি না?"

"অতিশয়"

"দিন রাতে কতবার ?"

"দিনে ২।৪ বার, রাতে অনেকবার"

"পেটে বেদনা কেমন ?"

"আগে ছিল, এখন নাই"

"পীড়া কত দিন ?"

"প্রায় পাঁচ মাস ?"

"আহারে রুচি কেমন ?"

"রুচি নাই"

বংশীধর কিছুকাল নীলার আপাদ মস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া বিষণ্ণবদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

কবিরাজের এই ভাব দেখিয়া দুঃখিনী বিনোদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আর দুটা টাকা তাঁহার হাতে দিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার দুঃখিনীর সন্তানকে ভাল করিয়া দিন, অবহেলা করিবেন না।"

বংশীধরের বদন প্রসন্ন হইল, টাকা দুটী পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আপনার কন্যাকে ভাল করিয়া দিব, কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে।"

বিনোদ ভীতা হইয়া বলিলেন, "বলুন শুনি ?" বংশীধর বলিলেন 'যাহা বলিব তাহা করিবেন, প্রতিজ্ঞা কর তবে বলিব।"

বিনোদ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"প্রতিজ্ঞা না করিলে ?"

"চিকিৎসা করিব না"

চিকিৎসার জন্য ত টাকাই দিব।"

"আর টাকা লইব না"

"কাহা লইয়াছেন ?"

"তাহাত দর্শনী"

এইবারে বিনোদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ধর্ম্মে হাত না দিয়া আর যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব—বলুন।"

বংশীধর হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সতী, আপনি মাতৃ তুল্য, সন্তানের কাছে সে ভয়ের কারণ নাই, আমি শুনিয়াছি আপনি রূপবতী ও বিদ্যাবতী.

আমি যেরূপ লিখিয়া দিই, সেইরূপ তিনখানি চিঠি আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে, চিঠিতে কাহারও নাম থাকিবে না।”

বিনোদ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। এবং নিস্তব্ধ, চিঠি তিন খানি লিখিয়া দেওয়া হইল।

একাদশ অধ্যায়।

অমানিশার ঘোর অন্ধকার, তায় শীত রজনী, তাহার উপর বাতাস হইতেছে এবং টুপ টাপ বৃষ্টি পড়িতেছে। রজনী প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। গ্রাম যেন মহা শ্মশান।

বিনোদ নীলার পার্শ্বে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন!—দেখিতেছেন, ভুবন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার শরীরের সুবাসে বাড়ী আমোদিত। তাহার গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট। পরিহিত বসনে ফুলের পাড়। বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, ‘একি ভুবন, বাল্যকালে একদিন ঐরূপ ফুলের মালা ফুলের মুকুটে আমায় সাজাইয়াছিলে, আজ আপনি সাজিয়াছ। একুল কোথা পাইলে?’ ভুবন হাসিয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী দেখাইল। বিনোদ—চাহিয়া দেখিলেন, অনন্ত স্বর্ণসিড়ি ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার প্রাঙ্গণে আসিয়া মিশাইয়াছে; সিঁড়ির দুপাশে অনন্ত অসংখ্য ফুলের টবে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

ভুবন হাসিয়া বলিল, ‘বিনোদ কি ভাবিতেছ—এই শেষ দেখা। প্রতিজ্ঞা পূরণ কর, নীলাকে দেও, লইয়া যাই।’ বিনোদ নীলাকে আনিয়া তাহার করে সমর্পণ করিলেন; নীলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বিনোদের অঞ্চল ধরিয়া বলিল, ‘মা তবে যাই, পারি যদি আবার আসিব। মা তুমি আমায় আর দেখিবে না, আমি কিন্তু চিরদিনই তোমার ঐ মুখ চাহিয়া দেখিব। মা তোমার সহিত কথা কহিতে পারিব না বটে, কিন্তু তুমি যখন যা বলিবে, অমনি সকলি শুনিব। মা তুমি মনে করিবে আমি যেন কত দূরে রহিয়াছি, আমি কিন্তু সদাই তোমার কাছে কাছে থাকিব।’ বিনোদ কাঁদিতে লাগিলেন, ভুবন ও নীলা ফুলের ঐশ্বর্য্য সহ নিমেষে বায়ুতে মিশিয়া গেল। বিনোদ হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিলেন

শূন্য ! অমনি জাগিলেন, জাগিয়া দেখিলেন নীলার জীবন-শূন্য হিম দেহ শয্যার এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। বিনোদের শূন্য হৃদয় আর পূর্ণ হইল না ; অস্থির প্রাণ আর সুস্থির হইল না। 'হা নীলে, হা নীলে !' বলিয়া উচ্চ রবে রোদন করিতে লাগিলেন।

নিকটবর্ত্তী বিশুবাবু এবং আর আর স্বজাতীয় প্রতিবেশীরা বিনোদের উপস্থিত বিপদ বুঝিতে পারিয়াও কেহ আসিল না। মাঘ মাসের অন্ধকার রজনী, তায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি—লেপ কাঁথা ছাড়িয়া কেহ আসিল না। যাহার ধনবল বা জনবল আছে, তাহার কখনও এদুর্দ্দশা হইত না। আজ তাহার বাড়ী লোকের হাট বসিয়া যাইত। যাহার প্রয়োজন নাই সেও সান্ত্বনা ও শিষ্টাচার করিতে আসিত। দুঃখিনী বিনোদের টাকা নাই, উপার্জ্জনশীল দেবর ভাশুরও নাই, সুতরাং তাহার জন্য সান্ত্বনা বা শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি ? কেহই আসিলনা ; ভাবিল কাল সকালে যা হয় তা করা যাইবে। সংসার প্রায় এই রূপ।

বিনোদ নীলার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সেই রামধন চণ্ডাল ও তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামধন তাহার স্ত্রীকে বিনোদের নিকট রাখিয়া পাড়ার ব্রাহ্মণ ডাকিতে গেল। সকলেই এই আপত্তি করিয়া আসিল না যে,—কাঠ কোথা ? অথচ সকলেই একখানি করিয়া কাঠ দিলেই বালিকার প্রেতকার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। রামধন ক্রোধ করিয়া বলিল—"এ গাঁয়ে সব শালাই চণ্ডাল।"

রামধন অমে ছাড়িবার লোক নহে, তথা হইতে বাড়ীতে গিয়া নিজ কন্যা জামাতাকে ডাকিয়া তুলিল—বলিল, "বাবা দুখানি কুড়ালী লইয়া বাহিরে আয়।" জামাতা তাহাই করিল। রামধন একটি আমের গাছ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিল, "তুই ঐ গোয়ালঘর শীঘ্র ভাঙ্গিয়া ফেল, গোরু আমার শোবার ঘরে বান্ধিয়া রাখ।"

উভয়েই বলবান অতি শীঘ্র অনেকগুলি কাষ্ঠ হইল। তখন সে এবং তাহার জামাতা মাথায় করিয়া সেইগুলি নদী তীরে—রাখিয়া আসিল। পশ্চাৎ সকলকে অতি কষ্টে ডাকিয়া আনিল। শব লইয়া নদীতীরে উপস্থিত

হইয়া সকলেই বিস্মিত হইল—"সর্ব্বনাশ দশটা শব দাহ করিতে পারা যায়, এত কাঠ কোথা হইতে আসিল।"

রামা চণ্ডালের গুণে রজনীতেই নীলাম্বর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি নির্ব্বাহিত হইল। বৈদিক ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হিন্দুর যত বিপদ, অন্য কোন জাতির এত সাংসারিক বিপদ নাই। এই শোক দুঃখের উপরে বিনোদকে কন্যার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিতে হইবে। তৃতীয় দিনে এই কার্য্য হওয়া চাই।

বিনোদ মনে আশা করিলেন যে, টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছি, তাহা হইতে কয়টী টাকা তুলিয়া দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন! সুতরাং যথায় টাকা রাখিয়াছিলেন, তথাকার মাটি তুলিতে লাগিলেন, ক্রমে অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁড়িলেন, টাকা পাইলেন না, সে মাটির ঘটও পাইলেন না। ভাবিলেন বুঝি জায়গা ঠিক হয় নাই, এই মনে করিয়া গৃহের সর্ব্বত্র খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিলেন তথাপি টাকা পাইলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় রামার স্ত্রী তাঁহার নিকট আসিল; রামা সর্ব্বদাই তাহাকে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ জন্য পাঠায়। রামার স্ত্রী বলিল "ঠাকুরাণী কাঁদিয়া আর কি হইবে? কাল শ্রাদ্ধ হইবে তাহার কি করিয়াছ? আমাদের চারিটী গরু, এগার সের দুধ হয়, তাহা গোয়ালার বাড়ী দৈ করিতে দিয়াছি; আর কাল যে দুধ হইবে তাহা ক্ষীর করিবার জন্য দেওয়া যাইবে, আপনার দুধ ক্ষীরের জন্য ভাবিতে হইবে না।"

রামার স্ত্রীর এই আশ্বস্ত বাক্যে বিনোদ কিছু স্থির হইয়া তাহাকে আমূল বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন।

রামার স্ত্রী শুনিয়া বলিল, "টাকা ঘর ছাড়া হয় নাই, মাটি খোঁড়া আপনার আমার কাজ নয়, আপনি ঘরের জিনিস পত্র স্থানান্তর করুন, আমি আমার জামাইকে পাঠাইয়া দিই গে, সে আসিয়া টাকা তুলিয়া দিবে।"

কিছু কাল পরে রামার জামাই আসিল, বিনোদ—তাহাকে স্থান দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও টাকা আর পাওয়া গেল না। বিনোদ নৈরাশ হইলেন, রামার জামাইও অকৃতকার্য্য হইয়া স্ব গৃহাভিমুখে চলিল।

বিশু বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, রামার জামাইকে অসময়ে বিনোদের গৃহ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া বলিলেন। "হাঁ রে ভুতোর মা বাড়ীতে আছে?"

"আছেন"

"তুই তাঁর ঘরে ঢুকিয়াছিলি কেন?"

রামার জামাই কি বলিবে, কিছু ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া গেল। বিশু-বাবু তাহাকে মনে মনে কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী স্থির করিয়া বিনোদের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন; "বউ তোমার একি ব্যবহার? তোমাকে ভাল বলিয়া জানিতাম, এত ব্রাহ্মণ কায়স্থ থাকিতে তুমি চাঁড়াল ঘরে আন!"

এই ভয়ঙ্কর কথায় বিনোদ মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া কেবল বলিলেন; "হা বিধাত, হা ধর্ম্ম, হা পরমেশ্বর, এখনই ব্রহ্মাণ্ড খসিয়া পড়ুক। এ বৃথাপবাদীর মুখ খসিয়া পড়ুক।"

বিশু বাবু যদি লোক তত্বজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইত, এবং বুঝিতে পারিতেন, বিনোদ নিষ্পাপিনী। দুর্ভাগ্য বশত বিশু সেরূপ লোক নহে, পরন্তু তিনি উহাতে বিকট হাস্য করিয়া এমন একটি ঘৃণিত কথা উচ্চারণ করিয়া বলিয়া গেলেন, যে তাহা শুনিয়া বিনোদ লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গেলেন। আমি সেই শব্দ এ স্থলে প্রয়োগ করিয়া মসী ও লেখনী কলঙ্কিত করিব না।

পরদিন বেলা আটটার সময় গোয়ালা দধি দুগ্ধ দিয়া গেল, প্রতিবেশিনী এক কায়স্থ রমণী চিড়া খই দিয়া গেল, রামা আসিয়া দুটী টাকা বারটী দোয়ানী ও কয়েক সের চিনি দিয়া গেল, আর রামার স্ত্রী আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গন গোময় দিয়া পরিষ্কার করিয়া গেল। দুর্ভাগ্য বশত এই সকল আয়োজন কাজে আসিল না। পুরোহিত আসিলেন না, ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না; বিশু বাবু বলিয়া পাঠাইলেন, "ভুতোর মা চণ্ডাল ভোজন করাক্।" বলা বাহুল্য যে এই অচিন্তনীয় ব্যবহার শেলসম বিনোদের হৃদয়ে বিদ্ধ রহিল।

ধূপছায়া।

আমরা ধূপছায়া বড় ভালবাসি। যোগী ধূপছায়ার নামাবলী গায়ে দিয়া ইষ্ট মন্ত্র আরাধনে নিরত, যুবতী ধূপছায়ার চেলী পরিধান করিয়া ঠাকুর বরণে বিব্রত, বালক ধূপছায়ার র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া খেলিতে আসক্ত। আমাদের যে দেশে বাস, তাহাতে ধূপছায়ার আদরই সমধিক। শীত প্রধান উত্তর প্রদেশে কেবল কুয়াসা, হিমানী, বরফ সেখানে ছায়ার আদর কোথায়? সেখানে লোকে চায় ধূপ। আবার উত্তপ্ত সাহারাখণ্ডের লোক ধূপের জ্বালায় অস্থির, তাহারা চায় ছায়া। আর আমাদের ভারতে,—এই শীত গ্রীষ্মময় ভারতে,—বেগবতী নদী, ছায়াবতী অরণ্যানি, তুষার ধবল হিমানী, শ্যামল সুবিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র, জল শূন্য তরু শূন্য মরুভূমি—সঙ্কুল ভারতে,—আমরা দুই চাই; আমরা ছায়াও চাই; ধূপও চাই; আবার সর্ব্বাপেক্ষা আমরা চাই ধূপ-ছায়া।

এই ধূপছায়া আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এখন এমনই হই-য়াছে, যে আমরা যাহা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহা অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারি তাহার ভিতর ধূপছায়ার ভাব আছে বলিয়া এত প্রীতিকর। আমরা বসন্তের মাধুর্য্যে মোহিত, কেননা বসন্ত ধূপছায়াময়। শীতের তেজ কমিয়াছে, নিদাঘের কাল আসে নাই, এই ধূপছায়ার সময় কাজেই বড় মধুর, মনো-মোহন? তাহার পর শরৎ; শরৎ কালের শোভাও আমরা বড় কম ভাল বাসি না। বসন্ত ও শরৎ বৎসরের মধ্যে ধূপছায়ার সময়, তাই আমাদের এত প্রীতিকর। নচেৎ নিদাঘের শৌর্য্য, বর্ষার গাম্ভীর্য্য, হিমের প্রাখর্য্য—এ সকল শরৎ বসন্তে ত কিছুই নাই; তবুও যে শরৎ বসন্ত এত প্রীতিকর সে কেবল ধূপছায়ার গুণে। আবার দিনের মধ্যে গোধূলীর সৌন্দর্য্য সকলেই অনুভব করেন। বসন্ত কালের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বাস্তবিকই অপূর্ব্ব মাধুরিময়, মধুরে মধুর; বসন্তে গোধূলী—ধূপছায়ায় ধূপছায়া, তাই এত সুন্দর।

ধূপছায়ার মোহে পড়িয়াই ভারতের কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

"বসনে পরিধূসরে বসানা,
নিয়ম-ক্ষাম-মুখী ধৃতৈক-বেণিঃ।

অতি নিষ্করুণভ শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহ ব্রতং বিভর্ত্তি ॥"

পরণে ধূসর বেশ, এক বেণী রুখু কেশ
ব্রত-নেমে ম্লান-মুখী, শুদ্ধ-শীলা হেন,
আমি অতি নির্ম্মম,— শোভিতেছে প্রিয়া মম,
সুদীর্ঘ বিরহ-ব্রত ছবি খানি যেন।

কোন্ চিত্র এ চিত্রের সমান। কোন্ মূর্ত্তি এই মূর্ত্তি অপেক্ষা সুন্দরী। যিনি কবি, তিনিই ইহার মাধুর্য্যে মোহিত, যিনি ভাবুক, তিনিই ইহার ভাবে বিভোর। বাঙ্গালীর কবিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্যই বলিয়াছেন "ভৈরবী অতি-শয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—বসা ফানুসের ভিতর আলোর মত রূপের আগুণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।"

এত গেল বাহ্য জগতের ধূপছায়ার কথা। আমাদের অন্তরের ভিতর যে ধূপছায়া লাগিয়াছে, যে ধূপছায়ার বলে আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং বাঁচিয়া থাকিব বলিয়া আশাও করি, এক্ষণে সেই ধূপছায়ার কথা বলিতেছি। সকলেই জানেন আশার বলে জীবিত থাকি। যিনি আসন্ন মৃত্যু রোগী, তাঁহারও আশা তিনি বাঁচিবেন; যিনি দারিদ্রের দারুণ দায়ে জর্জ্জরিত, তাঁহার আশা এমন দিন থাকিবে না, ভাল দিন শীঘ্রই আসিবে; যিনি বিপন্ন তাঁহার আশা ঈশ্বর কৃপায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন; যিনি ইহজন্মে কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, তাঁহার আশা পরকালে তাঁহার ভাল হইবে; যিনি বন্দী, তাঁহার আশা মেয়াদ ফুরাইলেই আবার স্ত্রী পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন; যিনি দাসত্বের লাঞ্ছনায় চির বিড়ম্বিত, তাঁহার আশা কোন না কোন দিন পর-সেবার, পর-সেবার দায় হইতে মুক্ত হইবেন; এইরূপ নিরাশায় আশা সঞ্চারকেই অন্তরের ধূপছায়া বলিতেছি। ইহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি। যদি জানি-তাম এ রোগ আর সারিবে না, এ দারিদ্র আর ঘুচিবে না, এ বিপদ হইতে উদ্ধার নাই, কষ্টের অবধি নাই, মেয়াদ ফুরাইবে না, দাসত্ব যাইবে না—তাহা হইলে আর এক দিনও বাঁচিতে পারিতাম না। সেই জন্যই বলিতে হয় আমরা কেবল ধূপছায়ার ধাঁধাতেই বাঁচিয়া আছি। মৃত্যু—জীবনের অভাব জ্ঞাপক অথচ আমরা এই ধূপছায়ার শক্তি বলে "মরিলে বাঁচি" বোধ হয়

জগতে আর কোন জাতি মরিলে বাঁচে না, মরিলে মরিয়া যা ; কেবল আম-রাই মরিলে বাঁচি।

ধূপছায়া আর এক মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করে। আনন্দের সময় শোকের উদ্দাম, দুঃখের সময়ে সুখের আশ্বাস—ইহাও এক রকম ধূপছায়া। যুবতী রমণী একটু শিশু পুত্র লইয়া বিধবা হইলেন। সেই শিশু পুত্রটীর মুখপানে চাহিয়া পতি শোক যাপ্য করিলেন, তাহার লালন পালনে সদা বিব্রত, তাহাকে লইয়াই সংসারে সংসারী। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, কৃতবিদ্য, যশস্বী, ধনশালী হইল, দুঃখিনী মার আনন্দ আর ধরে না। তার পর পুত্রের বিবাহ দিয়া পরম রূপবতী সদ্‌বংশ-সম্ভূতা পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন, আবার দিন কতকপরে পৌত্র মুখাবলোকন করিয়া ইহজন্মের সাংসারিক সুখের সীমা পাইলেন। এত সুখের সময় কেন তিনি, সময় পাইলে বিরলে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন আবৃত করিয়া দুই ফোঁটা গরম জল ঢালেন? কেন তিনি এক এক সময় মধ্যে মধ্যে বলেন "এ দিনে যদি তিনি থাকিতেন" "হায়, তিনি এ সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না।" এত সুখের দিনে মায়ের কষ্ট কেন? চক্ষে জল কেন? ইতি পূর্ব্বে যখন পুত্রের লালন পালনে কষ্ট পাইতেন, পুত্রের ভরণপোষণের জন্য কষ্ট পাইতেন, যখন পুত্রের শিক্ষার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত, তখন তাঁহার মনে আশা জাগরূক, ঈশ্বর দিন দিবেন, এ দুঃখের দিনের অবসান হইবে। এখন সময় ফিরিয়াছে, এখন আশা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে; এখন সুখ পূর্ণমাত্রা, এখন আর আশার সুখ নাই, এখন স্মৃতিতে কষ্ট ভোগ। তবে দুঃখের সময় সুখের আশা, সুখের সময় দুঃখময়ী স্মৃতি—ইহাকেই বলিতেছিলাম ধূপছায়ার অপর মূর্ত্তি। কখন সুখের সময় দুঃখের ছায়াময়ী স্মৃতি, আবার কখন দুঃখের তামস মধ্যে সুখের উজ্জ্বল আশা,—আমাদের জীবনের ধূপছায়ারূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। তাহা না হইলে হয়ত আমরা সুখের জ্বলন্ত রশ্মিতে পুড়িয়া মরিতাম, না হয় কষ্টের কঠোর ছায়ায় জমিয়া যাইতাম। সুতরাং ধূপছায়া অন্তরে বাহিরে আমাদের চির সহচরী; কাজেই আমরা অন্তরের সহিত ধূপছায়া ভালবাসি। ধূপছায়া সুখের সময় শান্তি-বিধায়িনী, দুঃখের সময় আশা-দায়িনী।

আইনের দশাবতার।

স্তোত্র।

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

প্রথমে য এল রূপ, তব অবতার।
অনন্ত 'কানন' প্রভু, কর ছারখার॥
কণ্ঠস্থ ব্যবস্থা বিধি, শক্তি চমৎকার।
না বুঝিয়া অর্থ, কর অনর্থ সঞ্চার॥

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার॥

দ্বিতীয় উকিল রূপে, রক্তবীজ বংশ।
ধন্য অবতার তব, পূর্ণ, নচ অংশ॥
চালাকি চাতুরি শক্তি, বোকামি সহিত।
দেখাও ভারতে তুমি, যথামি উচিত॥

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার॥

তৃতীয়েতে মুনসেফ, অবতার ধর।
সামলা—শোভিত শিরে, মঞ্চের উপর॥
সুতাহাটে বসে তুমি, সুতা বিক্রী কর।
সেই সূত্রে সর্ব্বনেশে, বিচার বিতর॥

জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

চতুর্থাবতারে তুমি, সব্ জজ আকার।
রায় বাহাদুর আর, আপিলের ভার॥
মুন্সেফের রায় তুমি, খণ্ড খণ্ড কর।
নিজ রায়ে কিন্তু দেব, উচ্চ হস্তে মর॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

পঞ্চমেতে পঞ্চানন- তুল্য ভোঁপা বর্ম্।
ছোট আদালত জজ, বিচারের যম॥
হক্, না হকের কাণ্ড, মাথা মুণ্ড সার।
ছই-চক্ষু-ব্রতে তুমি, বিতর বিচার॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

ষষ্ঠ অবতারে তুমি, ভার্গব আচারী।
জেলার জবর জজ, ক্ষত্রিয়ান্তকারী॥
স্বহস্তে লোকের মুণ্ড, বিচার কুঠারে।
নির্ভয়ে কটাহ তুমি, বারে বারে বারে॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

সপ্তমাবতার তব, পঞ্চাঙ্গ বধন।
রাজবৃত্তি ধ্বংশ করি, সদানন্দ মন॥
প্রকৃতিস্থ হবে তুমি, দিবে পরিচয়।
মূর্ত্তিমান বোকারাম, কর্ম্ম-ক্ষম নয়॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

অষ্টমাবতারে প্রভু, কর্ম্ম হবে সার,
—তাশ, পাশা, দাবাখেলা, মাছ্ ধরা আর॥
তখন উপাধি ভরে, মরিবে গুমরে।
কিন্তু কেহ ডাকিবে না, মোট বহিবারে॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

নবমে নবীন বঙ্গে, বিধির নিয়তি।
নাতি কোলে যার দেশে, স্থাপিত মুরতি॥
ভিক্ষার্থী তাড়না তরে, বিবৃত হইবে।
অনন্ত কটূক্তি দেব। সঞ্চয় করিবে॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে বিচারের ভার॥

দশমে দিগন্ত ব্যাপ্ত, হবে যশোভার।
জাওর কাটিবে যাহা করেছ বিচার॥
ভ্রম-রতি বলে লোক, শুনিয়া হাসিবে।
পাগলে, লজ্জায় সবে, পিঞ্জরে পূরিবে॥
জয় জয় জয় দেব, ধর্ম্ম অবতার।
কিবা গুণে ধর বঙ্গে, বিচারের ভার॥

জয়—
কানুন-কণ্ঠস্থায়, নজীর-ধ্রুবস্থায়,
শামলা শিরস্থায়, কপোলস্থ হস্তায়,
ভো ব্যস্ত সমস্তায়, কাছারি তটস্থায়,
পঞ্চাস্ত্রে শিকস্তায়, মাছ-ধরা কস্তায়,
দ্বারে জবরদস্তায়, শেষে-পিঞ্জরস্থায়,
আইনাবতারায়, দশাবতারায় নমো।

হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার।

চন্দ্রশেখর সেন

("নবজীবন ও বেদব্যাস।")

আমরা নবজীবনের অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়াই অনুভব করিয়াছিলাম, বাঙ্গালায় নব-ধর্ম্ম-যুগের আবির্ভাব হইবে। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী এবং নব্য হিন্দু সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া কুহকাবৃত হিন্দুধর্ম্মের রহস্য সকল সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন। প্রাচীন ও নব সম্প্রদায়ের এই ধর্ম্মান্দোলনকে ধর্ম্ম সংস্করণ কি ধর্ম্ম সংরক্ষণ বলিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে কেহই ভাবে নাই! সুতরাং আমরাও সরলভাবে এই ধর্ম্মান্দোলনের নাম দিয়াছি—"প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার।" ধর্ম্ম সংস্করণ ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ যে একার্থ বাচক নহে, তাহা শাস্ত্র জ্ঞান বিহীন ব্যক্তিও কেবল অভিধানের সাহায্যে বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু এই হুজুক প্রধান বঙ্গভূমিতে যে 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, সেই ভিত্তি হীন আন্দোলনকেও যিনি ধর্ম্মসংস্করণ না বলিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণ বলিতে পারেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। সুতরাং প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, কি ধর্ম্ম সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যিনি বুঝিয়াছেন, এবং স্বয়ং বুঝিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি আমাদের পরম ভক্তিভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য বাঙ্গালায় অলক্ষ্যভাবে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তাহার ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নবজীবনের সূচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং বেদব্যাস সম্পাদকও "পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন.—"১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে যেন ভারতের উপর ভগবানের কৃপা দৃষ্টি পড়িল। * * * নব্য সম্প্রদায়ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় আচার্য্যবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় যেন স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। * * * * * যখন তিনি তাঁহার কঠোর সাধনা-লব্ধ প্রতিভা বলে শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন লোকের চমক ভাঙ্গিল। * * * চারিদিকে হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা

হইতে লাগিল।" ইত্যাদি আমরাও "হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি, "বলা অসঙ্গত নয় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলনের ফলই নবজীবন।" নবজীবন ধর্ম্মসংস্করণ উদ্দেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কি ধর্ম্মসংরক্ষণরূপ অলৌকিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তবে সম্পাদক, নবজীবনের সূচনাতে এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, —"ধর্ম্মের বিশ্বাদর ভাব যে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, সে স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তবে নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমারা নিজেও বুঝিব, এবং সাধারণকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এ ইচ্ছা আমাদের আছে। * * * বাঙ্গালায় ধর্ম্মবৃক্ষের যে নব অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাতে যদি তাহা বাতাতপ-কীট-পতঙ্গ হইতে দু দিনের জন্যও রক্ষা হয়, তবে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিব।" এবম্বিধ উক্তির বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলেই হইল, নবজীবনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসংস্করণ কি ধর্ম্মসংরক্ষণ? আমরা বেশী কিছু বলিব না।

হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ (বা সংরক্ষণ জন্য নবজীবন ও প্রচার সহোদর ভ্রাতার ন্যায় প্রায় একই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের নেতারূপে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়, এবং নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারূপে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাগুক্ত পত্রিকাদ্বয়ের প্রাণ স্বরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন বলিয়া সাধারণে বুঝিয়াছিল। একজন প্রাচ্য শিক্ষিত অপর ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষিত, ইঁহাদের পরস্পরের মতের যে সম্পূর্ণ ঐক্য হইবে না, ইহাত জানা কথা। তাই বলিয়া চূড়ামণি মহাশয়কে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ যে কখনও অসম্মান বা অভক্তি করিয়াছেন, এমত আমরা শুনি নাই। বলিতে গেলে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণই চূড়ামণি মহাশয়কে এত উচ্চ আসন প্রদান করিয়া, হিন্দুর ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন। একজন প্রাচ্য শিক্ষিত—উদারচেতা—সদ্বক্তা—পণ্ডিতের সহিত, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের সম্মিলন, বাঙ্গালায় এক অভিনব কাণ্ড। তাই আমরা এই রাসায়নিক সংযোগের পূর্ব্বাভাস পাইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিলাম। তেমনি এই শুভ সংযোগে কেন বিয়োগ ঘটিল, তাহাই বুঝিতে ও সাধারণকে বুঝাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন চূড়ামণি মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটন করি নাই এবং বেদ-ব্যাসের হিতৈষী ও লেখকগণকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের

সূত্রপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধ বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া, একটু তলাইয়া পাঠ করিলে, বেদব্যাস-সম্পাদক কি বেদব্যাসের পৃষ্ঠপোষকগণ এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না।

প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসাহে প্রকাশিত পত্রিকা—নবজীবন বর্ত্তমানে, 'বেদব্যাস' কেনই বা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ সাধারণে বুঝিতে পারে নাই। শুনিয়াছিলাম, ভূধর বাবু তৃতীয় বর্ষের সূচনায় বেদব্যাসের অকস্মাৎ আবির্ভূতির কারণ কি, তাহা পরিষ্কাররূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু সে আশা বিফল হইয়াছে। ভূধর বাবু 'সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে' তাহা বুঝাইবেন বলিয়াছেন। কেবল বেদ-ব্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বেদব্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ—অতি উচ্চ। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেবল মানুষের কর্ত্তৃত্বে সে উদ্দেশ্য সাধন হওয়া অসম্ভব, সুতরাং আমাদের সমস্ত আশা ভরসা তাঁহারই উপর নির্ভর করি-তেছে।" পাঠকগণ কি বুঝিয়াছেন জানি না; সুতরাং আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কেবল বুঝিয়াছি "সাধারণের বিশ্বাস, যে বঙ্গবাসী ও বেদব্যাস—চূড়ামণি মহাশয়ের কাগজ" তাহা প্রকৃতই ভুল। কিন্তু এরূপ ভুলের কথা আমরা কোথাও বলি নাই। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, চূড়ামণি মহাশয় অকারণ প্রবন্ধ 'কাটা ছাঁটার' অভিযোগ আনিয়া নবজীবনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, একখানি প্রতিযোগী পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, নানা কারণে বেদব্যাস এই সুবিধা পূরণ করিয়া দিল। প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি গালাগালির ঘোঁট হইতে লাগিল। বঙ্গবাসী সময় বুঝিয়া খাঁটী হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ পত্র সাজিয়া এই বিবাদ বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে কসুর করিলেন না। বঙ্গবাসীতে ও বেদ-ব্যাসে অধিকাংশ প্রবন্ধই চূড়ামণি মহাশয় লিখিতে লাগিলেন। অথচ বলিতে লাগিলেন "অহিন্দু মতের পত্রিকা নবজীবন ও প্রচারের সহিত আমার কিছু মাত্র সংস্রব নাই।" আমরা জানিতে ব্যগ্র হইয়াছি, কি দোষে নবজীবন ও প্রচার অহিন্দু মতের পত্রিকা হইল, আর কি গুণে বঙ্গবাসী খাঁটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে কর্ণধাররূপে পাইল? এবং চন্দ্রশেখর বাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবন্ধে যে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিল, সেই বেদব্যাস কিসে 'কেবল একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ' এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলের মুখপত্র বলিয়া সপ্রমাণিত হইল? বেদব্যাস সম্পাদক আমা-

দের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোনই উত্তর দেন নাই। কেবল নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝিবার জন্য বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদারের ‘নবজীবন ও বেদব্যাস’ নামক প্রবন্ধের উপর বরাত দিয়াছেন। ভূধর বাবু বলেন,—“আমরা এরূপ বিবাদ বিসম্বাদের বড়ই বিপক্ষ। সুতরাং বেদব্যাসে এ সমস্ত ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতিবাদে অনিচ্ছুক।” আমরা বলি, একা সম্পাদককে বিবাদ বিসম্বাদের বিপক্ষ হইলে চলে কি? লেখকগণকেও সম্পাদকের ক্ষুণ্ণ মার্গে লইয়া যাওয়া চাই। তাহাই পারেন নাই বলিয়া নবজীবন-সম্পাদকের উপর প্রাচীন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের জাত ক্রোধ। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া না চলিলে, নব্য সম্প্রদায়ও যে বেদব্যাসকে দলাদলির মুখপত্র বলিয়া দোষারোপ করিবে না, কে বলিল? বেদব্যাস সম্পাদক বা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বন্ধুগণ যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদের মূল যাহাতে নষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিতে প্রবন্ধ প্রকটন করি নাই। উভয় দলের নেতাগণকে মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি মাত্র। এবং তৎ সংসৃষ্ট কথারই আলোচনা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কোন সুফল না ফলুক, কিন্তু তাই বলিয়া এ হেন গুরুতর বিষয়কেও যদি বেদব্যাসের বিজ্ঞ সম্পাদক ভিত্তিহীন আন্দোলন বলেন, তবে জানি না তিনি কি ভাবে, কি প্রণালীতে, এই পাশ্চাত্য শিক্ষিতাধিক্য বঙ্গে, ধর্ম্মসংস্করণ বা সংরক্ষণ করিবেন?

নীলকণ্ঠ বাবু প্রবন্ধের ভূমিকাতেই বলিতেছেন, “নবজীবন ও বেদব্যাস এ উভয়ের মধ্যে কে দোষী কেই বা নির্দ্দোষী?” আমরা কিন্তু কোন স্থানেই নবজীবন ও বেদব্যাস ইহার মধ্যে কে দোষী, কে নির্দ্দোষী, এ প্রশ্ন উত্থাপিত করি নাই। প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় ইহার মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের দোষে দলাদলি ঘটিতেছে, অথবা উভয় সম্প্রদায়েরই অল্প বিস্তর দোষ আছে কি না, সেই বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে যত্ন করিয়াছি। বিদ্বেষ বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া কাহাকেও দোষী বা নির্দ্দোষী বলি নাই। নিরপেক্ষ ভাবেই উভয় দলের দোষ গুণের আলোচনা করিয়াছি। তবে “নিরপেক্ষ” শব্দটি লইয়া বেদব্যাসের হিতৈষী ও লেখক মহাশয় কটাক্ষ করিয়াছেন, করুন। কবির দলের দোহারের ন্যায় স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী আপন আপন চিত্ত

আমাদের প্রবন্ধ দেখিয়া (আঁতে ঘা লাগিয়াছে) অনেকে এরূপ যে বলিবেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি।

নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝাইতে নীলকণ্ঠ বাবু প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকগণের দুর্ভাগ্যক্রমে "নবজীবন ও বেদব্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধে নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য প্রকটিত হয় নাই। নবজীবন ও বেদব্যাসের লেখক বিশেষের মত পার্থক্য মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখও হয়,—নীলকণ্ঠ বাবু আর তারাপ্রসাদ বাবুর যে মত-পার্থক্য লইয়া, উভয় লেখক এ কাল পর্য্যন্ত যে বাক্ যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন, নীলকণ্ঠ বাবু বেদব্যাসের প্রাগুক্ত প্রবন্ধেও সেই সকল কথার সার সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ কোন পাঠক উক্ত প্রবন্ধ পাঠে নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন না। নীলকণ্ঠ বাবু ও তারাপ্রসাদ বাবুর চিত্র মাত্র আলো আঁধারে দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য যে, তারাপ্রসাদ বাবু আর নবজীবন একমতাবলম্বী বা এক উপাদানে গঠিত নহে এবং নীলকণ্ঠ বাবুর মত বুঝিতে পারিলেই যে বেদব্যাসের সম্পূর্ণ মত বুঝা যাইবে, সেরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। তবে ভূধর বাবু যখন "নীলকণ্ঠ বাবুর জওয়াব সওয়াল লিখিত পঠিত দাখিল দস্তখত স্বকৃতবৎ কবুল মঞ্জুর করিবেন" বলিতেছেন, তখন বেদব্যাস আর নীলকণ্ঠ বাবুকে অভিন্ন ভাবিতে আমরা বাধ্য আছি। অতএব নবজীবন ও বেদব্যাস ওরফে নীলকণ্ঠ বাবুর মত-পার্থক্য যাহা নীলকণ্ঠ বাবু দফা ওয়ারিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক,—নীলকণ্ঠ বাবুর উক্তি কত দূর সত্যের উপর সংস্থাপিত এবং কিরূপ যুক্তিমূলক?

১। নীলকণ্ঠ বাবু বলেন,—"নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন। বেদব্যাস সংরক্ষণের পক্ষপাতী।" নবজীবনের 'সূচনা' ও 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ যিনি মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন না। নবজীবন (বা নব্য সম্প্রদায়) ধর্ম্মকে বালকের খেলনক মনে করেন না। এই জন্য ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্ন নবজীবন ও প্রচারে সর্ব্ব প্রথম উত্থাপিত হয়। বঙ্কিম বাবুর বিশেষ মত এই যে, যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মের এক একটি নাম করণ হইয়াছে, 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিতে সেরূপ সাম্প্রদায়িক, সসীম, সংকীর্ণ

ভাবার্থ বুঝায় না। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। অথচ হিন্দুর যাবদীয় কার্য্য, ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত ও অনুশাসিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা যেমন জীবাত্মার সহিত অনাসক্ত ভাবে সংসৃষ্ট, ধর্ম্ম তেমনি হিন্দুর সমস্ত সদাচারের সহিত সংলিপ্ত। সুতরাং (কেবল) 'আচারধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মই ধর্ম্ম'। এ হেন ধর্ম্মের সংস্কার প্রয়াসী হওয়া বাতুলের কার্য্য। তাই নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভাব রক্ষা করিয়া বহ্বার্থে 'ধর্ম্ম' শব্দের মৌলিকতা বুঝাইতেছেন, এবং সেই নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মে যে সমস্ত আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কুসংস্কার বঙ্গ তামাসা 'ধর্ম্ম' বলিয়া হিন্দু-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তৎসমস্তের পরিমার্জ্জন, পরিবর্জ্জন করিতে যত্ন করিতেছেন। তদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন কি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিতে চাহেন না। নব্যহিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদিগকে গালাগালি, তীব্র কটাক্ষ শুনিতে হইত না। তবে যে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্মকে কোন কোন স্থলে নবীন উন্নতির বশবর্ত্তী না করিলে, উহা লোকের মনে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত, প্রাচীন সম্প্রদায় বা বেদব্যাসের মতের (বেদব্যাসের যে মতের কথা প্রথম দফাতে নীলকণ্ঠ বাবু বলিয়াছেন) কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিম বাবু 'কৃষ্ণ চরিত' সমালোচনার একস্থলে বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার হইলে, হিন্দু-সমাজ-সংস্কার আপনা আপনি হইবে।" ইহার ভাবার্থও বোধ হয় ইহাই যে,—হিন্দু ধর্ম্মে যে সমস্ত আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, যে সকল কুসংস্কার রঙ্গদারিতে হিন্দুধর্ম্মকে কুহকাবৃত করিয়াছে, তৎসমস্ত অপসারিত হইলেই, হিন্দুধর্ম্ম মেঘবিমুক্ত সূর্য্য কিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ হইয়া আপামর সাধারণের হৃদয়ক্ষেত্রে বিরাজ করিবে; এবং সকলের অবস্থার উপযোগী নবীন উন্নতির বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণের মনে প্রভুত্ব করিতে পারিবে। তখন আর ব্রাহ্মদিগের ন্যায় বলিতে হইবে না, 'শিক্ষিত ভিন্ন সত্যধর্ম্ম অন্যের উপযোগী নহে।' এবং আচার্য্য দেবের ন্যায় বলিতে হইবে না, "তোমার শক্তি বা পরমায়ু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্ম তোমার অবস্থানুরূপ হইতে পারে না।" হিন্দু ধর্ম্মের আবর্জ্জনা, কুসংস্কার, রঙ্গদারিকে বিদূরিত করার উপদেশকে হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী বলিলে কেহ তাহার বাগ্‌ যন্ত্রের ক্রিয়ারোধ করিতে পারিবে না, কিন্তু বেদব্যাস ও নব-

জীবনের উদ্দেশ্য ও মত পার্থক্য বুঝাইতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করিলে, সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। নীলকণ্ঠ বাবু দ্বিতীয় দফাতে বলিয়াছেন, "কাল সহকারে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচারে যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, সে গুলি বিদূরিত করার উপায় কি? * * * * বেদব্যাস বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের পুনরালোচনাই হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করার প্রধান উপায়।" তবেই দেখা যাইতেছে, বেদব্যাসও আবর্জ্জনা দূর করার পক্ষপাতী। অথচ এই আবর্জ্জনা দূর করিতে নবজীবন প্রয়াসী বলিয়া বুঝান হইতেছে, "নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন। বেদব্যাস সংরক্ষণের পক্ষপাতী (!)" আমরা নবজীবনের মতের সমালোচনা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ধর্ম্মের নৈসর্গিকতা এবং মৌলিকতার সংস্করণ অসম্ভব। অশাস্ত্রীয়তা, (অনৈসর্গিকতা) আবর্জ্জনা, কুসংস্কার, বজ্জাতি প্রভৃতিকে বিদূরিত করিতে নবজীবন (বা নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণ) বদ্ধপরিকর। পক্ষান্তরে তলাইয়া বুঝিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বেদব্যাসের মতও প্রায় তদনুরূপ। একথা আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রবন্ধে পরিষ্কার রূপে বলিয়াছি। তবে বেদব্যাস ও নবজীবন, ইহার মধ্যে কে মাথা ঘুরাইয়া মুখে অন্ন দিতে চাহেন, সে কথার বিচার করা হয় নাই। সে বিচারের প্রয়োজন নাই। কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবু একটি অসামান্য কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। তিনি বলেন "কেবল বেদব্যাস (ধর্ম্মের) সংরক্ষণের পক্ষপাতী।" এ সংরক্ষণ প্রয়াস কিরূপ? "ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই ঈশ্বর বাক্যের যথার্থ প্রদর্শন করিতে কি বেদব্যাসের "অকস্মাৎ আবির্ভাব?" তাহা হইলে বুঝা গেল—"বেদব্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ—অতি উচ্চ!"

২। * * * * "নবজীবন বলেন, বৃটিশ ফরমাকোপিয়া ভিন্ন অন্য কোথাও আত্মার পীড়ার ঔষধ নাই।" এটি নীলকণ্ঠ বাবুর মন গড়া কথা। আত্মাভিমানে স্ফীত না হইয়া, নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বেদব্যাসের ন্যায় নবজীবনও (নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণও) বলেন, হিন্দুর নিদানেই হিন্দুর আত্মার মহৌষধ বর্ণিত আছে। তবে নবজীবন ইহাও বলেন, যাহারা উত্তরাধিকারী সূত্রে চিকিৎসক, হিন্দুর নিদানে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহারা মনুষ্যের চক্ষু রোগের চিকিৎসা করিতে প্রায়ই পিতা পিতামহের কৃত গো চিকিৎসার ব্যবস্থানুসারে সাঁড়াসী পোড়াইয়া পাছায় দাগ দিয়া থাকেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুর

নিদান মতে হিন্দুর আত্মার পীড়ার ঔষধ নির্ণয় করিতে তাঁহারাই প্রস্তুত এবং তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। তবে যদি সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ প্রকৃত জ্ঞানী চিকিৎসক পাওয়া যায়, তবে বৃটিশ চিকিৎসকের বা বৃটিশ ঔষধের প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রাগুক্তরূপ গো চিকিৎসকের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগাপেক্ষা, প্রয়োজনানুসারে বিচক্ষণ বৃটিশ চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়ায় দোষ কি? এই অবস্থায় হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয় চিন্তা ও যুক্তির মিশ্রণ করায় অপরাধ কি বুঝি না?

৩। নীলকণ্ঠ বাবু তৃতীয় দফাতে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত তারাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের মুকুট স্বরূপ সেই "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানি প্রজায়তে"—ইতি শ্লোকার্দ্ধের উত্তরেরই সার সঙ্কলন মাত্র। সুতরাং তদ্বিষয়ের বিচার না করিলেও চলে। কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (কথাও ঠিক) "তারাপ্রসাদ বাবু নবজীবন নহেন।" তথাপি নীলকণ্ঠ বাবুর ঐ কথাটি জপমালা হইয়াছে দেখিয়া নবজীবন সম্পাদক "ধর্ম্মের যাজনা" নামক প্রবন্ধে নবজীবনের মত বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি, নীলকণ্ঠ বাবুর সেই এক ঘেয়ে বুলি আজও যায় নাই। এই প্রবন্ধে উক্ত গুরুতর বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভবে না। অদ্য এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে, যুক্তি-প্রাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের যে যুক্তিবলে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিশাস্ত্র (ষড় প্রদর্শন প্রভৃতি) থাকিতে "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানি প্রজায়তে" শুনিয়া বেদব্যাস ওরফে নীলকণ্ঠ বাবুর মস্তক ঘূর্ণিত ও হৃৎকম্পন হয় কেন? নীলকণ্ঠ বাবু বলেন,—"বেদব্যাস যুক্তির অবমাননা করেন না। তবে বেদব্যাস নিজ যুক্তির অনুসরণ না করিয়া, ঋষিগণের যুক্তির অনুসরণ করেন। বেদব্যাস মনে করেন যে, অধুনাতন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের যুক্তি অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক অধিক।" আমরা বলি, "ঋষিগণের যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক" আছে বলিয়া তাই যুক্তি-মূলক ধর্ম্ম-শাস্ত্র আজও স্বদেশে বিদেশে আদরণীয়, অধুনাতন (পাশ্চাত্য শিক্ষিত হউক কি প্রাচ্য শিক্ষিতই হউক) কোন পণ্ডিতের বাক্যে যদি যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক অধিক না থাকে, তবে তাহা একদিনও টিকিবে না। আজ টিকিলেও পরে টিকিবে না। এই ভরসায় নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিয়াছেন, প্রাচীন সম্প্রদায়ের নেতাগণ সেরূপ পারেন না কেন? যে কোন কথা শুনিবামাত্র তাহা অসার বলিয়া উড়াইয়া দিলেই কি শাস্ত্রীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে নিজ জীবন নিয়মিত করা হয়?

আমরা ত জানি, গুরুর নিকট শিষ্য যে প্রশ্ন করে, তাহার অধিকাংশ পরে টিকে না; তাই বলিয়া কি গুরুদেব শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল গালাগালি দিয়া গুরুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন? গুরু শিষ্যের এইরূপ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখিয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কটাক্ষ করিলে, চূড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিত গণকে যে গুরু জ্ঞানে নব্য সম্প্রদায় প্রশ্ন চ্ছলে তর্ক উপস্থিত করেন, নবজীবন সম্পাদক তাঁহার সাধারণী পত্রিকায় এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন। সেইরূপ বিনয়-নম্র উক্তিও কি আচার্য্যবরের মনোমত হয় নাই? এরূপ অবস্থায় যে দলাদলির অগ্রণী, জিজ্ঞাসা করিলেও কি নবজীবনের দিকে টানিয়া কথা বলা হয়? না ইহারই নাম নবজীবন হইতে বেদব্যাসকে প্রভেদ ভাবা? সাধারণে এ সকল রহস্য বুঝিতে অক্ষম।

৪। নীলকণ্ঠ বাবু চতুর্থ দফাতে উদারতা কথাটি লইয়া বড়ই বিচার মল্লতা দেখাইয়াছেন। আমাদের প্রবন্ধ একটু বিস্তৃত হইলেও আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব,—নীলকণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধের ভূমিকায় আর উপসংহারে সম্পূর্ণ মত-বৈষম্য ঘটিয়াছে। নীলকণ্ঠ বাবু বলেন—"নবজীবন সর্ব্ব-জনীন উদারতা চাহেন। তিনি (নবজীবন) বলেন—অন্য কোন ধর্ম্ম বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করা অনুচিত।" ইহার পরেই নীলকণ্ঠ বাবু বলিতেছেন—যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও মৃত্তিকা, বিষ্ঠা ও চন্দন, হস্তী ও পিপীলিকা, আত্ম ও পর এ সমস্তে তুল্য জ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহার উদারতা প্রকৃত উদারতা। পাঠক দেখিলেন, নীলকণ্ঠ বাবু প্রথমে বলিলেন—নবজীবন সর্ব্ব-জনীন উদারতা চাহেন। আবার যখন উদারতার ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন, তখন ভাবার চোটে একরূপ দেখাইলেন—বিশ্বজনীন উদারতা। তবেই বুঝান হইল না, নবজীবন সর্ব্ব জনীন উদারতার অপব্যবহার করেন কি না? নীলকণ্ঠ বাবু বলেন,—যদি নবজীবনের এ উদারতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নবজীবন ও বেদব্যাসে এত প্রভেদ করিতেন না, তাহা হইলে তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য বলিয়া বোধ হইত। এতক্ষণে বুঝা গেল, আমরা যে কারণে নবজীবন ও বেদব্যাসে প্রভেদ আশঙ্কা করিয়াছি, বেদব্যাস সম্পাদক বা নীলকণ্ঠ বাবু আদৌ সে কথা তলাইয়া বুঝেন নাই। "পরম ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, এবং বেদব্যাসের প্রধান হিতৈষী ও লেখক * * * * * মহাশয়দিগের উপর অতি তীব্র কটাক্ষ করিতে লেখক কোনরূপ সঙ্কুচিত হয়েন

নাই," কেবল এই এক ধূয়া ধরিয়া নবজীবন ও বেদব্যাসের উদ্দেশ্য ও মত পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া বেদব্যাস সম্পাদক বা নীলকণ্ঠ বাবু মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে,—বেদব্যাস কেবল সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র হইতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম সংস্করণ বা সংরক্ষণ চেষ্টা ফলবতী হইবে না। দলাদলি গালাগালিরই ঘোঁট হইবে। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে ইচ্ছা থাকিলে, সকলের সকল প্রকার প্রশ্নোত্তর মীমাংসা পূর্ণ প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশিত না হইলে উদারতা রক্ষা হইবে না। গোঁড়ামীতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ গোঁড়ামী নাই বলিয়া নবজীবন ও প্রচারের উদারতার প্রশংসা করা হইয়াছে। এরূপ প্রভেদ প্রদর্শন করাকে বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচায়ক বলা সঙ্গত কিনা পাঠকগণই সে বিচার করিবেন। নীলকণ্ঠ বাবু প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন,—"বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্মকে ভক্তি করে। সুতরাং বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্ম (?) অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করে। (নবজীবন তবে কি বলে?) ইহা অনুদারতা বা সংকীর্ণতা হইলেও বিকৃত উদারতা নহে।" অথচ প্রবন্ধের ভূমিকাতে বর্ত্তমান লেখককে কটাক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে,—* * * * "কারণ নিরপেক্ষ মীমাংসার মূল সূত্র এই যে, আমি ভিন্ন অন্য সকলেই অজ্ঞানী ও অধার্ম্মিক, অতএব দোষী।" পাঠক দেখিলেন!—(কেমন) অহঙ্কারের ঘৃতে ভাজা, উদারতার ডিম্‌?

আমরা নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারি বা না পারি, "আমরাই কয়েকজন ধর্ম্মধ্বজী কেবল হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে অকস্মাৎ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমরাই কেবল হিন্দু, আর সকলেই-অহিন্দু," এরূপ ভাব কোথাও প্রকাশ করি নাই। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছি,—প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্ম সংস্করণ বা সংরক্ষণ চেষ্টা না করিলে, বর্ত্তমান অবস্থার নবজীবন ও বেদব্যাসের চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। কেবল পূর্ব্বকালের ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর সহিত কলেজ-ফেরতা বাবু দলের দলাদলি গালাগালির পুনরভিনয়ই হইবে। উপায় কি? বাঙ্গালীর হিন্দুর প্রতি যে ধর্ম্মরাজ বিরূপ! তাই নবজীবন বঙ্গ দর্শনের উত্তরাধিকারীত্ব করিয়াই বলিতেছেন—'আজ তোমার (হিন্দুর) নবজীবন হইল।' ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত ব্রজব্রত সামশ্রমীর পথানুসরণ করিয়াই বেদব্যাস বলিতেছেন—

বেদব্যাস ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দু সশঙ্কভাবে চিন্তা করিতেছে,—নবজীবন চারি বৎসর বয়সেই অতি বৃদ্ধের ন্যায় যষ্টি ভরে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিতেছেন। বেদব্যাসও হয়ত কুরুক্ষেত্র যোগের পর হইতে ক্রমে তপোবনাভ্যন্তরে যোগ নিদ্রায় অসাড়, অচল হইয়া পড়িবেন। পাঠকে পড়েন না বলিয়া, নবজীবনের লেখকগণের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। গ্রাহকগণ মূল্য দেয় না বলিয়া "বহু পরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তাও যায় না—তাহার নাম অগ্রিম মূল্য" এবং "সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না—তাহার নাম সাময়িক পত্র"—সম্পাদক শুধুই রহস্য প্রবন্ধে এই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করিয়া সাময়িক পত্রিকা মাত্রেরই অবস্থা ও পরিণামের আভাস দিয়াছেন। বেদব্যাসের কেবল তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ; সুতরাং হুজুক প্রিয় বাঙ্গালী পাঠক বেদব্যাসের গ্রাহক সংখ্যা বাড়াইয়া সম্পাদককে আশ্বস্ত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু অচিরে বেদব্যাসকেও যে নবজীবনের কান্না কাঁদিতে হইবে না, কে বলিল? তাই বলি পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহাশয়গণ। আপনারা জনে জনে সম্পাদক হইয়া ধর্ম্মরাজের লেজ ধরিয়া টানাটানি না করিয়া, একবার মিলিয়া মিশিয়া একখানা সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন পূর্ব্বক, হুজুক-প্রিয় দলাদলি-প্রিয় বাঙ্গালী নামের কলঙ্কাপনয়ন করুন না কেন? প্রচার-সম্পাদক যে বলিয়াছেন—সাময়িক পত্রিকার সামান্য মূল্য যে গ্রাহকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় না, তাহা নয়, দিতে পারে না বলিয়াই দেয় না। এ কথা কি আপনারা অনুমোদন করেন না?

আমাদের বিশ্বাস এই যে, এখনও ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশবাসীগণ ইংলণ্ড প্রভৃতি শিক্ষিত-সঙ্কুল দেশের অধিবাসীদের ন্যায় সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার উপকারিতা বুঝিলেও তাহার উন্নতি ও স্থায়ীত্ব বিধান করিতে শিখে নাই, সুতরাং দেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের আড়ম্বর দেখিয়া আমাদের আহ্লাদে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পত্রিকা যখন নব প্রকাশিত সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, তখন সে আশীর্ব্বচন শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখের সহিত হাসি পায়। জল বুদ্বুদ্ প্রায় পত্রিকা সংখ্যার অকস্মাৎ আবির্ভাব, তিরোভাবকে আমরা বাঙ্গালার উন্নতির চিহ্ন বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্মীক পিণ্ডের উত্থান পতন দেখিয়া, বীতশ্রদ্ধ হওয়া অপেক্ষা, শিলা খণ্ড সদৃশ রাজমহলের পাহাড় শ্রেণীকে আমরা ভক্তির চক্ষে দেখি। তাই গৌরব বৃদ্ধা প্রাচীনা তত্ত্ববোধিনীকে বহু পরে বাহির হইতে দেখিলেও

মনে একরূপ উৎকট আনন্দ হয়। পরন্তু অপোগণ্ড নবজীবন, প্রচার, কি বেদব্যাসের ত কথাই নাই; লব্ধ প্রতিষ্ঠ বঙ্গ-দর্শনের (যিনি কৈশোর বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতেই লীলা সম্বরণ করিলেন, তাঁহার) অবস্থা ভাবিলেও মনে দুঃখ ভিন্ন সুখ হয় না। যে বালক ১০।১২ বৎসর বয়সে অথবা তৎ পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কে তাহার দীর্ঘ জীবন কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে? তাই বলিতে ইচ্ছা হয়,—এ দেশের পত্রিকা গুলির অকস্মাৎ আবির্ভাব (জন্ম) দর্শনেই গয়ালীদিগের ন্যায় শোক, অনুতাপ, রোদন করা উচিত। এবং মৃত্যু হইলেই উৎসব আমোদ প্রকাশ করিলে যেন ঠিক কাজ হয়। আমাদের এই ফলিত জ্যোতিষ বাক্য শুনিয়া পত্রিকা সম্পাদক বা অধ্যক্ষগণ যে দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইবেন, তাহা আমরা জানি। এবং প্রাগুক্ত ফলিত জ্যোতিষ বাক্যের সত্যতা সমর্থনে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকিলেও কেবল মহামায়া বশে পুত্রের 'পত্রিকার' অমঙ্গল চিন্তা যে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিবেন না, ইহাও ঠিক কথা। সুতরাং তাঁহাদের মন-তুষ্টিকর কথা আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রবন্ধের উপসংহারে নিরপেক্ষভাবে বলিয়াছি। সেই কথাগুলি এই প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করিলেও চলে। কিন্তু যাঁহারা আমাদের প্রবন্ধের ভাব বিদ্বেষ-বুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া উল্টা বুঝিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝাইতে পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষ কথা উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার কালে আবার বলিতেছি,—* * * * * সাধারণের সে আশা পূর্ণ করিতে যদি নবজীবন কি প্রচার অসমর্থ হন, তবে আমরা নবজীবন ও প্রচারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। বেদব্যাস যদি সকল শ্রেণীর হিন্দুর উপদেষ্টা বন্ধু বা গুরুর ন্যায় কুহকাবৃত হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সকল সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন, তবে বেদব্যাসকেই আমরা বৃহদাকারে, দীর্ঘ কাল বঙ্গীয় সাহিত্য গগণে বিরাজ করিতে দেখিলে সুখী হইব। যে সদুপদেষ্টা সেই আমাদের বন্ধু। আমরা খ্যাতি প্রতিপত্তির খাতিরে আসল কথা ভুলিব না।"

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

বিজ্ঞাপন।

চৌকী (chairs) বিক্রী।

মিউনিসিপাল্ চেয়ারম্যান ও তাঁহাব বাইসের উপবেশনার্থ।

চৌকির উপকরণের বিশেষ বিবরণ।

যথা,—

প্রথম উপকবণ, কাষ্ঠ;—মেহগনি, শেগুণ, শিশু ইত্যাদি নহে। এক অপূর্ব্ব এবং অলৌকিক গুণ বিশিষ্ট কাষ্ঠ। নাম হেঁজল কাষ্ঠ। বিশেষ বিবরণ আবশ্যক বলিয়া প্রকাশ কবা যাইতেছে যে, পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন নামক একখানি উক্ত কাষ্ঠের সিংহাসন ছিল। সে সিংহাসনেব অলৌকিক গুণবাশিব কথা কাহাবো অবিদিত নাই। কালক্রমে রাজাব রাজ্য পতনে, বাজ-ভবন ভঙ্গে, সিংহাসন খানি ভূমিসাৎ হয়, এবং ক্রমে তদুপবি মৃত্তিকাব স্তূপ গঠিত হয়। রাজ্যখণ্ড যখন জনহীন সমতল ভূমি, তখন ঐ সিংহাসন-প্রোথিত স্থানটি একটি মাটিব ঢিপী মাত্র। রাখাল বালকেরা মাঠে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিত; কখন রাজা প্রজা খেলা কবিত এবং ঐ মাটীর ঢিপী কথঞ্চিৎ উচ্চস্থান বলিয়া সেইটি সিংহাসন করিত। যিনি বাজা সাজিয়া তাহাতে বসিতেন, তাহাবই মস্তকে রাজবুদ্ধির ঢেউ খেলিত। একদা এক দুঃখী ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে গমন করিলে ব্রাহ্মণের স্ত্রীর প্রতি লোভাসক্ত এক ব্রহ্মদৈত্য ঐ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বাটীতে আসেন। যেন প্রকৃত ব্রাহ্মণই বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলেন। ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণীব সহিত ঘরকন্না করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণীর সংস্কার, সেই তাহার স্বামী। তাহাব পর প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইলে, কে সত্য সেই ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী কাহার, এই সন্দেহ তর্ক উপস্থিত হইলে, মীমাংসার জন্য রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট স্ত্রী সমভিব্যাহারে দুই জনে যাত্রা করেন। কথিত আছে বালকেরা সেইদিন রাজাপ্রজা সাজিয়া খেলা করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহারা সবিশেষ অবগত হইয়া স্তূপারূঢ় কল্পিত রাজ-সমীপে বিবাদী সম্প্রদায়কে আনয়ন করে। রাখালরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া একটী চর্ম্ম-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তৈলভাণ্ড গ্রহণ করিয়া বলেন যে, এই ভাণ্ডের মধ্যে বিবাদী

দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি প্রবেশ করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি, স্ত্রী তাঁহারই। ব্রাহ্মণের শুষ্ক বদন হইল, ছদ্মবেশী ব্রহ্মদৈত্যের মুখে আর হাসি ধরে না। ব্রহ্মদৈত্য তৎক্ষণাৎ আত্মদেহ সংকীর্ণ ও বায়ুবৎ করিয়া ভাণ্ডে প্রবেশ করেন; রাখালরাজ ভাণ্ডমুখ দৃঢ় বন্ধন করিয়া জলমগ্ন করাইলেন এবং ব্রাহ্মণকে স্ত্রীর সহিত বিদায় করিলেন। রাখালরাজের এতাদৃশ চমৎকার সুচতুর রাজবুদ্ধির পরিচয়ে, ব্রাহ্মণ অনেক বিবেচনায় স্থির বুঝিলেন যে, কথিত মৃত্তিকা স্তূপ-নিম্নে নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য আছে, নচেৎ এরূপ রাজবুদ্ধির পরিচালনা কদাপি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁহার অনুমান সত্য কি না, তাহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করেন। বিপদোদ্ধারই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া রহস্যভেদের কোন চেষ্টা করেন নাই। তবে একটী সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন, এই ঘটনাটি এবং ঐ মৃত্তিকা স্তূপের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি লিপীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরাজ বাহাদুর যখন ভারতের সেই প্রদেশ অধিকার করেন, তখন রাজকার্য্যের নিয়মানুসারে ভাবি বন্দোবস্তের জন্য প্রজাগণের যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ রাজ দপ্তরে জমা হয়। সেই সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণের লিখিত লিপীখণ্ড আসিয়া পড়ে। এতকাল সেই কাগজ ফরেন আফিসের দপ্তর খানায় পড়িয়াছিল। মহাদক্ষ লর্ড রীপণ ফরেন আফিসের কাগজের পোকা ছিলেন, তাঁহার নয়নে ঐ কাগজ পড়ে। আর যায় কোথা? অমনি স্থান-নির্ণয়, লোক-নিয়োগ, মৃত্তিকা-স্তূপ-খনন, এবং তন্মধ্যে কথিত অপূর্ব্ব গুণবিশিষ্ট রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তি। কিন্তু সিংহাসন খানি ভগ্নাবস্থ। লর্ড রিপণ ভারতের অদ্বিতীয় মঙ্গলার্থী, ভগ্ন সিংহাসন খানির কাষ্ঠে এই সকল চৌকি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

দ্বিতীয় উপকরণ বেত্র;—চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর নামক মহাদেব (এই দেবের নামের উৎপত্তি এবং অর্থ আমরা জানি না) বেত বন হইতে উঠিয়াছিলেন। জেলেরা স্বপ্ন পাইয়া তাঁহাকে তোলে। বেতকে চিঁচিড়া বলিত, এবং তাহাতে ঐ নগরের নাম চুঁচুড়া। সেই বেতবন কাটিয়া বসতি হয়। জেলেরা যত্ন করিয়া সেই বেত অনেক সংগ্রহ করিয়া রাখে। সংস্কার যে এই বেতে মহাদেবের ভূতের আবির্ভাব হয়। গাজনের সময় ঐ বেতের এক একটী আটি হাতে করিয়া সন্ন্যাসিরা খাটাখাটুনি করে। বেতের গুণে সন্ন্যাসীদের মাথা চলে, ঘাড় কাঁপে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানা প্রকার পক্ষাঘাতিক অবস্থা ঘটে। এমন কি যুগ সন্ন্যাসী মরিয়া যায়, আবার কপালে বেতের ঘা মারিলেই বাঁচিয়া

উঠে। বাগির হালদারেরা বক্তেশ্বরের পুরোহিত; জেলেরা হালদারদের চেলা। অনেক হালহার লাট সাহেবের কেবানি, তিনিই কতক গুলিন সেই বেত লর্ড বিপণকে দেন। সেই ভূতাবিষ্ট বেতে এই চৌকি গুলিন ছাওয়া।

তৃতীয় উপকরণ, বার্‌ণিষ ;—সচরাচর স্প্রীটে গালা গলাইয়া বার্‌ণিষ প্রস্তুত হয় এবং রঙের জন্য খুন্‌খারাপি দেওয়া হয়। এ চৌকির বার্‌ণিষ স্বতন্ত্র প্রকারে প্রস্তুত। স্প্রীটের যে শক্তি, গর্দ্দভের মূত্রেও সেই শক্তি, রসায়ন বিদ্যাবিদেরা লাট সাহেবকে বলিয়া দেন এবং যাহারা স্প্রীট পান করিয়াছেন তাঁহারাও জানেন। গালার পরিবর্ত্তে শজিনা গাছের আটা এবং খুন্‌খারাপির পরিবর্ত্তে ছার্‌পোকার রক্ত। এই তিন দ্রব্যে এই চৌকির বার্‌ণিষ প্রস্তুত হয়।

লর্ড রিপণ এই সকল উপকরণে কতকগুলিন চৌকী প্রস্তুত করাইয়া ইলেকটিব্‌ সিষ্টেম জারির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলায় দুইখানি করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন।

চৌকীগুলিন দেখিতে শাদাশিদে।

চৌকীর গুণ।

১। গুণ অসীম; অনেকেই জানেন যে, বিলাতে দুষ্প্রবৃত্তি সাধন জন্য এক প্রকার কলের চৌকী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে বসিলেই কলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ আটকাইয়া যায়, যে উঠিবার শক্তি আর থাকে না। এই সকল চৌকীতে কল কবজা নাই, কিন্তু একবার বসিলে আর উঠিবার যো নাই। দুই চৌকীতে প্রভেদ এই মাত্র যে, কলের খানিতে বসিলে ইচ্ছা থাকিলেও উঠিবার শক্তি থাকে না; আর এই সকল চৌকীতে বসিলে উঠিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত একেবারে রহিত হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

২। চৌকীতে বসিবামাত্রেই মাথা চন্‌ চন্‌ করিতে থাকে, ঘাড় কাঁপে, শরীর গরম হইয়া উঠে, আহ্লাদে মন উথলিয়া পড়ে, অহঙ্কারে ফুলিতে হয়, স্ফূর্ত্তির ঢেউ চলে, ভূতে স্বর্গে তুলিয়া দেয়, এবং মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মে যে আমিই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং দণ্ড মুণ্ডের মালিক।

৩। সমস্ত রাত্রি হট্ট মন্দিরে খোলা ভাঁটির বোতলে পপাত ধরণীতলে, আর অরুণোদয়ে চৌকীতে বসিলেই সচ্চরিত্র, লোকাভিরাম, জিতেন্দ্রিয় সাক্ষাৎ মহাদেব। গুলির আড্ডায় অষ্ট প্রহর অবস্থান, কিন্তু চৌকীতে

বসিলেই স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার। গোস্বামী-রূপে মোহিনী-কুঞ্জে সতীত্ব-সংহারের হরি-সংকীর্ত্তনে বিহ্বল, আর চৌকীতে বসিবামাত্রেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিমান পবিত্র ধর্ম্মাবতার।

* * * * * * *

৪। চৌকীতে সমস্ত বিদ্যার আবির্ভাব;—বিচারে, আইনের মুণ্ডপাত; (আপিল নাই।) হিসাবে, গোজামিল; (অডিটরের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ।) উপার্জ্জনে, গরীবের শোণিত-শোষণ; (ভিখারীর টেক্স।) ব্যয়ে, টাকার পিতৃশ্রাদ্ধ। নির্ম্মাণ কার্য্যে, প্রতি বৎসর শাঁকোর ও পয়োনালার পুনঃ সংস্কার এবং নরদমার পঙ্কে গলি রাস্তা মেরামত। স্বাস্থ্যরক্ষায়, পথের ধারে গামলা পুঁতিয়া ছিন্ন দরমার আবরণে পায়খানার ব্যবস্থা।

৫। শক্তির সঞ্চারণ;—চৌকীতে বসিলেই ধমনীতে চঞ্চল ছাগরক্তের সঞ্চালন, শরীরে সতেজ ষাঁড়ের বলের আবির্ভাব, এবং মস্তকে বাল-বুদ্ধির উদ্ভাবনা। অকর্ম্মণ্য পঞ্চান্ন-বিপদাপন্ন বৃত্তি ভোগী বাইশ্-মান্ তাহার পরিচয়।

৬। সর্ব্বভেদী দিব্য দৃষ্টি;—আগেকার সাহেব চেয়ারম্যান ও তাঁহার বাইসকে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমস্ত দেখিতে হইত। এ চৌকী-শোভিত অচল দেবতা আপিস ঘরের প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সহরের সর্ব্বত্র যাবতীয় কার্য্য দেখিতে পান।

৭। অহোরাত্র ঘোর মিথ্যার নরক সৃজন, মিথ্যা মোকদ্দামার প্রশ্রয়দাতা সাক্ষাৎ অধর্ম্ম অবতার, কিন্তু চৌকীতে বসিলেই ট্যাক্স সম্বন্ধে দরখাস্তকারী মাত্রেই হজুরের সম্মুখে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত।

৮। হৃদয়ের প্রশস্ততা। কুকুরের মূত্রে রাজপথে জল প্লাবন জ্ঞান। জোনাকিপোকায় সহর আলোকময় দর্শন। প্রজার সন্তরণ শিক্ষার্থ বর্ষায় পথে জলাশয় সৃজনের সদ্ব্যবস্থা। গলিতে পদব্রজে কেহ চলে না, এই সংস্কার। মেথরকে দয়া করিতে দ্বিপ্রহরে অরুণোদয়,—জ্ঞান।

৯। চৌকীর উদারতা গুণ;—অপরিমিত দয়া, বড় মানুষ ও আত্মীয়-গণের উপরেই; প্রমাণ, কীর্ত্তি কলাপ যত কিছু তাঁহাদেরই দ্বারে। অটল ভক্তি, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্রীচরণে; তাঁহারই ঘোটক-ভ্রমণের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার। নম্রতা;—স্বয়ং ঢাক ঘাড়ে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগুণের সংকীর্ত্তন প্রমাণ,—অধমতারণ ষ্টেট্‌সম্যানে।

১০। চৌকিগুলিন নিদ্রার চির বাসস্থান। তবে মধ্যে মধ্যে বড় বড়

কাজেব স্বপ্ন দেখিতে হয় ; অর্থাৎ জলের কল, টাউন হল, গ্যাস লাইট আর এস্‌ট্রাণ্ড। টাকা,—স্বপ্নের টাঁকশালে তৈয়ার করিতে হইবে।

অতএব অতীব আহ্লাদ সহকারে সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাই-তেছে যে, উপবোক্ত অভূত পূর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট উপকরণ বিনির্ম্মিত এবং এতাদৃশ দশ দফা গুণাবলি-ভূষিত চমৎকার চৌকী আর কখনই সৃষ্ট হয় নাই, এবং কখনই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় নাই। লর্ড রিপণের আমলেই প্রথম আমদানি। প্রতি তিন বৎসরে মফস্বল টাউনে এক একবার প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়। সর্ব্বাগ্রে প্রথম chance এ দেশের পেঁটো-চুন্নীর ছেলে পদ্ম-লোচনদের এবং আমড়ার ঢেঁকি অবতারদের দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চ মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা।

মূল্য, ভোট। ভোট,—গল-লগ্নকৃতবাসে তোষামোদ, হাতে পৈতা জড়াইয়া অভিশাপ এবং আত্মহত্যাব ভয় প্রদর্শনে পাওয়া যায়। খবিদদাবেব একটী মাত্র গুণ থাকা চাই ; মন ভিজান, মিথ্যাপূর্ণ মিষ্টমুখ ; এস খবিদদাব, চলিয়া এসো! ভোট লয়ে জল্‌দি এসো—যায় চৌকী যায়! যায় চেয়ার যায়! আয় খবিদদার আয়!!!!

আগমনী।

(মেনকা উক্তি।)

মোহাড়া।

গিরিরাজ হে জামায়ে এন মেয়েব সঙ্গে,—
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন,
তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি,
উপহাস করিতেছে রঙ্গে॥

(চিতেন।)

আমি ভুলি নাই আর বারের কথা,
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,
উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা করে, জিজ্ঞাসি উমারে,
"আমার শিব ত আছেন ভাল ?"
উমা বলে "আছেন ভাল," চখে দেয় অঞ্চল,
বলে "মুখে কি হল ? আমার চখে কি হল ?"
আমি বুঝিনু সকল, কেন চখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল ঝিয়ের চখে উথলিল।

(অন্তরা।)

আমি ভুলি নাই আর বারের কথা,
মরমে মরমের কথা, হিয়ের আছে গাঁথা,
কার্ত্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোণার কার্ত্তিক তোমায় দেখে, উঠে চমকে ;
বলে তোমায় দেখিয়ে, "মা—ওমা—ওকে দাঁড়ায়ে,"
উমা বলে "তোমার দাদা অই, বাবা, আমার বাবা অই।"
বাপ সোহাগে বাপের ছেলে জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে, "মা! আমার বাবা কই,
বলে কেন এল না, ওমা বল না,"
বলে, কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে, "কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে,"
আমি সেই অবধি, মরমে মরমে, আছি মনো দুখে।

২।

যোহাড়া।

ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন হিমালয়,
উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয়, জয় দুর্গে জয়॥

কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তার তাচ্ছল্য করা নয়।

আঁচল ধরে জায়া;

বলে ছিমা, ছিমা, মাগো ওমা—

মা বাপের কি এমনি ধারা।

গিরি তুমি যে অগতি বুঝে না পার্ব্বতী

প্রকৃতির অখ্যাতি জগন্ময়॥

চিতেন।

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখিয়াছি কুস্বপন,

এলো হে সেই আমার তারাধন।

দাঁড়ায়ে দুয়ারে,

বলে মা কই মা কই মা কই আমার,

দেও দেখা দুঃখিনীরে॥

অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি

আনন্দেতে আমি আমি নয়॥

অন্তরা।

মা হওয়া যত জ্বালা,

যাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে,

তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই,

কর্ম্ম সূত্রে সদা স্নেহ টানে॥

চিতেন।

তোমারে কেউ কিছু বলবে না—

রবে দারুণ পাষাণ,

আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ॥

তোমার ত নাই স্নেহ,

একবার ধরো ধরো, কোলে করো—

পবিত্র হোক পাষাণ দেহ।

আহা এত সাধের মেয়ে,

আমার মাথা খেয়ে

ছিল দিন বই রাখে না তত্ত্ব॥

৩।

মোহাড়া।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে
রাজ রাজেশ্বর হয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে মা
শিবের এখন সে দিন নাই,
যারে পাগল পাগল বলে, বিবাহের কালে
সকলে দিলে ধিক্কার,
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব
কুবের ভাণ্ডারী তার।
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে
আনন্দ কাননে যুড়াবার ঠাঁই।

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি, কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার,
তোমার সেই উমা ঐ এল,
সঙ্গে শিব পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেল।
আমায় মা কৈ মা কৈ বলে উমা ঐ
ব্যগ্রা হয়ে দাঁড়ালো।
বলে, তোমার আশীর্ব্বাদে আছি মা ভাল,
দুঃখিনীর দুঃখ ভাবতে হবে নাই।

অন্তরা।

হোক হোক হোক, উমা সুখে রোক,
সবাই বলো মনে।

ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ?
দুহিতার সুখ শুনিয়ে গিরি, যে সুখ হয় আমার,
অন্যে কি জানিবে আর ?
যদি পথিকে কেউ বলে ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হয়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সম্বাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই।

ফুকো।

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গার দুর্গতি একি প্রাণে সয় ?

চিতেন।

তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ
কত দিন কত কথা,
সে কথা আছে শেল সম মম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার লম্বোদর নাকি,
উদরের জ্বালায়, কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনাবো কার্ত্তিক,
ধুলায় পড়ে লুটাতো॥
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,
আমি এখন অন্ন অনেককে বিলাই।

মহাশক্তির ধ্যান।

জটাজুট সমাযুক্ত অর্দ্ধেন্দু কপালা,
ত্রিলোচন-যুক্ত মুখে পূর্ণেন্দু উজালা;
সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা অতসী বরণী,
সর্ব্বাভরণ ভূষিতা নবীন যৌবনী;
পীনোন্নত পয়োধরা সুচারু হাসিনী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমভাবে মহিষ মর্দ্দিনী;
মৃণাল-বলিত দশ বাহু শোভা করে,
শূল খড়্গ চক্রবাণ শক্তি দক্ষ করে।
খেটক কার্ম্মুক পাশ অঙ্কুশ কুঠার,
কুঠারে বাজিছে ঘণ্টা বামদিকে তাঁর।
মহিষ মস্তক ছিন্ন পদতলে আর,
শিরশ্ছেদোদ্ভব দৈত্য হাতে তলয়ার;
বুকেতে বিঁধেছে শূল, অস্ত্র বিভূষণ,
রক্তারক্তি অঙ্গ তার, আরক্ত লোচন;
নাগ পাশে বদ্ধ সেটা ভ্রুকুটি করেছে,
কেশে পাশে জড়ায়ে মা টানিয়া ধরেছে;
নির্ঘাতনে দৈত্য রক্ত করিছে বমন,
সিংহ দিয়া দেবী তারে করিছে পীড়ন;
'সিংহ প্রতি বলে বধ রে! বধ রে!
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে।'
দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহোপরি স্থিত
মহিষের পর বাম পদ অধিষ্ঠিত।
শত্রু ক্ষয়করী-দৈত্য— প্রতাপ হারিণী,
প্রসন্ন বদনা সর্ব্ব ফল প্রদায়িনী;
চৌদিকে অমর বৃন্দ ঘিরিয়া রয়েছে,
অবিরত স্তব স্তুতি কীর্ত্তন হতেছে;
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা মা চণ্ডের নায়িকা,
চণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ড রূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্ট শক্তি সুবেষ্টিতা তুমি মহাশক্তি,
তোমায় করিব ধ্যান কিবা আছে ভক্তি।
জগৎ জননী তুমি জগতের ধাত্রী,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাত্রী।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। } কার্ত্তিক, ১২৯৫। } ২য় সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১॥

পদচ্ছেদঃ। ক্ষীণবৃত্তেঃ, অভিজাতস্য, ইব মণেঃ গ্রহীতৃ, গ্রহণ,—গ্রাহ্যেষু, তৎ-স্থ-তৎ-অঞ্জনতা-সমাপত্তিঃ।

পদার্থঃ। ক্ষীণবৃত্তেঃ ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য সঃ ক্ষীণবৃত্তিস্তস্য সর্ব্ববৃত্তিহীনস্য ইতি যাবৎ অভিজাতস্য নির্ম্মলস্য স্ফটিকস্যেতি যাবৎ ইব যথা, গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু আত্মেন্দ্রিয় বিষয়েষু তৎস্থত্বং একাগ্রতা তদঞ্জনত্বং তন্ময়ত্বং তৎস্থশ্চ তদনঞ্জনশ্চ তৎস্থতদঞ্জনৌ, তয়োর্ভাবঃ তৎস্থতদনঞ্জনতা সমাপত্তিস্তদ্রূপ-পরিণামঃ।

অন্বয়ঃ। অভিজাতস্য মণেরিব ক্ষীণবৃত্তেশ্চিত্তস্য গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তি র্ভবতীতি শেষঃ

ভাবার্থঃ। যথা স্ফটিকোমণিরতিনির্ম্মলস্বভাবতো যস্য জপাকুসুমাদি বস্তুন উপরাগং প্রয়োতি তত্তদ্রূপাশ্রয়াকারেণ নির্ভাসতে তথা স্ফটিককল্পস্য স্বভাবতোনির্ম্মলস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যত্র যত্র সমাধানং তত্তদ্বস্তুরূপেণ পরিণতির্ভবতি, সা চ তদ্রূপাকারাপত্তিঃ সমাপত্তি রিত্যুচ্যতে। চিত্তস্য স্বতএব সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকারসামর্থ্যমস্তি বিষয়ান্তর ব্যাসঙ্গদোষাদেব তু তৎপ্রতিবদ্ধমতো বৃত্ত্যন্তরপ্রতিবন্ধস্য নিঃশেষতো বিগমে স্বতএব ধ্যেয়বস্তুসাক্ষাৎকারস্তদ্রূপোপপত্তিশ্চ। ধ্যেয়বস্তূনি চ ত্রিবিধানি (১) প্রথমং গ্রাহ্যং তচ্চ স্থূল, সূক্ষ্মভেদেন দ্বিবিধং গ্রাহ্য বিষয়রূপং (২) গ্রহণ

মিন্দ্রিয়ং (৩) গ্রহীতা পুরুষঃ যদ্যপ্যত্র গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষ্বিত্যুক্তং তথাপি ভূমিকা ক্রমবশাৎ গ্রাহ্যগ্রহণ গ্রহীতৃষ্বিতি বোদ্ধব্যম্। এতচ্চ বিতর্কবিচারেতি সূত্রে (১৭।১) বিবৃতমেব।

অনুবাদ। নির্ম্মলস্ফটিকমণি যেমন যে বস্তুর সমীপবর্ত্তী হয় তাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বৃত্তি শূন্য অর্থাৎ নির্ম্মলতাপন্নচিত্ত, চৈতন্যময় পুরুষ, জ্ঞানসাধনইন্দ্রিয় এবং বিষয় এই তিনের মধ্যে যে কোন একটির চিন্তা করত যে সেই ধ্যেয়বস্তুব আকাবে পবিণত হয়, তাদৃশ পরিণামের নাম সমাপত্তি।

সমালোচন। বিতর্ক-বিচার ইত্যাদি সূত্রে আমরা স্পষ্ট কবিয়া বলিয়াছি, চিত্ত প্রথমে স্থূল স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে অভ্যাস করে। স্থূল বিষয়ে একাগ্রতা লাভে সামর্থ্য জন্মাইলে সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে থাকে, তাহার পর যে কোন ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া সমাধি অভ্যাস করে, অনন্তর আত্মাকে অবলম্বন কবিয়া তন্মন হইয়া তাহারই চিন্তা করে। পূর্ব্বে ইহা ও বলা হইয়াছে যে, চিত্ত যখন কোন স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া ধ্যান করে তখন কেবল তাহাবই চিন্তা কবত তাহাতেই একাগ্র হয়, অন্য সকল বৃত্তি উহা হইতে অপসৃত হয় এবং চিত্ত সেই ধ্যেয় বস্তুর আকারে পরিণত হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আত্মাসম্বন্ধে ও বলা হইয়াছে। চিত্ত যখন যাহার ধ্যান কবে অন্য-বৃত্তি শূন্য হইয়া কেবল তাহাবই ধ্যান করে এবং তদাকারে পরিণত হয়। আমাদের ধ্যেয় বস্তু তিন প্রকাব বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তু, ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানসাধন এবং পুরুষ বা জ্ঞান কর্ত্তা; উহাদের মধ্যে বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তু দুই প্রকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম চিত্ত প্রথমে স্থূল রূপ জ্ঞেয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে অভ্যাস করে, তাহার পর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মেতে একাগ্রতা লাভ করিয়া জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া সমাধিতে নিমগ্ন হয়। আর তাহার পর স্বয়ং জ্ঞাতা চৈতন্যরূপ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করে। স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ বিষয়কে গ্রাহ্য বলে, ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ বলে এবং পুরুষকে গ্রহীতা বলে। গ্রাহ্য, গ্রহণ এবং গ্রহীতা এই তিনটির মধ্যে চিত্ত যখন যাহাকে অবলম্বন করে তখন অন্যবৃত্তি শূন্য হইয়া কেবল তাহাতেই একাগ্র হইয়া তদাকারে পরিণত হয়। এই তদাকার পরিণামের নাম সমাপত্তি। সমাপত্তি তিন প্রকার গ্রাহ্য-সমাপত্তি, গ্রহণ-সমাপত্তি, গ্রহীতৃ সমাপত্তি। সূত্রে এবং গ্রহীতৃ, গ্রহণ, গ্রাহ্য এইপদ্ম বিপরীত ক্রমে উক্ত

হইলেও অনুষ্ঠান যোগ্যতানুসারে প্রথমে গ্রাহ্যসমাপত্তি, তাহার পর গ্রহণ সমাপত্তি এবং অবশেষে গ্রহীতৃ সমাপত্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়াছেন সূত্রে স্ফটিকমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে, যে স্ফটিক-মণি যেমন স্বাভাবিক নির্ম্মল চিত্ত ও ঠিক সেই রূপ, আমরা বলি তাহা নহে, কারণ যোগচার্য্যদিগেব মতে চিত্ত স্বভাবতঃ সত্ত্ব, বজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণ ময় তবে যোগাভ্যাস দ্বারা বজঃ ও তমোগুণ রূপ মলেব ক্ষব হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া অবস্থান করে তখন উহা সম্পূর্ণ নির্ম্মল ভাব প্রাপ্ত হয় বটে, এই জন্যই সূত্রকাব ক্ষীণ বৃত্তেঃ এই বিশেষণ দিয়াছেন চিত্ত স্বাভাবিক নির্ম্মল নয় কিন্তু ইহাব বজঃ এবং তমোময় বৃত্তিগুলির ক্ষয় হইলে উহা স্ফটিক মণিব মত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। [এই সূত্রে 'সমাপত্তি'ব পরিভাষা মাত্র কথিত হইয়াছে। সুতবাং সমাপত্তি কি? এইটুকুমাত্র বুঝানই আমাদেব আবশ্যক। বোধ হয় তাহা এক প্রকার বুঝান ও হইয়াছে। তথাপি সংক্ষেপে আর একবার বলি বৃত্তিশূন্য অর্থাৎ একাগ্রতা প্রাপ্ত চিত্তের ধ্যেয়াকারে পরিণামের নাম সমাপত্তি। বিষয় ভেদে এই সমাপত্তি আবার তিন প্রকার গ্রাহ্য সমাপত্তি, গ্রহণ সমাপত্তি এবং গ্রহীতৃ সমাপত্তি। কোন অবস্থায় কিরূপে সমাপত্তি হয় তাহা বিতর্ক বিচার ইত্যাদি সূত্রেব সমালোচন স্থলে বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ॥ ৪২॥

পদচ্ছেদঃ। তত্র, শব্দ-অর্থ-জ্ঞান-বিকল্পৈঃ, সংকীর্ণা, স-বিতর্কা সমাপত্তিঃ।

পদার্থঃ। তত্র-ততস্বু সমাপত্তিযু শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ স্ফোট-রূপো বা, অর্থঃ জাত্যাদিঃ, জ্ঞানং সত্ত্ব প্রধানাবুদ্ধিবৃত্তিঃ, বিকল্প উক্তলক্ষণঃ তৈঃ সঙ্কীর্ণা বস্তুতো ভিন্নরূপাণামপি তেষাং পবস্পরং যত্রাভেদেন গ্রহণং ভবতি সা সবিতর্কা স্থূল-বিষয়া সমাপত্তিঃ।

অন্বয়ঃ। শব্দার্থ—সমাপত্তির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সমাপত্তিঃ সবিতর্কা, নিবিতর্কা, সবিচারা নির্ব্বিচারা চ তত্র—কিং নাম সবিতর্কা সমাপত্তি রিত্যত্র বিচার্য্যতে—তত্র সমাহিতো যোগী গবাদিস্থূলবিষয়ং পশ্যতি ন তু এষোঽস্য বাচকঃ শব্দঃ এষোঽস্য বাচ্যোর্থঃ এতচ্চ জ্ঞানমিতি বিষয়বিভাগং করোতি, বস্তুতোভিন্নানামপ্যেষাং অভেদে-

নাধ্যাসোবিকল্পঃ ততশ্চ সমাহিতস্য যোগিনঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ো যোগবাদ্যর্থঃ স যদি শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পেন গৌরিয়ং ভাসতে ইত্যেবং শব্দার্থ জ্ঞানানামভেদ ; ভ্রমেণাবিদ্ধো বিষয়ীকৃতো ভবতি তদা সা সংকীর্ণা বিকল্প মিশ্রিতা সমাপত্তিঃ সবিতর্ক সংজ্ঞা ভবতি। ইতি ভাবঃ

অনুবাদঃ। শব্দ অর্থ জ্ঞানের বিকল্পদ্বারা সঙ্কীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলে।

সমালোচন। যে সমাপত্তিতে শব্দ, তাহার অর্থ, সেই উভয় বিষয়ের জ্ঞান এবং এই তিনটিই মিশ্রিত আছে তাহার নাম সবিতর্ক সমাপত্তি। কাযেই সূত্রার্থ বুঝিতে হইলে শব্দ কি ? অর্থ কি ? জ্ঞান কি ? এবং বিকল্পই বা কি ? এই প্রশ্নের সহজে উদয় হয়।

শব্দ বলিতে যাহা কাণে শুনা যায় যেমন 'গৌ' একটি শব্দ অর্থবলিতে প্রতি পাদ্য শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র যাহার বোধ হয় যেমন 'গৌ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র যে জীব বিশেষের বোধ হয় উহাই তাহার অর্থ. জ্ঞান বলিতে সত্ব প্রধান অর্থাৎ প্রকাশময় বুদ্ধি বৃত্তি, শব্দ উচ্চারণ করিলে মনের যে পরিণাম হয়, যাহাতে জীব অর্থাৎ বিশেষ রূপ অর্থ চিত্তে প্রতি-ভাসিত হয় ; বিকল্প বলিতে বস্তু নাই অথচ তাহার বাচক শব্দ কল্পনা, অর্থ শূন্যে বাচক কল্পনা, অথবা যে বস্তু যাহা নয়, তাহাতে তাহার কল্পনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূল পদার্থ বিষয় সমাধির নাম বিতর্ক বা বিতর্কানুগত সমাধি, স্থূল পদার্থ সকল পঞ্চ তন্মাত্রার কার্য্য পঞ্চ মহাভূত ও তাহাদের কার্য্য সকল, কেহ কেহ আবার অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়দিগকে ও স্থূল বলিয়া গণ্য করেন। যাহাহোক শব্দ অর্থ, এবং জ্ঞান ইহাদের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন রূপ, শব্দের ধর্ম্ম মধুরতা, উচ্চতা ইত্যাদি অর্থের ধর্ম্ম জড়ত্ব, মূর্ত্তত্ব ইত্যাদি জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রকাশ ইত্যাদি সুতরাং শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান ইহারা পরস্পর ভিন্ন। কোন যোগনিরত যোগী যখন কোন স্থূল বস্তুকে আলম্বন করিয়া তাহার বাচক শব্দ, বাচ্য অর্থ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পরস্পর ভেদের প্রতিলক্ষ্য না করিয়া উহাদিগকে ধ্যেয় বস্তুর সহিত অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া চিত্তকে তদাকারে পরিণত করে তখন তাহার বিতর্ক সমাপত্তি হয়। মনে কর কোন যোগী একটা পর্ব্বত বা একটা গাছ বা একটা গোরুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল, তাহার চিত্ত হইতে অন্য বৃত্তি সকল অপসৃত হইয়া কেবল পর্ব্বতময় বৃক্ষময় বা গোরুময় বৃত্তির প্রাবল্য হইল,

চিত্ত পর্ব্বত, বৃক্ষ বা গোরু আকারে পরিণত হইল। তখন কেবল পর্ব্বত, বৃক্ষ বা গোরু এইরূপ একমাত্র জ্ঞান রহিল; পর্ব্বত বৃক্ষ বা গোরু এই শব্দ উচ্চারণ দ্বারা এইরূপ অর্থের জ্ঞান হইতেছে ইত্যাদি কিছুরই বোধ নাই, অর্থাৎ এই রূপ একটা শব্দ এইরূপে উচ্চারণ করিয়া এইরূপ একটা পদার্থের জ্ঞান করিতেছি মনে এরূপ একটা চিন্তাই নাই, চিত্তে কেবল পর্ব্বত, বৃক্ষ বা গোরু এই শব্দই বল বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুই বল, বা তাহার জ্ঞানই বল প্রতিভাসিত হইতেছে অর্থাৎ শব্দ অর্থ ও জ্ঞান ইহারা এক হইয়া প্রতিভাসিত হইতেছে। যোগীর এইরূপ চিত্তের অবস্থাকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলা যায়। কেহ কেহ বলেন বাস্তবিক কোন ধ্যেয় বস্তু উপস্থিত নাই অথচ কল্পনা দ্বারা তাহার উপস্থান করিয়া ধ্যান করত একাগ্রতা লাভ করিয়া তদাকারে চিত্তের যে পরিণাম, তাহার নাম সবিতর্ক সমাপত্তি। যদি বল চিত্তের একাগ্রতা এবং সবিতর্ক সমাপত্তি এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ কি? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে চিত্তের একাগ্রতা অবস্থায় এ বিষয়ের অবলম্বন থাকে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার থাকে; সবিতর্ক সমাপত্তি অবস্থায় সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার থাকেনা, তখন কেবল মাত্র সেই বিষয়েরই একটা স্থূল জ্ঞান থাকে মাত্র একাগ্র অবস্থায় (ধ্যেয় বস্তুর বাচক শব্দ, ঐ শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ ধ্যেয় বস্তু) এবং তাহার জ্ঞান ইহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাসিত হয়। কিন্তু সবিতর্ক সমাপত্তি অবস্থায় উহারা সকলে অভিন্ন রূপে মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) হইয়া প্রতিভাসিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে ইহাও বক্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি যে, সমাপত্তি চার প্রকার। সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি, সবিচার সমাপত্তি এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তি। ইহাদের মধ্যে সবিতর্ক সমাপত্তি এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি স্থূল বস্তু বিষয়ক এবং সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাপত্তি সূক্ষ্ম বস্তু বিষয়ক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূল বস্তু দুই প্রকার (১) পঞ্চ ভূত ও তাহার কার্য্য, (২) ইন্দ্রিয়গণ। সূক্ষ্ম ও দুই প্রকার (১) পঞ্চতন্মাত্রা (২) অহংকার।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা॥ ৪৩।

পদচ্ছেদঃ। স্মৃতি-পরিশুদ্ধৌ, স্বরূপ-শূন্যা, ইব অর্থ-মাত্র-নির্ভাসা, নির্ব্বিতর্কা।

পদার্থঃ। স্মৃতিঃ (শব্দার্থ-সম্বন্ধঃ স্মরণম্), তস্যাঃ পরিশুদ্ধঃ (প্রবিলয়ঃ), তস্যাং সত্যাং স্বরূপং প্রজ্ঞারূপং জ্ঞানাত্মকং তৎশূন্যইব জ্ঞানরূপং পরিত্যেজ্যেব, অর্থমাত্রনির্ভাসা গ্রাহ্যরূপপ্রতিপন্না ইব নির্ব্বিতর্কা নাম।

অন্বয়ঃ। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ সত্যাং অর্থমাত্রনির্ভাসা স্বরূপ শূন্যা ইব যা সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিতর্কা কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স্মৃত্যা খলু অস্মাৎ শব্দাদয়মর্থো জ্ঞাত ইতি স্ফুরতি, নষ্টায়াঞ্চ স্মৃতৌ অর্থ এব কেবলং ভাসতে চিত্তঞ্চ অর্থাকারং ভবতি, অহমিদং জানামীতি জ্ঞানমপি ন ভাসতে যত্র, তাদৃশী-সমাপত্তিঃ নির্ব্বিতর্কা ইতি কথ্যতে।

অনুবাদ। ধ্যান করিতে চিত্তের একাগ্রতা ক্রমশঃ আরও বর্দ্ধিত হইলে, এই শব্দ হইতে এতাদৃশ পদার্থের জ্ঞান হইয়াছে এইরূপ স্মৃতির ও বিলোপ হইলে. যখন সেই ধ্যেয় বস্তুটি মাত্র চিত্তে প্রতিভাসিত হয় অথবা চিত্ত ও ধ্যেয় বস্তু একাকারে পরিণত হয়, এবং জ্ঞান ও যেন আপনারূপ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ধ্যাতার মনে "আমি ইহা জানিতেছি" এরূপ জ্ঞান ও না থাকে তাদৃশ ধ্যানাবস্থার নাম নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তিঃ।

সমালোচন। এখন বড় কঠিন সমস্যা, এতক্ষণ আন্দাজী বিদ্যা চলিতেছিল এখন অনুভবের বিষয় পড়িয়াছে, স্বয়ং অনুভব ব্যতীত এ সূত্রের মর্ম্ম বুঝা বা বুঝান বড় কঠিন, কিন্তু সে অনুভব আমাদের মত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে একান্তই দুর্লভ, যাহাদের চিত্ত ক্ষণার্দ্ধের জন্য ও এক বিষয়ে সংলগ্ন হইতে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে এরূপ ব্যাপক একাগ্রতার বিষয় সমালোচনা একপ্রকার উপকথা কওয়া মাত্র, কাযেই এস্থলে সূত্রের যথাশ্রুত অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত। কিন্তু উচিত কায সকল সময় করে উঠিতে পারা যায় কই? সেই জন্যই উপহাসের ডালি মাথায় করে এ সূত্রের উপর ও কিছু বাক্যব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে যে সবিতর্ক-সমাপত্তির কথা বলিয়াছি, তাহাতে যে কোন স্থূল আলম্বিত বস্তুর বাচক শব্দ, সেই বস্তু এবং তাহার জ্ঞান এই তিনেরই চিত্তে প্রতিভাস হইবে, অথচ তাঁহাদের পরস্পরের ভেদ জ্ঞান থাকিবে না, তিন একাকারে জড়িত হইয়া চিত্তের সহিত একতা প্রাপ্ত হইবে. অর্থাৎ তখন শব্দের এই টুকুসীমা, অর্থের এই টুকুসীমা এবং জ্ঞানের এই টুকুসীমা এরূপ প্রভেদ থাকিবেনা। এই তিনই এককালীন মিলিত হইয়া প্রতীত

হইবে। নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি অবস্থায় আবার চিত্তের স্থিরতা আরও বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং বৃত্তির ও হ্রাস হইবে, তখন শব্দ এবং জ্ঞান এ দুইএরই প্রতিভাস হইবেনা, অর্থ অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর প্রতিভাস হইবেমাত্র। এই সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি আবার কখন সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প নামে ও অভিহিত হয়। এই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি-অবস্থায় আলম্বন ধ্যেয় বস্তুর অবয়ব বা সমগ্র ধ্যেয় বস্তু (অবয়বী)? এই রূপ আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন সমগ্রধ্যেয় বস্তুই ইহার আলম্বন। আমরা এস্থলে আর সেই কঠোর বিচারের কঠোর ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৫।

পদচ্ছেদঃ। এতয়া এব সবিচারা, নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্ম-বিষয়া ব্যাখ্যাতা।

সমন্বয়পদার্থঃ। এতয়া সবিতর্কনির্ব্বিতর্করূপয়া স্থূলবিষয়ক সমাপত্ত্যা সূক্ষ্মবিষয়া (সূক্ষ্মতন্মাত্রাদিঃ বিষয়ো যস্যাঃ সা) সবিচার; নির্ব্বিচাররূপা সমাপত্তিদ্বয়ী ব্যাখ্যাতা বিশদীকৃতা অর্থোপরাগানুপরাগসামান্যেনেত্যর্থঃ।

ভাবার্থঃ। দেশকাল ধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা সবিচারা, দেশকালধর্ম্মাদিরহিতো ধর্ম্মিমাত্রতয়া সূক্ষ্মো র্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। স্থূল বিষয়ক সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির কথা যাহা বলিলাম, তাহাতে সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির ও ব্যাখ্যাকরা হইল। অর্থাৎ ইহাদের পরিভাষার জন্য আর স্বতন্ত্র সূত্রের অবতারণা করিবার প্রয়োজন নাই।

—০—

ব্রিটেনিয়া

সমীপে

ইণ্ডিয়া।

মহাকায় নীল-নিভ নীরধি উপরি,
নিরুপম বেদী এক কতই কৌশলে,
নির্ম্মাণ করেছে, বিধি অতি যত্ন করি,
ঝঞ্ঝা-বাতে নাহি, কাঁপে নাহি কভু টলে,
উত্তাল তরঙ্গে তার কণা নাহি গলে,
নিটোল অটোল সদা ভীম বল ধরি॥

২

তদুপরি কোন দেবী বিরাট গৌরবে,
উদধি ঈশ্বরী সমা বসি রত্নাসনে,
বিরাজেন বীর দর্পে চমকিয়া সবে।
বসুধা বাবিধি দোঁহে মিলিয়া যতনে,
সাজায়েছে চারু তনু বিবিধ ভূষণে,
জমকে শোভিছে বামা বিপুল বিভবে॥

৩

ভাসিছে রজত আভা বিমল বরণে,
অদূর সুদূর দেশ করি আলোকিত,
খেলিছে হর্ষের হাস্য বিকচ বদনে।
বিশাল মুকুট কিবা মস্তকে শোভিত,
সমুকুট শির কত চরণে লুণ্ঠিত,
জ্বলিছে প্রজ্বল প্রভা বিলোল লোচনে॥

৪

ভীষণ সমর অস্ত্র এক হাতে ধরা,
জনগণে করে যাহা সন্ত্রাসিত ভয়ে,
ভবানীর করে যথা অসি ভয়ঙ্করা।
এ দিকে অপর হস্তে তুলা দণ্ড লয়ে,
মাপিছেন রত্নরাশি আনন্দিত হয়ে।
ক্ষত্রভাবে বৈশ্যভাব মূর্ত্তি চমৎকারা॥

মহিমা মণ্ডলে দেবী বেষ্টিত হইয়া,
আছেন বসিয়া নিজ তেজ গরিমায়
পৃথ্বী-ব্যাপি প্রতাপের ছটা ছড়াইয়া।
প্রকাশে কতই দর্প ভাব ভঙ্গিমায়,
পারেন প্রলয় যেন করিতে হেলায়,
ভুবন বিখ্যাতা দেবী নাম ব্রিটেনিয়া॥

৬

প্রভুত প্রভুতা ইনি ধরায় বিস্তারি,
রাজ রাজেশ্বরীরূপে করেন বিহার;
কোটি কোটি নরবৃন্দ করি আজ্ঞাকারী,
পেতেছেন মহারাজ্য অতি চমৎকার,
রাবণ প্রতাপ সম প্রতাপ ইঁহার,
এঁর রাজ্যে অস্তমিত না হয় ধ্বান্তারি॥

৭

চারি দিকে দেখ এঁর কত রণ তরি,
সিন্ধুজা রাক্ষসী সম ভাসিছে সাগরে,
বজ্রনাদী বজ্র অস্ত্র বক্ষে কক্ষে পরি।
এঁরি বলে ব্রিটেনিয়া অর্ণব উপরে
শত্রুকুল তুচ্ছ করি আনন্দে বিহরে,
জিমূত মণ্ডলে যথা বৃত্রাসুর অরি॥

৮

আসুক আর্ম্মেডা গর্ব্বে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে,
যুড়িয়া যোজন অর্দ্ধ নীরধির নীর,
'অজেয়' উপাধি ধরি ঘোর অহংকারে,
দেখাক্ যতই ভয় বোনাপার্ট বীর
সমর অনলে করি য়ুরোপ অধীর,
ব্রিটেনিয়া নাহি টলে, নাহি ডরে কারে॥

৯

আব দেখ,দিকে দিকে ছেয়ে বসুমতী,
বিপুল বাণিজ্য পোত, কে করে গণন,
সাগব সরিৎ বাহি কবে গতাগতি,
আনিয়া ধনেব বাশি কবিছে অর্পণ,
দেখিয়া বিস্মিত অতি ক্ষিতিনাথগণ,
লাঞ্ছিত লক্ষ্মীব গর্ব, ক্ষুব্ধ যক্ষপতি।

১০

বিজয়েব বৈজয়ন্তী সুনীল অম্ববে,
উড়িছে অনিল যোগে তবঙ্গ আকাবে,
বিস্তাবি বিশাল ছায়া স্থল জলোপবে;
প্রবল পবনে নাবে ছিঁড়িতে উহাবে,
বজ্রপাত নাহি পাবে দণ্ড ভাঙ্গিবাবে,
উড়িছে দোলায়ে অঙ্গ সদা গর্বভবে॥

১১

ধনে বণে দৃষ্টি বাখি সুধাংশু বদনী
আছেন নিবিষ্ট সদা বিদ্যা বিনোদনে,
পূজিছে পণ্ডিত কত বলিয়া জননী.
সে মধুব মূর্ত্তি তাব হেবিলে নয়নে
উথলে ভক্তিব স্রোত সবাকাব মনে,
বিবাজেন ভবে যেন সাবদা আপনি॥

১২

মানব বৎসলা দেবী অশেষ যতনে,
সাধেন মানব হিত, মানব উন্নতি,
স্বর্গীয় উৎসাহে হয়ে উত্তেজিত মনে,
বিদূবিয়া দীন হীন দাসেব দুর্গতি,
করেছেন ঋণপাশে বদ্ধ বসুমতী,
বিরাজিবে যত দিন চন্দ্রার্ক গগণে॥

১৩

দেবীব সন্তান সবে মাতৃভক্তি বলে,
ধবাধামে কাহাকেও না কবি সন্ত্রাস,
খেলিছে ভবের খেলা [illegible]কোলাহলে;
স্বদেশে করুক বাস, বিদেশে প্রবাস,
রেখেছে সদাই অঙ্গে হৃদয় উচ্ছ্বাস,
অমেয় পার্থিব সুখ ভুঞ্জে কুতূহলে॥

১৪

স্থানে স্থানে মহাবণ্য উচ্ছেদন করি,
ইন্দ্রপ্রস্থ কবি তায় করিছে নিবাস,
স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ শৈল শৃঙ্গোপবি,
নির্ম্মাণ কবিয়া কত সুবম্য কৈলাস,
গৌবীসহ মহাসুখে কবিছে বিলাস,
নৃত্যগীতে উথলিয়া আনন্দ লহবি॥

১৫

স্থানে স্থানে কত পুত্র পবেব আলয়ে,
গঠিয়া আপন গৃহ বয়েছে পুলকে,
কতস্থানে দেখ তাবা পব ধন লয়ে,
কবিছে আমোদ নৃত্য কতই জমকে,
চলেছে জীবন পথে কতই ঠমকে,
কতই মনেব সাধ সাধিছে নির্ভয়ে॥

১৬

বত পুত্র দেখ তাঁব বেদীব উপবে,
অবিবত কাম্যযাগ কবে তন্ত্র লয়ে,
মহাধূমে ধূম তাব উঠিছে অম্ববে,
তাদের পূজায় দেবী সুপ্রসন্ন হয়ে,
অভিমত ফল দেন প্রফুল্ল হৃদয়ে,
যে বব যাচিছে তাবা, তোষেণ সে ববে॥

১৭

ভবেব বাজাবে আজি,দেখ, ব্রিটেনিযা,
লভেছেন,বলে কলে,সৌভাগ্যেব বল,
চাবিদিকে জয়ডঙ্কা উঠিছে বাজিয়া;
তাই দেখ, আজি তাঁর সন্তান সকল,
নাচিছে কুঁদিছে দর্পে ব্যাপি ক্ষিতিতল,
'রুল ব্রিটেনিয়া' গীত আনন্দে গাইয়া॥

১৮

দেখ আজি শত শত নবনারী আসি,
দিগ দিগন্তর হতে, করিতে অর্চ্চনা,
দেবীর চরণ পদ্মে দিয়ে ধন রাশি,
জানাইছে কতজন কতই কামনা,
কতজন নিদারুণ মনের বেদনা
নিবেদিছে করপুটে আঁখি নীরে ভাসি॥

১৯

তার মাঝে দেখ এক সুশীলা ললনা,
বিপুল-বয়সা তবু রূপ রমণীয়া
সরল স্বভাবা সতী সুন্দর বরণা—
শ্বেতাঙ্গীর পদে রত্ন অঞ্জলি পূরিয়া
দিয়ে, পূজে অবিরত ভক্তিতে মজিয়া,
কখন সহর্ষ, কভু বিমর্ষ বদনা॥

২০

অপূর্ব্ব শোভিছে অঙ্গ হরিত বসনে,
মণি মুক্তা হীরা তায় ঝল মল করে।
বিশাল কুন্তল জাল লুটায় চরণে,
অক্ষয় রতন কৌটা শোভে এক করে,
রহিয়াছে আর হাতে ভিক্ষাপাত্র ধরে,
মেগে খায়, নিজ ধন দিয়ে অন্য জনে॥

২১

কখন ভকতি ভরে দাঁড়াইয়া পাশে,
পুটাঞ্জলি হয়ে, দিয়ে চেলাঞ্চল গলে,
স্তব স্তুতি করিতেছে সকরুণ ভাষে,
কখন যুগল জানু পাতি ধরাতলে,
নতশিরে প্রণমিছে চরণ কমলে,
বেদীরূঢ় বরাঙ্গীর বর অভিলাষে॥

২২

কভু কোন মনোগত কথা বলিবারে
চাহে, কিন্তু কি কারণে, সেই তাহা জানে,
না পারে বলিতে, খেদ অন্তরে নিবারে।
করেতে কপোল রাখি বিষণ্ণ বয়ানে,
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দেবী মুখ পানে;
ছলী ছল ছুনয়ন সলিলের ভারে॥

২৩

কখন কখন কত অমূল্য ভূষণ,
শ্বেতাঙ্গীর করে বামা দেয় উপহার,
আপনার অঙ্গ হতে করিয়া মোচন;
অপরূপ রত্ন রাজি অতি চমৎকার,
অন্বেষণ কর যদি কুবের ভাণ্ডার,
তবু না দেখিতে পাবে তেমন রতন॥

২৪

ব্রিটেনিয়া দেখে তাঁরে কৌতুকে সম্ভাষে;
"কে তুমি সুন্দরী সতী কাহার অঙ্গনা,
কি লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছ মম পাশে?
কেন বা করিছ এত আমার অর্চনা,
সাধিতে কামনা কিম্বা নাশিতে যাতনা,
মম পুরে আসা তব, বল, কোন আশে?

২৫

মরি! কি মুরতি তব মাধুরির ধাম,
হয়েছে বয়স তবু একি অপরূপ,
অদ্যাপি সবার তুমি অক্ষি অভিরাম!
না জানি যৌবন কালে ছিল কত রূপ,
দেবগণ দেখিবারে হইত লোলুপ,
ভুবন মোহিনী তুমি ভুবন ললাম॥

২৬

রূপ হতে গুণে তুমি আরো কমনীয়া,
ভাসিছে মহত্ব ভাব, সারল্য, শীলতা;
রসনা ভাষিছে ভাষা সুধারে জিনিয়া;
অর্থ দানে প্রকাশিছে যেন কল্পলতা,
ভক্তিমতী বিনয়িনী সদা ধর্ম্মে রতা;
বোধ হয় তুমি বুঝি হইবে ইণ্ডিয়া॥"

২৭

সস্নেহ মধুর বাণী শুনি বিদেশিনী,
গদ গদ স্বরে বলে করিয়া বিনয়,
"সত্য বটে আমি দেবি, সেই অভাগিনী,
বিদেশে ইণ্ডিয়া নামে যার পরিচয়,
স্বদেশে ভারত-ভূমি যারে সবে কয়,
অধুনা হয়েছে যেই তোমার অধিনী॥

২৮

বসি তব পরাক্রম তরুর তলায়,
তব নাম জপি, আর তব গুণ গাই,
অবিরত থাকি রত তব অর্চনায়।
যখন যা আজ্ঞা কর, করি আমি তাই,
কিঙ্করী কর্ত্তব্য কার্য্যে কভু হেলা নাই,
সঁপিয়াছি তনু মন তোমার সেবায়॥

২৯

তোমারে তুষিতে যদি নিজে কষ্ট পাই,
যদি কভু হয় ত্যাগ করিতে স্বীকার,
তাহাতেও কভু মম বাধা দ্বিধা নাই;
সদাই প্রস্তুত আছি, রক্ত আপনার
প্রদানি, করিতে রক্ষা গৌরব তোমার,
তাড়াইয়া দিতে তব আলাই বালাই॥

৩০

কিন্তু গো এখন আর নাহি মম বল,
নাহি সে প্রতাপ-সূর্য্য যাহার কিরণে,
ছিলাম তপন তলে অতীব উজ্জ্বল,
মহাতেজে তেজস্বিনী সবার নয়নে।
সে রবি হয়েছে অস্ত হলো বহু দিন,
তদবধি আছি পড়ে হয়ে দীন ক্ষীণ॥

৩১

তদবধি নিদারুণ কতই বিপ্লব,
গেছে বয়ে মম'পরি যেন ঝঞ্ঝাবাত,
ঘটেছে নিষ্ঠুর ভাবে কত উপদ্রব,
সয়েছি পাতিয়া বক্ষ কতই উৎপাত;
পশেছে হৃদয়ে কত বিষ মাখা শর,
কেঁদেছি কতই মা গো হইয়া কাতর।

৩২

কালে কালে আসি কত অরাতি দুর্জ্জন
লয়েছে রতন কত করিয়া হরণ,
পৈশাচিক পিপাসায় কত শত্রুগণ,
হৃদের শোণিত মম করেছে শোষণ।
এখন অদৃষ্ট চক্রে আবর্ত্তিত হয়ে,
আসিয়া পড়েছি মা গো তোমার আশ্রয়ে॥

৩৩

সৌভাগ্য বলিয়া ইহা ভাবি ব্রিটেনিকে,
ভাবি বিধি অনুকূল পুন মমপ্রতি,
শুভ গ্রহগণ পুন এলো মম দিকে.
অবশ্য ঘুচিবে মম সকল দুর্গতি।
অবশ্য হইবে মম সুদিন উদয়,
তুমি দয়াময়ি যদি হও গো সদয়॥

৩৪

মহীয়সী শক্তি তব, মহীয়সী মতি,
সাধিতে পরের হিত সদা অভিলাষ,
আমারে অধীন তব করি, বিশ্বপতি
করেছেন মম প্রতি করুণা প্রকাশ।
অস্তমিত সুখ সূর্য্য, তোমার শাসনে
উঠিবে আবার মম অদৃষ্ট গগনে॥

৩৫

সরল মনেতে আমি ভুবিছি আশায়,
তোমার মহত্ত্ব'পরি করিয়া বিশ্বাস,
আবার হরষে হাসি হাসিব ধরায়,
আবার নাচিবে হৃদে আনন্দ উচ্ছ্বাস।
সতেজ শোণিত পুন তোমার কৃপায়,
প্রবাহিত হবে মম শিরায় শিরায়॥

৩৬

হইয়াছে পুত্রদের যেরূপ দুর্দ্দশা,
জড় ভাবে রহিয়াছে যেরূপ নিশ্চল,
উদিত না হয় মনে এমন ভরসা,
আবার আমার তারা সাধিবে মঙ্গল;
গভীর নিদ্রায় আছে সবে অচেতন,
অসাড় শরীরে ধরি অসার জীবন।

৩৭

ভুলে গেছে নিজ মান নীচাশয় হয়ে,
মনের উৎসাহানল করেছে নির্ব্বাণ,
নিস্তেজ ভাবেতে আছে নিষ্প্রভ হৃদয়ে,
হারায়ে জাতীয় জ্যোতি সংসারে সম্মান,
আঁধারে জীবন কাল কাটে কোনরূপে,
মণ্ডুক মণ্ডলি যথা তমোময় কূপে॥

৩৮

নাহি আর ব্রহ্মতেজ ব্রাহ্মণের কূলে,
ক্ষত্রগণ হারায়েছে সাহস সমরে,
উন্নতি বাণিজ্য-বৃত্তি বৈশ্য গেছে ভুলে,
কত বা লয়েছে তব পুত্রগণ হরে।
নিরাশ নির্জীব সবে, কাজেতে বিমুখ,
কেবল পরের পদ লেহিতে উৎসুক।

৩৯

পুত্রগণে হেন রূপ হীনদশা হতে,
উদ্ধার করিতে দেবি তব কৃপাবল,
দেখি আমি এক মাত্র উপায় জগতে,
তব কৃপা ভিন্ন আর সকলি বিফল।
তোমার যতনে আর তোমার শিক্ষায়,
জাগিয়া উঠিতে পারে আবার ধরায়।

৪০

দুরিতহারিণি দেবি দয়াশীলা হয়ে,
কৃপায় কটাক্ষপাত কর মম পরে
অতুল আনন্দে মম পুত্রগণ লয়ে,
আরোহিব পুনরায় সৌভাগ্য শিখরে।
সুখের পয়োধি পুন হয়ে উচ্ছ্বসিত,
শোকদগ্ধ হৃদে মম হবে প্রবাহিত॥

৪১

দুর্ব্বলা দেখিয়া হেয় করো না আমায়
এক কাল অবনীর ছিলাম ভূষণ,
অতুল্য ছিলাম বলে, বিখ্যাত বিদ্যায়,
সভ্যতা চন্দ্রমা ছিল ভুবন রঞ্জন।
উন্নতি হয়েছে ভবে যতই প্রকার,
সকলেরি জেন দেবি আমি মূলাধার॥

৪২

ভগবতী সরস্বতী জ্ঞানের ঈশ্বরী,
এখন দেখ গো যিনি য়ুরোপ সমাজ
অপরূপ বিদ্যালোকে আলোকিত করি,
মহোল্লাসে সদা তথা করেন বিরাজ,
আমার উদরে জন্ম লন ক্ষিতিতলে,
ভারতী বলিয়া তাই সম্বোধে সকলে।

৪৩

বিভাসি শৈশবে ইনি নবীন মাধুরী,
থাকিতেন মম অঙ্ক করি সুশোভন,
রূপের ছটায় দীপ্ত করি মর্ম্ম পুরী,
তিমিরে অপর দেশ আচ্ছন্ন যখন;—
বাড়িলেন দিনে দিনে আমার পালনে,
সিত পক্ষে বাড়ে যথা সিতাংশু গগনে॥

৪৪

দেবলোক হতে হন অবতীর্ণা ভবে,
করিবারে দেবতুল্য মানবে মহীতে,
বুঝিয়া মহিমা তাঁর আর্য্য ঋষি সবে,
আরম্ভিল ভক্তি ভাবে যতনে পূজিতে।
সারদার পদে সবে অর্পি অনুরাগ,
সরস্বতী তীরে করে সারস্বত যাগ॥

৪৫

আর্য্যদেব অর্চ্চনায় ভারতে ভাবতী,
অপার করুণা গুণে প্রসন্না হইয়া,
করিলেন সকলেরে আনন্দিত অতি,
ঋষিদেব রসনায় নাচিয়া গাইয়া,
যাচিল যেজন যাহা দেবীর গোচর,
তুষিলেন তারে তিনি দিয়া সেই বর।

৪৬

সেই বরে পূর্ব্বতন ঋষিবরগণ,
সুধা মাখা সামগীত গাইলেন ভবে,
ঋক্ মন্ত্রে করিলেন প্রকৃতি পূজন,
দেবতা কাহিনী কত কহিলেন সবে।
করিলেন ব্রহ্মতত্ত্ব যত্নে নিরূপণ,
সুবিমল উচ্চতম ধর্ম্মের জীবন ॥

৪৭

মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাস আমারি সন্তান,
অদ্যাপি গর্ব্বিত আমি তাঁহাদের যশে,
গেয়ে গেছে কিবা তারা পৌরাণিক গান
মাতাইয়া মহীতল কাব্য সুধারসে।
আজো পিয়ে সেই রস যত্নে নরকুল।
যত পিয়ে তত তারা তৃষায় আকুল ॥

৪৮

ঋষি ছাড়া আরো কবি উদরে আমার,
জন্মেছিল কালে কালে কত কব নাম,
তার মাঝে কালিদাস অগ্রণী সবার,
বরদার বর পুত্র, কল্পনার ধাম।
বিদ্যার বিনোদ বনে সুকণ্ঠ কোকিল।
করিল মধুর গীতে মোহিত অখিল।

৪৯

ভুবন রঞ্জন গীতি অতি চমৎকার,
শত ধারে সুধাধারা ক্ষরে তাহা হতে,
কিবা ভাব কিবা ভাষা কিবা রস তার,
উপমায় অনুপম সাহিত্য জগতে।
কত তাহে কল্পনার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
প্রকৃতির কত বিধ প্রতিমা প্রকাশ ॥

৫০

ভারবি শ্রীহর্ষ মাঘ ভবভূতি আর,
এরাও বিখ্যাত অতি সারদা কৃপায়,
গেছে সবে আলো করি সাহিত্য সংসার,
কবিতার কমনীয় কনক আভায়।
ভাসায়ে দিয়েছে কাব্য প্রেমের তরঙ্গে,
কবিবর জয়দেব জন্ম লয়ে বঙ্গে ॥

৫১

এদিকে রাজর্ষি মনু আদি তপোধন,
সুদূরদর্শিতা আর বিদ্যাশক্তি বলে,
করি যত্নে বহুবিধ বিধি প্রণয়ন,
গেছেন সমাজ বাঁধি অপূর্ব্ব কৌশলে।
সেই সব বিধি যেন বিধির প্রণীত,
তারি বলে আর্য্যগণ অদ্যাপি জীবিত ॥

৫২

আর দেখ, কণাদাদি দার্শনিক যত,
জড় রাজ্যে মনোরাজ্যে গবেষণা করি,
নানাবিধ গূঢ়তত্ত্ব, নানাবিধ মত,
রেখেছেন ভারতীর রত্নাগার ভরি;
সেই সব তত্ত্ব আর সেই সব মত,
য়ুরোপ মানিছে আজি করি শিরোনত ॥

৫৩

এইরূপে সরস্বতী আমার উদরে
জনমিয়া, অবতীর্ণা হন বসুধায়,
বাড়িলেন দিন দিন আমায় আদরে,
আলো করি মম পুরী রূপের ছটায়;
মম পুত্রগণ সবে পূজিয়া তাঁহায়,
নরকুলে নরদেব হইল ধরায় ॥

৫৪

তাঁহার কৃপায় মম সুকৃতি গগনে
সুশোভিল জ্ঞান-শশী অতি চমৎকার,
আলোকিত হলো ধাম কৌমুদী কিরণে,
পলাইয়া গেল দূরে অজ্ঞান আঁধার;
দেশে দেশে সেই আভা হয়ে বিস্তারিত,
সাধিল অশেষ বিধ মানবের হিত॥

৫৫

এরূপে ছিলাম দেবি অতি সমুজ্জ্বল,
প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে আর ধর্ম্ম বিভূষণে,
সভ্যতার সাজ তায় কিবা ঝলমল,
অতি মনোহর মূর্ত্তি সুরম্য দর্শনে।
তখন কে দেখে দেবি গৌরব আমার,
গরীয়সী গর্ব্ব ভূমি ছিলাম ধরার॥

এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে নবজীবনে প্রকাশিত হয়; পরের অংশ আমার পিতৃদেবের শেষ রচিত পদ্য—ইহা অসম্পূর্ণ, তথাপি আমি প্রকাশিত করিলাম; ভরসা করি পাঠকগণ ইহাতে কেহ কিছু মনে করিবেন না।

নবজীবন সম্পাদক।

৫৬

এ দিকে সন্তানগণ ছিল গো যেমন,
বিদ্যায় বিখ্যাত অতি জ্ঞানে গরীয়ান্,
সেইরূপ অন্য দিকে অন্য পুত্রগণ,
ছিল রণ-বিশারদ, বলে বলীয়ান,
বীরত্বে সাহসে ছিল কুমার সমান,
শত্রু বিনাশিতে সবে সাক্ষাৎ শমন॥

৫৭

হিমাদ্রি হইতে যথা সাগর লহরি
নাচিতেছে নিরন্তর ঘেরি স্বর্ণ লঙ্কা,
বিহারিত পুত্রগণ অতিদর্প করি,
অরাতি দর্শনে কভু করিত না শঙ্কা,
ধাইত উল্লাসে শুনে সমরের ডঙ্কা,
করি-রব শুনে ধায় যেমন কেশরী॥

৫৮

বলে মহাবল সবে রূপে চমৎকার,
দরশনে দেবতুল্য অতি মনোহর,
সৌর কিম্বা সোম লোক হতে অবতার;
ধরাতলে ছিল হেন কোন বীরবর,
শত্রুভাবে মম অঙ্গে দেয় নিজকর,
মম অপমান করে, সাধ্য ছিল কার॥

৫৯

বিমুখ হইতে রণে কভু নাই শিক্ষা,
'সম্মুখ সংগ্রামে মার, কিম্বা নিজে মর,'
এই দুই সার বাক্যে পেয়েছিল দীক্ষা,
হউক যেমন অরি—দৈত্য কিম্বা নর,
কিম্বা নরমাংস লাভী ক্রুদ্ধ নিশাচর,
করিত না কারো কাছে জীবনের ভিক্ষা॥

৬০

হউক শত্রুর শেল যতই দুর্জ্জয়,
রণ ত্যজি নাহি তারা করিত পলান,
থাকিত অটলভাবে পাতিয়া হৃদয়,
বীরত্ব গৌরবে নাহি দিত বলিদান
রাখিতে অনিত্য দেহ, অনর্থক প্রাণ,
ইহলোকে লভি নিন্দা, চরমে নিরয়॥

৬১

বীরেন্দ্র তনয়গণ উৎসাহিত মনে
দিগ্বিজয় সাধিবারে ধাইত যখন,

মহাদম্ভে বীরদর্পে লয়ে যোধগণে,
কার সাধ্য তাহাদিগে বোধে গো তখন,
ভীম ভাবে প্রধাইত যেন প্রভঞ্জন ;
আর কি তাদৃশ দৃশ্য হেরিব নয়নে ॥

৬২

সেদিন অদ্যাপি মনে পড়ে গো জননি !
যেদিন অযোধ্যাপতি রঘু মহারাজ,
সূর্য্যবংশ অবতংশ নৃপ চূড়ামণি,
ধাইলেন সৈন্য সহ ধরি রণসাজ,
লভিতে বিজয় যশ ভূপতি সমাজ,
বাহুবলে একছত্রা করিয়া অবনী ॥

৬৩

চলিল দ্বিরদবাজি অগণন বাজী,
পৃষ্ঠেলয়ে বীরবৃন্দ অতি বলীয়ান,
চলিল বিপুল রথী স্যন্দনে বিরাজি,
সৌরতেজে তেজীয়ান করে ধনুর্ব্বাণ,
শৌর্য্যে আর দরশনে কার্ত্তিক সমান,
প্রভুত পদাতী চলে অস্ত্রে শস্ত্রে সাজি ॥

৬৪

রথের ঘর্ঘর ঘোষ, ঘণ্টার ঠঠনী,
ধন্বীদের ধনুকের টঙ্কার ভীষণ,
বীরের হুঙ্কার নাদ জিনিয়া অশনি,
হয়ের বিকট হ্রেষা, গজের গর্জন,
দুন্দুভি দামামা আদি বাদ্যের বাদন,
তুলিল গগণ ভেদী ভয়াবহ ধ্বনি ॥

৬৫

এরূপে রাঘবী সেনা মহা কোলাহলে,
ধাইছে বিরাট ঠাটে চমকি সংসার,
ভীমনাদী সিন্ধু যেন উথলিয়া চলে ॥
উঠিছে ধূলীর রাশি জলদ আকার,
তার মাঝে রঘু শোভে অতি চমৎকার,
শোভে যেন আখণ্ডল জীমূত মণ্ডলে ॥

৬৬

অমিত সাহসী রাজা বীরেন্দ্র কেশরী,
চলেছেন বীরদর্পে নানা দেশ দিয়া,
অমিত্র রাজন্য বর্গে পরাভব করি ;
বিনা যুদ্ধে বহু ভূপ বিনত হইয়া
বাঁচাইল প্রাণ, পদে শরণ লইয়া ;
রণক্ষেত্রে যমঘরে গেল কত অরি ॥

৬৭

শেষে বীর উপনীত সিন্ধু নদ পারে,
যেখানে যবন গণ হইয়া সত্বর,
রণে হানা দিল আসি ভীষণ আকারে ;
বাধিল তুমুল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর,
প্রবল উভয় দল সম ধনুর্দ্ধর,
সহজেতে জিনিবারে কেহ কারে নারে ॥

৬৮

আকাশ ছাইয়া ছুটে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর,
সন সন চলে চক্র, শেল পড়ে ঘন,
অসী ঘাতে অনেকের দ্বিখণ্ড শরীর,
অকালে বহুল বীর ত্যজিয়া জীবন,
চলে গেল তমোময় তাপনী ভবন ;
নদীর আকারে বহে নরের রুধির ॥

৬৯

শবের উপরে শব পড়ে স্তরে স্তরে,
দেহ হতে কাটা মুণ্ড পড়ে ঘন ঘন,
অচেতন কত যোধ ধরা পৃষ্ঠোপরে ;
কেবা দেখে,কেবা পোঁতে,কে করে দাহন,
শৃগাল কুকুরে আসি করিছে ভক্ষণ ;
অথবা গৃধিনী গণ ছেঁড়া ছিঁড়ি করে ॥

৭০

নির্ভীক হৃদয়ে হেথা রঘুবীরবর
ভ্রমিছেন রণ মাঝে সিংহের সমান,
ভ্রমিছেন হানিছেন শেল শূল শার,

শত শত শত্রু তায় হয় হত প্রাণ,
অব্যর্থ আয়ুধ তাঁর, অমোঘ সন্ধান ,
সংগ্রামে বিপক্ষ দলে মরিল বিস্তর ॥

৭১

যবন সেনার ক্ষয় হল অতিশয়,
অল্প মাত্র রহে প্রাণে, ভাগ্যনিবন্ধন,
তাহারাও অবশেষে পেয়ে হৃদে ভয়
রণে পৃষ্ঠ দেখাইয়া করে পলায়ন,
শত্রু হস্ত হতে ভবে রাখিতে জীবন ॥
তুলিল রাঘব সৈন্য শব্দ জয় জয়,

৭২

এইরূপে ভুজ বলে জিনিয়া যবনে
ফিরিলেন সেনা সহ রঘু নর বর,
অযোধ্যার অভিমুখে আনন্দিত মনে ॥
সঙ্গে সঙ্গে বন্দী রাজা চলেছে বিস্তর,
বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তীর উপরে,
বিজয়ের বৈজয়ন্তী উড়িছে গগণে ॥

৭৩

সজ্জিত দ্বিরদে রাজা সজ্জিত হইয়া,
রাজধানী যেই দিন করেন প্রবেশ,
দ্বিধারে দণ্ডায়মান লোক মধ্যদিয়া,
সে দিনের মহোৎসব, নগরীর বেশ,
হেরিলে না থাকে শোক দুঃখ লেশ,
অন্তরে আনন্দ সিন্ধু উঠে উথলিয়া ॥

৭৪

তোরণে তোরণে বাজে বিজয় বাজনা,
পুষ্পমাল্যে রম্য হর্ম্ম সুশোভিত অতি,
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে কুলাঙ্গনা।
নাচিছে গাইছে কত মোহিনী যুবতী,
লাজা বৃষ্টি পুষ্প বৃষ্টি করে কত সতী,
আগে আগে বন্দীগণ করিছে বন্দনা ॥

৭৫

রাজকর্ম্মচারী কত বসি গজোপরে,
ছড়াইছে রত্নরাশি পূরিয়া অঞ্জলী
কুড়াইছে দীন দুঃখী প্রফুল্ল অন্তরে ,
বিপুল প্রজার কুল হয়ে কুতূহলী,
বিকাশে মনের হর্ষ জয় জয় বলি ,
বেদমন্ত্রে ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥"

ন্যাশনাল কংগ্রেস কি ?

'ন্যাশনাল কংগ্রেস্ কি ?' জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত একশ্রেণীর 'শিক্ষিত যুবক' হো হো রবে হাস্য করিয়া বলিবেন,—"ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ এর বাঙ্গলা অনুবাদ করিলেইত বুঝা যায়; 'জাতীয় মহাসমিতির' নামই ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্।" প্রজানীতিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলেন,—("ভারতের) প্রবলা রাজনীতির পাশাপাশি, নিরেট ঘাতসহিষ্ণু শক্ত সমর্থ রক্ত অস্থিময় প্রজানীতি সঙ্গঠনরূপ মহদনুষ্ঠানের নামই—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস।" এইরূপ প্রশ্নোত্তর—মীমাংসা অদ্যপ্রায় দুই বৎসর কাল হইয়া আসিতেছে। প্রশ্নকারীগণের প্রশ্নের ঠিক উত্তর এপর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা, জানি না। উত্তরকারীগণ কিন্তু মনে মনে ভাবিয়াছেন—"ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?' এ প্রশ্নের আমরা ঠিক উত্তর দিয়াছি। তবে যে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে নাই, সে কেবল প্রশ্নকারীগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কের অভাব; এবং তাঁহাদের বালকোচিত 'কেন' র উত্তর অসম্ভব বলিয়"। আমাদের কিন্তু বোধ হয়, "ন্যাশনাল্ কংগ্রেস কি ?" 'বঙ্গবাসী' এপ্রশ্ন যে ভাবেই উপস্থিত করন না কেন, কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাতা, বন্ধুগণ সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে বা দিতে পারিলে, আপামর সাধারণের মনে 'কংগ্রেস্' বিষয়ে কোন খট্কা থাকিত না। হাজার গালি খাউক তথাপি সকলেই জিজ্ঞাসা করে, "ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ বলিয়া যে একটা আড়ম্বর আন্দোলন শুনিতে পাই, সেটা কি ?" আমরা আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মত উহার উত্তর দিয়াত কাহাকে নিরুত্তর করিতে পারিই নাই, কংগ্রেসের বন্ধুগণের (চিহ্নিত বন্ধুগণের) লিখিত প্রবন্ধাবলী সাধারণসমক্ষে উচ্চৈস্বরে পাঠ করিয়াও বুঝাইতে পারি নাই,—'কংগ্রেস্ কি ?' সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করে,—"আমরা সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক শব্দালঙ্কারে-ভাষিত—কংগ্রেসের-অর্থ শুনিয়া কি করিব ? আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অনুর্ব্বর মস্তিষ্কে যে ভাব প্রবেশ করে, সেইরূপ 'স্বল্পাক্ষরী, সারবতী, সন্দেহ শূন্য' ভাষায় শুনিতে চাই,—'ন্যাশানাল কংগ্রেস্ কি ?" রাজনীতি ও প্রজানীতির পরিচর্য্যায় যাপিত জীবন কংগ্রেসের বন্ধুগণ, প্রাগুক্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিবেন ভরসায়, অদ্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

নানা ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক জাতিপূর্ণ এই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বড় সহজ কথা নহে। অথচ শুনিতে পাই, সাত শত বা সার্দ্ধসপ্তশত পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর একত্র সম্মিলনের নাম,—জাতীয় মহাসমিতি-সঙ্গঠন! আমরা "বঙ্গবাসীর" ন্যায় বলি না,—"এতগুলি শিক্ষিত ভারত বাসীর মধ্যে কেহই জাতীয় প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহেন। শিখাধারি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ি গুম্ফ ধারি মোল্লা না হইলে, চোগা চাপ্‌কান ধারি বাবুর দল জাতীয় প্রতিনিধি হইতে পারে না।" আমরা এই মাত্র বলি, কংগ্রেসের পাণ্ডা অনুষ্ঠাতাগণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মাত্রকেই দেশের মুখপাত্র বা জাতীয় প্রতিনিধি বলেন, সে কথা ঠিক নহে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিতকেই কেহ জাতীয় প্রতিনিধি বলা দূরে আস্তাং, দেশের মুখ পাত্র বলিয়া স্বীকার করিতেও নারাজ। আমরা পল্লিগ্রাম এবং গণ্ডগ্রামের অবস্থা যত দূর জানি, তাহাতে আমরাও এই অংশে 'বঙ্গবাসীর' সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া বলিতে পারি, অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ওরফে কলেজ ফের্‌তা বাবুর দল, "গাঁয়ে মানে না আপনি মণ্ডল" হইয়া স্বদেশের, স্বগ্রামের মুখপাত্র বলিয়া, আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, অনেক বাবুই স্বীয় জন্মভূমির (যে গ্রামে জন্ম) প্রকৃত উন্নতি আকাঙ্ক্ষী নহেন। তবে যেমন সভাসমিতিতে বক্তৃতাকালে ভাই ভারতবাসী! বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া উপদেশের ছড়াছড়ি করেন, তেমনই সভাক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই প্রতিবাসীগণের কথাত মনে থাকেই না, প্রাণতুল্য সহোদর ভ্রাতার সহিতও সম ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন। এরূপ স্বদেশহিতৈষি বাবুর সংখ্যা এই ভারতে, বিশেষত এই বঙ্গভূমিতে অল্প নহে। 'বাঙ্গালী চরিত' রচয়িতা 'গোপাল বাবু' নামে যে এক জন স্বদেশ হিতৈষি, বক্তৃতা-প্রিয় 'শিক্ষিত' বাবুর চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, অনেকে তাহা অতি রঞ্জিত বলেন। আমরা কিন্তু অনেক বাবুকেই উক্ত চিত্রানুরূপ লক্ষ্য করি। এই প্রবন্ধের সহিত বাবুদলের চিত্র প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজনীয় না হইলে, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা আমাদের পরিচিত কতকগুলি বাবুর নাম ধাম সহ চিত্রাঙ্কণ করিতাম। সে যাহউক, আমরা যাহা বলিলাম, তাহার কতকাংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণ কি স্বদেশের দূরে আস্তাং, স্বগ্রামেরও প্রতিনিধি হইবার যোগ্য? যদি না হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, ন্যাশনাল্ কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই স্বদেশ বা স্বজা-

তির প্রতিনিধি নহেন। অনেকেই কেবল স্বস্ব সত্তার প্রতিনিধিমাত্র। অথচ এই শ্রেণীর অধিকসংখ্যক লোকের একত্র সম্মিলনের সাধারণ নাম, কেহ বলেন,—প্রজানীতি সঙ্গঠনের মহদনুষ্ঠান; অনেকে বলেন,—জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক অধিবেশন বা পূর্ণাধিবেশন। ফলত যাহাদিগকে লইয়া দেশ, যাহাদিগের জন্য প্রজানীতি সঙ্গঠনের চেষ্টার কথা বলা হইতেছে, সেই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত নিরক্ষর ভারতবাসী এক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"বাবুগণ। আপনারা যাহাকে প্রজানীতি সঙ্গঠনের মহদনুষ্ঠান, জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক বা পূর্ণ অধিবেশন বলিতেছেন, আমরা তাহাকে কলিকাতার সেই মহামেলার ন্যায় কোন কোন মহানগরীতে বর্ষে বর্ষে শিক্ষিত প্রদর্শনী হইতেছে, বলিয়াই বুঝি।" তথাপি বিচক্ষণ সর্ব্বনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতেছেন,—"কংগ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।" তাই বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে,—"তবে ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?"

সাধারণেত 'কংগ্রেস্ কি ?' তাহা আজও বুঝিতে পারিল না। অথচ 'কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?' কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের মধ্যে এখন এই কথার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে বলে (সুরেন্দ্রবাবু নিজেও বলেন,) "ভারত সভা ওরফে তিনিই (সুরেন্দ্র বাবুই) কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতা বা জন্ম দাতা। এই কথার উত্তর ছলে সেদিন শুনিয়াছি,—গনেশদেব যোষী দিল্লি-দরবারে যে সংবাদ পত্রের সম্পাদক সমিতি সঙ্গঠনের চেষ্টা করেন, তাহারই পরিণাম ফলই—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্।" আমরা এই উভয় কথাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার কোন প্রমাণ দেখি না। এক ভারতসভা ওরফে সুরেন্দ্র বাবুর (চেষ্টা বা যত্নের) দ্বারা—ন্যাশানাল্ কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। ঐ কথা বলিয়া যাঁহারা বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদীদলের অপেক্ষাও কংগ্রেসের অবমাননা কারী,—সুতরাং পরম শত্রু। এরূপ স্থলে "কংগ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার" বলাও ভুল। পক্ষান্তরে গনেশদেব যোষীর প্রস্তাবিত মত সংবাদ পত্রের সম্পাদক সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বা অবয়ব বৃদ্ধির নামই যদি 'কংগ্রেস্' হয়, তবে এই তিন-বার্ষিক অধিবেশনে কেবল সংবাদ পত্র সম্পাদক ভাবে একজনকেও 'কংগ্রেসে' উপস্থিত হইতে দেখিলাম না কেন ? 'সংবাদ পত্র সম্পাদক গণের নিমন্ত্রণ হইলনা' বলিয়া 'বঙ্গবাসীর' কান্না কাটি শুনিয়া, কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের কোথায় কর্ত্তব্য জ্ঞানোদয় হইবে, না—তাহারা 'বঙ্গবাসীকে' টিট্‌কারী দিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। "সংবাদ

নানা ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক জাতিপূর্ণ এই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বড় সহজ কথা নহে। অথচ শুনিতে পাই, সাত শত বা সার্দ্ধসপ্তশত পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর একত্র সম্মিলনের নাম,—জাতীয় মহাসমিতি-সঙ্গঠন। আমরা "বঙ্গবাসীর" ন্যায় বলি না,—"এতগুলি শিক্ষিত ভারত বাসীর মধ্যে কেহই জাতীয় প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহেন। শিখাধারি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ি গুম্ফ ধারি মোল্লা না হইলে, চোগা চাপ্‌কান ধারি বাবুর দল জাতীয় প্রতিনিধি হইতে পারে না।" আমরা এই মাত্র বলি, কংগ্রেসের পাণ্ডা অনুষ্ঠাতাগণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মাত্রকেই দেশের মুখপাত্র বা জাতীয় প্রতিনিধি বলেন, সে কথা ঠিক নহে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিতকেই কেহ জাতীয় প্রতিনিধি বলা দূরে আস্তাং, দেশের মুখ পাত্র বলিয়া স্বীকার করিতেও নারাজ। আমরা পল্লিগ্রাম এবং গণ্ডগ্রামের অবস্থা যত দূর জানি, তাহাতে আমরাও এই অংশে 'বঙ্গবাসীর' সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া বলিতে পারি, অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ওরফে কলেজ ফের্‌তা বাবুর দল, "গাঁয়ে মানে না আপনি মণ্ডল" হইয়া স্বদেশের, স্বগ্রামের মুখপাত্র বলিয়া, আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, অনেক বাবুই স্বীয় জন্মভূমির (যে গ্রামে জন্ম) প্রকৃত উন্নতি আকাঙ্ক্ষী নহেন। তবে যেমন সভাসমিতিতে বক্তৃতাকালে ভাই ভারতবাসী! বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া উপদেশের ছড়াছড়ি করেন, তেমনই সভাক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই প্রতিবাসীগণের কথাত মনে থাকেই না, প্রাণতুল্য সহোদর ভ্রাতার সহিতও সম ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন। এরূপ স্বদেশহিতৈষি বাবুর সংখ্যা এই ভারতে, বিশেষত এই বঙ্গভূমিতে অল্প নহে। 'বাঙ্গালী চরিত' রচয়িতা 'গোপাল বাবু' নামে যে এক জন স্বদেশ হিতৈষি, বক্তৃতা-প্রিয় 'শিক্ষিত' বাবুর চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, অনেকে তাহা অতি রঞ্জিত বলেন। আমরা কিন্তু অনেক বাবুকেই উক্ত চিত্রানুরূপ লক্ষ্য করি। এই প্রবন্ধের সহিত বাবুদের চিত্র প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজনীয় না হইলে, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা আমাদের পরিচিত কতকগুলি বাবুর নাম ধাম সহ চিত্রাঙ্কণ করিতাম। সে যাহউক, আমরা যাহা বলিলাম, তাহার কতকাংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণ কি স্বদেশের দূরে আস্তাং, স্বগ্রামেরও প্রতিনিধি হইবার যোগ্য? যদি না হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই স্বদেশ বা স্বজা-

তিব প্রতিনিধি নহেন। অনেকেই কেবল স্বস্ব স্বত্বার প্রতিনিধিমাত্র। অথচ এই শ্রেণীব অধিকসংখ্যক লোকেব একত্র সম্মিলনের সাধারণ নাম, কেহ বলেন,—প্রজানীতি সঙ্গঠনেব মহদনুষ্ঠান; অনেকে বলেন,—জাতীয় মহাসমিতিব বার্ষিক অধিবেশন বা পূর্ণাধিবেশন। ফলত যাহাদিগকে লইয়া দেশ, যাহাদিগেব জন্য প্রজানীতি সঙ্গঠনেব চেষ্টাব কথা বলা হইতেছে, সেই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত নিবক্ষব ভাবতবাসী এক বাক্যে জিজ্ঞাসা কবিতেছে,—"বাবুগণ! আপনাবা যাহাকে প্রজানীতি সঙ্গঠনেব মহদনুষ্ঠান, জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক বা পূর্ণ অধিবেশন বলিতেছেন, আমবা তাহাকে কলিকাতাব সেই মহামেলাব ন্যায় কোন কোন মহানগবীতে বর্ষে বর্ষে শিক্ষিত প্রদর্শনী হইতেছে, বলিয়াই বুঝি।" তথাপি বিচক্ষণ সর্ব্বনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতেছেন,—"কংগ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।" তাই বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা কবিতে হইতেছে,—"তবে ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?"

সাধারণেত 'কংগ্রেস্ কি ?' তাহা আজও বুঝিতে পারিল না। অথচ 'কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠাতা কে ?' কংগ্রেসেব পাণ্ডাগণেব মধ্যে এখন এই কথার বিচাব আবম্ভ হইয়াছে। অনেকে বলে (সুবেন্দ্রবাবু নিজেও বলেন,) "ভারত সভা ওবফে তিনিই (সুবেন্দ্র বাবুই) কংগ্রেসেব অনুষ্ঠাতা বা জন্ম দাতা। এই কথাব উত্তব ছলে সেদিন শুনিয়াছি,—গনেশদেব যোষী দিল্লি-দববাবে যে সংবাদ পত্রেব সম্পাদক সমিতি সঙ্গঠনের চেষ্টা করেন, তাহারই পবিণাম ফলই—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্।" আমবা এই উভয় কথাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার কোন প্রমাণ দেখি না। এক ভাবতসভা ওবফে সুরেন্দ্র বাবুব (চেষ্টা বা যত্নের) দ্বাবা—ন্যাশানাল্ কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হইতেই পাবে না। ঐ কথা বলিয়া যাঁহাবা বাহাদুবী দেখাইতে চাহেন, তাঁহাবা কংগ্রেসেব বিরুদ্ধ বাদীদলের অপেক্ষাও কংগ্রেসের অবমাননা কাবী,—সুতরাং পবম শত্রু। এরূপ স্থলে "কংগ্রেস্ অতি গুরুতব ব্যাপাব" বলাও ভুল। পক্ষান্তবে গনেশদেব যোষীব প্রস্তাবিত সংবাদ পত্রেব সম্পাদক সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বা অবয়ব বৃদ্ধির নামই যদি 'কংগ্রেস্' হয়, তবে এই তিন-বার্ষিক অধিবেশনে কেবল সংবাদ পত্র সম্পাদক ভাবে একজনকেও 'কংগ্রেসে' উপস্থিত হইতে দেখিলাম না কেন ? 'সংবাদ পত্র সম্পাদক গণের নিমন্ত্রণ হইলনা' বলিয়া 'বঙ্গবাসীর' কান্না কাটি শুনিয়া, কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের কোথায় কর্ত্তব্য জ্ঞানোদয় হইবে, না—তাহাবা 'বঙ্গবাসীকে' টিট্‌কারী দিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। "সংবাদ

পত্র-সম্পাদক গণই একরূপ দেশের প্রতিনিধি হইলে হইতে পারেন” বলিয়া, গনেশ দেব যোষী যে মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলেন, তাহার পরিণাম তবে অন্যরূপ হইল কেন? আমরা মনে করি, সাধারণ ভারতবাসীর বিশ্বাসও যোষী মহাত্মার প্রস্তাবের অনুরূপ। তাই আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কেবল শিখাধারি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কি দাড়ি গুম্ফ ধারি মোল্লাগণ অথবা স্বার্থান্ধ হুজুক্ প্রিয় কলেজ ফেরতা শিক্ষিতাভিমানী বাবুগণ—ইহাঁরা বর্ত্তমান কালে কেহই সম্পূর্ণ একটি জেলা বা জাতির প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নহেন। তবে দেশের জলবায়ু শিক্ষা এবং লোক চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়ায, বলা যায় না। যতদিন, প্রাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রথা ফিল্টর হইয়া এক অভিনব ভাবে আত্মশাসন বিধি দেশ ময় প্রচারিত এবং নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন বিচক্ষণ চিকিৎসকের মুষ্টি যোগ প্রায়, যোষীমহোদয়ের ব্যবস্থা যাহাতে প্রতি পালিত হয়, কংগ্রেসের প্রকৃত বন্ধুগণের সে চেষ্টা করা সর্ব্বতো ভাবে উচিত। কিন্তু দেশীয় প্রায় সকল সংবাদ পত্র সম্পাদকই এতদ্বিষয়ক আন্দোলন করিয়া কংগ্রেসের পাণ্ডাগণের অবজ্ঞা সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদর্শনে লজ্জায় নীরব হইয়াছেন। সুতরাং সংবাদ পত্র সম্পাদকগণকে কংগ্রেসের পাণ্ডাগণ যে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া, যোষী মহোদযের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন, সে আশা করা বৃথা। ইহার মধ্যে কি যে গূঢ়-রহস্য নিহিত আছে, তাহা সাধারণে বুঝিতে অক্ষম। তাই কংগ্রেসের প্রকৃতি বুঝিতে আমাদিগকে আরও অনেক বার প্রশ্ন করিতে হইবে,—‘কংগ্রেস্ কি?’

‘যত দিন আপামর সাধারণে বুঝিতে না পারিবে ‘কংগ্রেস্ কি?’ ততদিন সাতশত স্থলে সাত হাজার শিক্ষিত যুবক কংগ্রেসে উপস্থিত হইলেও আমরা ঘাত-সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ, বক্ত অস্থিময়, প্রজানীতি সঙ্গঠনের চেষ্টা এই কংগ্রেসে হইতেছে, একথা স্বীকার করিব না। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ আশা করি প্রাগুক্ত রূপ প্রজানীতির গোডা পত্তন ন্যাশনাল্ কংগ্রেসে হইবে। যাহাতে এহেন উপকারী সোধ—সুবঙ্গময স্থানে—কাঁচা ভিত্তির উপর গঠিত না হয়, সকল শ্রেণীর ভারতবাসীরই সে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। তাই কংগ্রেসের প্রকৃতি বুঝিতে অনেকে অনেকরূপ প্রশ্নকরে! কংগ্রেসের বন্ধুগণকে তাহাতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে দেখিলেই মনে হয়, তবে কি প্রজানীতির গোড়া-পত্তন কয়েকজন অসামাজিক লোকের একত্র সম্মিলনে, এবং গলাবাজিতেই হইবে। কংগ্রেসের বন্ধুগণ বলেন,—তাহা কে বলিল? ভারত-

বাসী মাত্রেই ভাবতেশ্বরীব প্রজা , সুতরাং সমস্ত ভারত বাসীর একসুরে সুব বাঁধনের চেষ্টাব নামই—'প্রজানীতি সঙ্গঠন'। তবেই আমরা বলিতে পারি, "মুটে মজুব হইতে, বাজা, মহাবাজা পর্য্যন্ত, অধ্যাপক হইতে অসভ্য বর্ব্বব পর্য্যন্ত—সকল শ্রেণীব ভাবত বাসীকে বুঝাইয়া দেও,—'কংগ্রেস্ কি ?'

যত দিন আমবা বুঝিতে পাবিব না, এবং সাধাবণকে বুঝাইতে পাবিব না—'ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ? তত দিন লোক প্রচলিত কোন উত্তব পাই-লেও আমবা নীবব হইব না। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কবিব,—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ কি ?' কংগ্রেসেব অনুষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুগণ কি আমাদেব প্রশ্নে কর্ণপাত কবিবেন না ? যদি তাঁহাবা আমাদেব প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকব বলিয়া উপেক্ষা কবেন, কেহই কোন উত্তব না দেন, তাহা হইলে আমবা নিশ্চয়ই বুঝিব,—ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের প্রদর্শনী, বা পাশ্চাত্য শিক্ষিতেব মহা মেলা !

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।
কালিয়া চক।
(মালদহ।)

কালিদাসের চৌর্য্যাপবাদ।

চৌর্য্যাপবাদ কথাটার সঙ্গে একত্র যোজিত হওয়ায়, কালিদাসকে আপনাদিগের কোন অপরিচিত লোক ভাবিবেন না। ইনিই সেই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাস। তাঁহার আবার চৌর্য্যাপবাদ—শুনিয়া অবাক হইবেন না, ভাবিয়া আকুল হইবেন না,—বলিতেছি শুনুন্। জানেন ত তাঁহার যেসকল কাব্য ও নাটক আছে তন্মধ্যে কাব্যে কুমারসম্ভব ও নাটকে শকুন্তলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই শকুন্তলা এবং কুমার সম্ভবের এক একটি কথা এক একটি পদ সাহিত্য ভাণ্ডারে এক একটি সমুজ্জল রত্ন। কালিদাস নাকি অনেকগুলি রত্ন কোন এক ধনাঢ্য মহাজনের সিন্দুক হইতে অপহরণ করিয়া প্রায় সকল গুলিকেই একটু আধটু ঘসিয়া মাজিয়া লওয়ার পর এবং দুই একটিকে অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া কুমার সম্ভবে "আপনার" বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন—অর্থাৎ শিবপুরাণের অনেক গুলিশ্লোক একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া বা অবিকল ভাবে কুমার সম্ভবের অবয়ব-পুষ্টি করিয়াছে।*

---

* শিবপুরাণ ত্রয়োদশ অধ্যায় ;—

দিশঃ প্রসেদুঃ পবনঃ সুখংববৌ
শঙ্খং নিদধ্মুর্গগনে চরাস্তথা।
পপাত মৌলৌ কুসুমাঞ্জলিস্তদা
বভূব তজ্জন্ম দিনং সুখপ্রদম্॥
মেনা তয়াপূর্ণ নিশেশবক্ত্রয়া
স্ফুরৎ প্রভামণ্ডলয়া ববাজ হ।
যথা বিদূরাচলভূমিরঞ্জসা
ঘনোত্থয়া রত্নশলাকয়া মুনে॥

কুমার সম্ভবের প্রথম সর্গ ;—

প্রসন্নদিক্ পাংশু বিবিক্তবাতম্
শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবর জঙ্গমানাং
সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥ ২৩।

ক থাটা প্রাচীনদিগের মুখে তখন তখন শুনা যাইত বটে কিন্তু ক্রমে চাপা পড়িতেছিল। তাহার পর তর্কবাচস্পতি মহাশয় বামাল শুদ্ধ দেখাইয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, এবং কালিদাস যে চোর এ বিষয়ে প্রকারান্তরে নিজের সম্মতি দিয়াছেন। কাজেই দেশশুদ্ধ ঢাক বাজিয়া গিয়াছে আব হঠাৎ চাপা পড়িবাব যো নাই। যাহাউক আমরা কিন্তু একথায় বিশ্বাস করিতে পাবি না। তাহাব প্রথম কাবণ অপবেব গ্রন্থ কাপি কবিয়া জগতেব শ্রেষ্ঠকবি হওয়া যায় না, দ্বিতীয়, কালিদাসের পক্ষে জাঁহাবাজ উকীল নিচুল কবি বর্ত্তমান থাকিলেও প্রবল শত্রুদিঙ্নাগাচার্য্য থাকিতে এত বড গুরুতব অকার্য্য করা তাঁহাব পক্ষে সম্ভবপর নহে।

তবে শিবপুবাণেব সহিত কুমাব সম্ভবেব শ্লোক মিলিল কিরূপে? সে বিষয়ে আমাদিগেব কিছু বক্তব্য আছে। কালিদাসেব পববর্ত্তী মহাত্মা পণ্ডিত-গণ প্রচলিত শিবপুবাণেব সঙ্কলন কর্ত্তা। পুরাণেব উদ্দেশ্য—ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্ম কথা প্রচার; কবিত্ব প্রদর্শন তাহাব উদ্দেশ্য নহে সুতরাং প্রকরণের অনুযায়ী হইলে পূর্ব্ব কবি প্রণীত শ্লোকাদিও তাহাতে উদ্বৃত হইতে পাবে; এবং এখানে তাহাই হইযাছে—কালিদাসেব শ্লোক গুলি যাহাতে-পুবাণেব অনুযায়ী হয়, সেইরূপে একটু আধটু পবিবর্ত্তিত করিয়া শিবপুবাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিবপুবাণের সঙ্কলন যে কালিদাসেব পবে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মৎস্য পুবাণ, মার্কণ্ডেয় পুবাণ, ভাগবত, ভবিষ্য পুবাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুবাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণ, বায়ু পুবাণ, বিষ্ণু পুবাণ, ববাহ পুবাণ, বামন পুরাণ, আদিত্য পুবাণ, লিঙ্গ পুবাণ, পদ্ম পুরাণ, অগ্নি পুবাণ, কূর্ম্ম পুবাণ, স্কন্দ পুবাণ ও

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী
স্ফুবৎ প্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূব ভূমির্নব মেঘশব্দাদ্
উদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব॥ ২৪।

কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে ৬৩ টী শ্লোক; তাহার মধ্যে ৪৬ টী শিব-পুরাণের নকল। অন্যান্য সর্গেও এইরূপ নকল করা শ্লোক বহুতর আছে, নমুনা স্বরূপ প্রথম সর্গের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গারড় পুবাণ* এই অষ্টাদশ মহাপুবাণ। ইহাব মধ্যে শিব পুরাণেব উল্লেখ নাই। তবে কেবল শিব পুবাণেব মতে বায়ু পুবাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতেব প‌ৰিবৰ্ত্তে শিব পুবাণ ও দেবীভাগবত মহাপুবাণ †। ইহাকেই বলে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"। সে যাহাহউক কিন্তু পদ্ম পুবাণে ১৯ অধ্যায়ে উপপুবাণ গণনা প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে "শৈব মাদিপুবাণঞ্চ দেবী ভাগবতং তথা" অর্থাৎ শিব পুরাণ, আদিপুবাণ ও দেবী-ভাগবত উপপুবাণের অন্তর্গত। সুতরাং পদ্ম পুবাণ প্রচারেব বহু পরে শিবপুবাণে ঐ শ্লোকটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে ইহা-বেশ বুঝা যাইতেছে। শিবপুবাণ আপনা আপনি বড় হইতে চেষ্টা কবিলেও, আব কেহ বলুক না বলুক আপনাব মহা পুবাণত্ব আপনি ঘোষণা কবিলেও, অপরাপব প্রসিদ্ধ মহাপুবাণেব ক্ষমতায় তাহাকে উপপুরাণের মধ্যে নিবিষ্ট হইতে হইতেছে। উপপুবাণ—সকল, পুবাণ হইতেই সঙ্কলিত ‡ অতএব উপপুবাণ যে পুবাণেব পরজাত তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পুবাণ সকলের মূলপত্তন সাড়ে তিন হাজাব বৎসব পূর্ব্বে হইলেও তাহা বর্ত্তমান আকাবে শ্লোকে বচিত, লিপিবদ্ধ, জনসমাজে আদৃত ও প্রচলিত হইতে যে বহুশতাব্দী অতিবাহিত হইযাছিল এবং এই কালের মধ্যে যে কোন কোন উপপুরাণেব ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। আবাব পুবাণ প্রচাব কালে কোন কোন উপপুবাণের ভিত্তি স্থাপন হইলেও শালিবাহনেব ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীব পবে যে তাহাদিগেব প্রচলন হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পাবে। মনে করুন, আদিপুবাণ ও বৃহন্নাবদীয় পুবাণ প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক উপপুবাণ। তাহাতে লিখিত আছে "কলিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবেন না। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয় কন্যাকে, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, বৈশ্য—বৈশ্যা ও

---

* মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং বচতুবষ্টয়ম্।
আলিংপাগ্নি পুবাণানি কূস্কং গারুড়মেবচ॥ আদিত্যপুবাণ।

† যত্র পূর্ব্বোত্তরখণ্ডে শিবস্য চবিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণংহি
ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্রবিদ্যতে তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং। শিবপুবাণ।

‡ অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে।
বিজানীধ্বং দ্বিজ শ্রেষ্ঠাস্তথা তেভ্যোবিনির্গতম্। মৎসপুরাণ।

শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিতেন * কিন্তু কলি যুগে তাহা পারিবেন না, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্য বৈশ্যাকেই বিবাহ করিবেন।"

কিন্তু কালিদাসেব পরবর্ত্তী শালিবাহনের ষষ্ঠ শতাব্দীর বাণভট্ট নিজকৃত হর্ষচরিতের প্রথমোচ্ছ্বাসে আপনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়া গৌরবের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহাব দুই জন পারশব ভ্রাতা ছিল †। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তৎকালে ঐসকল উপপুরাণের প্রচলন হয় নাই। প্রচলিত হইবাব পব হইতেই অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হইয়া গিযাছে। এবং "দ্বিজানামস-বর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা" "কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ" অর্থাৎ কলিকালের প্রথম ভাগে মহাত্মাপণ্ডিত গণ—এই সকল কার্য্য করিতে ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিষেধ কবিয়াছেন। সাধুদিগের আচাব ও নির্ণীত তত্ত্ব বেদবৎ প্রমাণ। বৃহন্নার-দীয় পুরাণে এইটুকু থাকায় বোধ হইতেছে বৃহন্নাবদীয় পুবাণের প্রচলন কালে কোন ঋষি মুনি বর্ত্তমান ছিলেন না, থাকিলে এত মাথার দিব্য দেওয়াব বা গৌব চন্দ্রিকার প্রয়োজন হইত না। "সময়শ্চাপিসাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ" ঋষি শাসিত আর্য্যগণ জানিত ও মানিত "বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাং স্মৃতিশীলে।" ইত্যাদি পর্য্যালোচনা কবিয়া বলাযাইতে পাবে আদি পুরাণ বৃহন্নারদীয়পুরা-ণেব মত শিব পুরাণও কালিদাসের পবে সঙ্কলিত। অধিকন্তু প্রামাণিকতা দেখিয়া বোধ হয় আদিপুবাণ ও বৃহন্নাবদীয় পুবাণ, অন্য সকল উপপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন। অথচ যখন (উক্ত পুরাণদ্বয়ের) প্রচাবও কালিদাসের পরে, তখন

---

* অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রোভার্য্যা। ভবন্তি তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য দ্বেবৈ-শ্যস্য। বিষ্ণুসংহিতা ২৪শ অ।

† "অভবংশ্চাস্য বয়সা সমানাঃ সুহৃদঃ সহায়াশ্চ তথাচ ভ্রাতরৌ পারশবৌ চন্দ্রসেন মাতৃসেনৌ"। হর্ষচরিত প্রথম উচ্ছ্বাস।

শূদ্রজাতীয় পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান হয় তাহার নাম "পার-শব"।

বিপ্রান্ মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ। স্ত্রিয়াম্।

অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা।

বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ যাজ্ঞবল্কসংহিতা অচাব্যাধ্যায় ৯১।৯২ শ্লোক।

অন্যান্য উপপুরাণের কথা আর স্বতন্ত্র বলিবার আবশ্যকতা নাই। ফলত অপরের গ্রন্থ কাপি করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যায় না, এই টুকু মনে থাকিলেই সকল তর্ক পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে।

এখন পাঠক বুঝিয়া শুঝিয়া আমাদিগের রায়েই রায় দিন, আর কালিদাসের প্রেতাত্মাকে চৌর্য্যাপরাধে জেলে দিবার জন্যই আয়োজন করুন, তাহাতে আমাদিগের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

জানানা উপদেশ মালা।

১। পুরুষ ও স্ত্রী মাত্রেই ভ্রাতা ও ভগ্নী। অতএব স্ত্রী মাত্রেই পুরুষকে ভ্রাতৃভাবে নিরীক্ষণ করিবেন। বিবাহিত দম্পতি অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী ঈশ্বরের চিহ্নিত ভ্রাতা ও ভগ্নী।

২। ভ্রাতা ভগ্নীদের মধ্যে ধর্ম্ম-যোজিত যাবতীয় কার্য্য সুফল প্রসব করে। অতএব ভ্রাতাভগ্নী একত্রিত হইলে ভবের অন্য সমুদায় ভাব ঘুচিয়া যায়; একই পবিত্র মঙ্গলের জ্যোতি উঠিতে থাকে।

৩। ভ্রাতাদের নিকট ভগ্নীদের ঘোমটা দেওয়া পরম পিতার অনুমোদিত নহে। কারণ, ভগ্নীদের চন্দ্রবদন সন্দর্শন না করিয়া ভ্রাতাগণ ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্র স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া অনেক সৎকার্য্য এবং তাঁহার মহদভিপ্রায় সাধনে অকৃতকার্য্য হয়েন। অতএব ঈশ্বর স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, "স্ত্রীগণ তোমরা ঘোম্‌টা খোল"।

৪। যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ তাহাই করিবেন। কারণ, প্রফুল্ল এবং সদানন্দ চিত্তই অপ্রক্ষিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের নিয়োজিত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রাতা ভগ্নীর এবং ভগ্নী ভ্রাতার সরল অন্তঃকরণের যাবতীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন।

৫। স্বাধীনতা পরম পিতার অতি আদরের সামগ্রী, পবিত্র মঙ্গলের আকর-স্বরূপ। পিতার ধন বলিয়া ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বাধীনতার সমান অধি-

কার। অতএব ভগ্নীগণ ভ্রাতাদের ন্যায় জুতা পায়ে দিবেন, গাড়ি চড়িবেন, বাগানে যাবেন এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রেমালাপ করিবেন।

৬। পৌত্তলিকদিগের দেবদেবী মান্য করিবে না ; কারণ, সে সকল পুত্তলিকা ঈশ্বরের চির শত্রু—সয়তানের স্বরূপ। যাহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম যাজন করে তাহারা একান্ত পরিবর্জ্জনীয়। এমন কি পৌত্তলিক ধর্ম্ম বাদী বৃদ্ধ পিতা মাতাও পরিত্যেজ্য।

৭। ভ্রাতাগণের দাড়িই ধর্ম্মের প্রধান পবিত্র চিহ্ন। কারণ, চোপ দাড়িই ভারতে চিরদিন পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী। অতএব দাড়ি-শোভিত দক্ষ অবতার ভ্রাতাই ভগ্নীর একান্ত পূজনীয়।

৮। ভগ্নী ও ভ্রাতাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই, অন্নবিচার নাই, ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের প্রভেদ নাই; সকলই একাকার, নিরাকারের ইচ্ছায় সকলই একাকার।

৯। ঈশ্বরের সংসার উদ্যানে ভ্রমণ করিতে ভ্রাতা ভগ্নীগণ পদে পদে পদ-স্খলিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট পবিত্র মন্দিরে সভাস্থ হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া একবার "একমেবদ্বিতীয়ং" বলিয়া ডাকিলেই যথেষ্ট। অতএব ভগ্নীগণ নির্ভয়ে যদৃচ্ছায় ঈশ্বর মালীর সংসার বাগানে বেড়াইবেন।

১০। ঈশ্বরের মঙ্গলময় সংসারে "তিন আইন মতে বিবাহ" একমাত্র প্রশস্ত পবিত্র বিবাহ। সেই বিবাহের সুলভ-সম্পাদন অনুকূলেই মন্দির ও সভার সৃষ্টি। অতএব ভ্রাতা ভগ্নীগণ সমাজে মিলিত হইয়া শুভদৃষ্টিতে দেখাদেখি করিবেন।

১১। এ বিবাহে ভ্রাতা ভগ্নীতে রূপের আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, গুণ খুঁজি-বেন না, স্বামীভক্তির অভিলাষ করিবেন না, পুত্রলাভের আশা করিবেন না, কেবল দেখিবেন যে ভগ্নী পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র বীজরোপণের ক্ষেত্র কি না।

১২। ভগ্নীগণও একান্ত স্থির নিশ্চয় জানিবেন যে সুদীর্ঘ দাড়ি-বিভূষিত, থান-চেরা বসন উত্তরীয়-শোভিত, চিরুণী-পরিত্যক্ত মস্তক বিশিষ্ট, এবং পবিত্র ধর্ম্মের তৈলহীন গন্ধের আকর স্বরূপ পবিত্র ভ্রাতাই উপযুক্ত স্বামী।

১৩। ভগ্নীদের অপাত্রে দান অতীব নিষিদ্ধ। কর্ম্মক্ষম পিতা মাতা আলস্যে কাল যাপন করিতে থাকিলে তাহাদের উদর পোষণ করা সংসারা-শ্রমীর অন্যায় দান। কর্ম্মফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম প্রচারকদের দেশভ্রমণে

গাড়ি ঘোড়ার বন্দোবস্তের অনুকূলে দানই প্রশস্ত ও প্রধান দান। ইহাই পবিত্র দান ধর্ম্ম।

১৪। যে বিধবা ভগ্নী জগতের মঙ্গলোদ্দেশে পুনরায় বিবাহ করিবেন তিনিই স্বামীর পবিত্র ধর্ম্মপত্নী।

১৫। যে ভগ্নী বিধবা বিবাহের পাত্রী স্থির করিতে সক্ষম হইবেন এবং যিনি তাদৃশ ভগ্নীকে বিরুদ্ধ ধর্ম্মীর গৃহের বাহির করিয়া আনিতে পারিবেন, তিনিই স্বামীর অনুকূল সহধর্ম্মিণী।

১৬। যে ভগ্নী রন্ধনের ভার ভৃত্য-হস্তে, সন্তানের ভার ধাত্রী-হস্তে, এবং রুগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যার ভার হাসপাতালের মেথরের হস্তে সমর্পণ করিয়া কায়-মনোচিত্তে অনবরত কাল আশ্রমের ভ্রাতাগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, তিনিই স্বামীর সাধ্বী ধর্ম্মভাগিনী ভার্য্যা।

১৭। যে ভগ্নী, ব্যঞ্জনাদির পরীক্ষার্থ অগ্রে ভোজন সমাপন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক স্বামীকে পাত্রাবশিষ্ট পরীক্ষা-উত্তীর্ণ উত্তম অন্নব্যঞ্জনে যথাবিধি ভোজন করাইবেন, তিনিই পবিত্র পতিব্রতা ভার্য্যা।

১৮। স্বামীর কল্যাণ সাধন করিতে স্ত্রীলোক মাত্রেই ঈশ্বরের ভগ্নী-প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। যে সংসারে স্ত্রীর পূজা হয় না সে সংসারের শ্রেয় হয় না। অতএব জড়রূপ পুরুষগণ যাহাতে প্রকৃতি দেবী অর্থাৎ ভগ্নীদের শ্রীচরণ পূজা করেন, ভগ্নীরূপা শক্তিরা সর্ব্বদা সেরূপ শক্তি সঞ্চালন করিবেন।

১৯। ভগ্নীরাই ভ্রাতাদের ধর্ম্ম অর্থ কামের একমাত্র সহায়। অতএব ভগ্নীগণ এমত ভাবে ভ্রাতাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, যে তাঁহারা যেন ত্রিবর্গ লাভের আশায় পরিপূর্ণ হয়েন, আশার লহরি যেন তাঁহাদের হৃদয়ে খেলিতে থাকে, এবং মধুর ভাব তাঁহাদের মনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

২০। ভগ্নীগণই ভ্রাতাদের মোক্ষ বিধায়িনী। ভগ্নীগণ স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্ভোগ করিলেই ভ্রাতাদের পরম মোক্ষ।

সংগীত।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

নরনারী দুহেঁ সম অধিকার স্বাধীনতা ধন অতুল।
দিলেন পিতা দয়ার সাগর, হয়ে সবে অনুকূল॥

এসো ভোগ করি, পিতৃদত্তধন, মিলে ভাইভগ্নী কুল।
পিতাব করমে, করো না কো ভয়, সংসার বিপদ সঙ্কুল॥
প্রীতিবসে মজি রহ অহরহ করো না আত্মপর বিচার।
দেখুক জগৎ হইয়ে অবাক্ ফুটিছে চৌদিকে প্রেম ফুল॥
ধরা ছাড়ি জরা পলাইবে দূরে হিংসা দ্বেষ আদি রিপুকুল।
হইবে অচিরে পাপ মর্ত্তলোক স্বরগের সমতুল॥

অপূর্ব্ব মিলন।

(অপরাহ্ন—যমুনাসৈকতে)

প্রেমভক্ত রক্ত রবি ব্যোম চিতাপরে,
রক্ত বস্ত্র পরিধান,
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়ান,
যোগাসনে একমনে প্রেমধ্যান ধরে।
প্রেমদীপ্তি মাখা গায়
পার্শ্বে শক্তি নীলিমায়
বুকে করে যোগী রবি ভাবে ভেসে যায়।
শ্যামাঙ্গিনী এ ধরায়
তরু লতা সমুদায়
হাসে প্রেমানন্দে, ভাসে কনক বিভায়।
তপ্ত স্বর্ণ কান্তি ধার
হৃদে বহে যমুনার,
পূর্ণতীর পুণ্যনীর প্রেমে উথলায়।
এহেন যোগের কালে,
এই সৌন্দর্য্যের জালে
কি জানি কে অনুরাগে বাঁশরী বাজায়।
বাঁশী ডাকে উভরায়
প্রেমময়ী শ্রীরাধায়,

করি সেই ভগবৎ-প্রেম-গীতা গান।
নিষ্কাম রাধার পাশে
শুভ প্রেম দীক্ষা আশে
ছুটে যায় জ্ঞানহারা যমুনা উজান।
নিষ্কাম বাঁশরী স্বর
ভরে বিশ্ব চরাচর,
বিশ্ববর্গ, সপ্তস্বর্গ ধ্যানে মজে যায়।
অণু পরমাণু তায়
প্রেম ভাবে ভরে যায়,
প্রেমে মিলে গড়ে নব সৃষ্টি সমুদায়।
জুড়িয়ে গগনদেশ
অবিরাম, অনিমেষ,
ক্ষিপ্তগ্রহ লিপ্ত সদা কক্ষে ঘুর্ণিবারে
পেয়ে বাঁশী প্রেম ধারা,
দাঁড়ায়ে উন্মাদ পারা,
চায় প্রেম আর্দ্র নেত্রে বিশ্বে বারে বারে।
গ্রহ উপ গ্রহ গায়
বাঁশীস্বর ঠেকে যায়,
তাই ঝরে শূন্য হতে উল্কা অশ্রু ধারা।
মাখি সে সঙ্গীত ধার
উথলায় পারাবার,
উজানে ছুটিয়া আসে উন্মাদের পারা।
বাঁশরীর কলস্বরে
রাধারে পাগল করে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসে যমুনা কিনারে।
যেন স্বর মত্ততায়
বেধে যায় পায় পায়,
নিচল নিথর অঙ্গ চলিবারে নারে।
লট পট কেশপাশ,
কটি হতে খসে বাস,

শরীরে নাহিক শক্তি প্রেমের নেশায়।
ননীর পুতলি হায়,
পড়ে ভূমে মূরছায়,
সৌদামিনী খণ্ড খসে, ধূলায় লুটায়।
নাহি শ্বাস নাহি প্রাণ,
শব হেন অনুমান,
যোগবলে-কৃষ্ণ-প্রেম-দীক্ষা-মন্ত্র-বলে—
সূক্ষ্ম দেহ স্থূল হতে
চলে গিয়ে প্রেম পথে,
অনুরাগে মেশে কৃষ্ণ শ্রীপদকমলে।
আলু থালু সখী সবে,
এভাব না অনুভবে,
ভাবে বুঝি এইবার হারানু রাধায়।
কেহ ছুটে চলে যায়,
যথা আছে শ্যামরায়,
ডুবিতে যমুনা জলে কেহ ছুটে ধায়।
কেহ ফুকারিয়া কাঁদে,
কেহ বলে 'উঠ রাধে!
সহচরি ব্রজনারী কাঁদে গো তোমার'।
রাধায় সিঞ্চিয়ে বারি
বলে কেঁদে কোন নারী,
শুন, রাধে শ্যামচাঁদে বাঁধিব এবার।
দুকথা শুনায়ে দিয়ে,
বাঁশিটি কাড়িয়ে নিয়ে,
যথারীতি দিব শাস্তি এই অপরাধে।
দেখিব কেমনে আর,'
বাঁকা শ্যাম বার বার
বাঁশরীতে ডাকে 'তোমা রাধে রাধে রাধে।"
আহা সেই অন্তর্য্যামী
বিশ্ব-বিশ্বপ্রেম-স্বামী

বুঝিয়া অবস্থা হেন প্রেমিকা রাধার।
বদনে মুচকি হাস,
আসিয়ে রাধার পাশ,
সখি গণে সম্ভাষিয়ে বলে বারবার।
"যদি চাও কিশোরীরে,
কর্ণমূলে ধীরে ধীরে
বল হরি হরি সবে জাগিবে কিশোরী।"
পেয়ে শ্যাম-উপদেশ,
সখি সব ছুটে শেষে,
সমস্বরে রাধা কর্ণে বলে হরি হরি।
পেয়ে রাধা চেতনায়,
কেঁদে বলে 'হায় হায়!
কি করিলে প্রাণসখি হরি হরি বলে।
ধ্যান জ্ঞান প্রাণ মন,
জীবন যৌবন ধন
সঁপে দিয়েছিনু আজি শ্যামপদতলে।
সে সব ফিরায়ে নিতে
বড় ব্যথা বাজে চিতে,
এনে দাও শ্যামচাঁদে প্রাণ কাঁদে মরি!
না আনিলে শ্যামরায়,
ডুবিব এ যমুনায়,
অথবা তমালে দিব ফাঁশ সহচরি।"
উন্মাদ প্রাণের দায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে হায়
যেমন খুলিয়া আঁখি চাহিল কিশোরী,—
দেখে দাঁড়াইয়ে বামে
মোহন ত্রিভঙ্গ ঠামে,
হৃদয়ের ধন তাঁর প্রেমিক শ্রীহরি—
'রাধে রাধে রাধে' বলে বাজায় বাঁশরী।

দেবশর্ম্মা।

শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চর্চ্চা ।
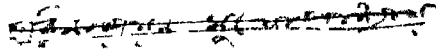
একজন চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, "দেশ-বিশেষের মানচিত্র দেখিলে, এবং সেই দেশের আকৃতি, প্রকৃতি, জলবায়ু, ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির বৃত্তান্ত অবগত হইলে, সে দেশের লোক সমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতি-পরায়ণতার, চিত্রবৃত্তির এবং ধর্ম্মতত্ত্বের অবস্থা ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক রূপে বলিতে পারা যায়।" কোন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিবিড় অভ্যন্তরে চিন্তা সহকারে প্রবেশ করিলে এই মহাবাক্যের সম্পূর্ণ সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং তাদৃশ আলোচনায় ইতিহাস যেরূপ হৃদয়গ্রাহী এবং কৌতুকাবহ, এমত আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষে, অন্তত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সেই সত্য কি পরিমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা একবার দেখা যাক্।

ভারতবর্ষ, সত্যই সংকীর্ণ আকারে সমগ্র ধরা মণ্ডল। কারণ, ভারত কাহারো মুখাপেক্ষী নহে। ইহার আকৃতি ত্রিকোণ বিশিষ্ট, এবং চতুঃসীমা স্বাভাবিক অভেদ্য। ইহার নদ, নদী, অরণ্য, ও পর্ব্বতমালা স্বাস্থ্যের অনুকূল, বায়ু পরিবর্ত্তনশীল, এবং ভূগর্ভ অনন্ত রত্নের আকর। ইহার মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি অসীম, দেবমাতৃক ক্ষেত্র, বর্ষার আশ্রিত শস্য, উদ্ভিজ্জ অতুলনীয় ও অপরিমিত, ফল-সকল পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, এবং ফুল জগত-বিমোহন ও স্নিগ্ধ-কর। ইহার স্বাভাবিক শোভা পূর্ণ-মহিমা-যুক্ত এবং লোচনানন্দপ্রদ ; প্রকৃতির অনুকূলতা পূর্ণাকারে বিরাজমান, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, ষড়ঋতু, ইত্যাদি অবিচলিত ভাবে আজ্ঞাবহ। সৃষ্টিকর্ত্তার লোকভোগানুরাগ-প্রবৃত্তির সচ্ছলতা ভারতেই দেদীপ্যমান, ভগবান্ অনন্ত হস্তে ভারতে ভোগ-সামগ্রী বিতরণ করিয়াছেন, এবং সেই সর্ব্বজীবে-সম-দয়াবান্ একান্ত নিরপেক্ষ বিভু ভারতেই পক্ষপাতের দোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন।

এই ভারত হিন্দুদিগের আদিম অবস্থান নহে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, আশিয়া খণ্ডের মধ্যস্থলে বেলুতাগ্ ও মুসতার্গ পর্ব্বতের পশ্চিমাংশে আমুনদীর উৎপত্তিস্থান সন্নিহিত কোন হিমাবৃত উচ্চতম ভূমিখণ্ডে মনুষ্য জাতির সর্ব্বপ্রথম বসতিস্থান। সেই আদিম মনুষ্যকুলই বেদোক্ত আর্য্য-জাতি। আর্য্যগণ তাঁহাদের সেই আদিম বসতি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক

দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া ভারতে উপবিষ্ট হয়েন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে হিন্দুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই হিন্দুজাতি। পণ্ডিতগণ, আর্য্য ঋষিগণের এবং স্বায়ম্ভুব মনুর ভারতশাসন কাল খৃষ্টজন্মের ৪৪৬৩ বৎসর পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন। প্রজাপত্যাধিকার অর্থাৎ ঋষিদের নিজ শাসনই ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এমতে বলিতে পারা যায় যে, অদ্য হইতে ৬৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভারত-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং তাহারই কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ আনুমানিক ৬৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, আর্য্যগণ ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই ৬৫০০ বৎসরের অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কিয়ৎ কালের মধ্যে হিন্দুর রাজ্য কাল ৫৫৬০ বৎসর, মুসলমানের ৮০০ বৎসর এবং ইংরেজের ১৪০ বৎসর।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে নভোমণ্ডলের যে যে স্থানের যে সকল নক্ষত্রের অবস্থান থাকা মহাভারতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে বেণ্টলি সাহেব গণনা দ্বারা স্থির করেন যে, খৃষ্টজন্মের ১৮২৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ অদ্য হইতে ৩৭১০ বৎসর পূর্ব্বে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল। পূজ্যপাদ দ্বৈপায়ন মহাভারত-রচয়িতা, এবং বেদের সংগ্রহকার ও বিভাগ কর্ত্তা। শেষোক্ত কারণেই তাঁহার পদবী বেদব্যাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার জন্মকাল স্থির করাই সঙ্গত। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, অদ্য হইতে আনুমানিক ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং তাহাই বেদের চরমাবস্থা। বেদের চরমাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বাগ্রে প্রণব ও কতকগুলি বীজের উৎপত্তি হয়, তৎপরে দ্বি অক্ষর শব্দের সৃষ্টি, তৎপরে তাদৃশ শব্দ-নিষ্পন্ন মন্ত্র, এবং তাহার পর গায়ত্রী ছন্দের সৃষ্টি হয়। উহাই বেদ। স্বায়ম্ভুব মনুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনুর সময়ে ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন, অর্থাৎ সেই সময়ে বেদের ব্রাহ্মণভাগ* শ্লোক রচিত হয়। বেদ মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম "শ্রুতি" †। স্বায়ম্ভুব হইতে চাক্ষুষ মনুর কালের ব্যবধান আনুমানিক ১৫০ বৎসর। এমতে বেদের প্রথমাবস্থা আরও পূর্ব্বে,

---

* ব্রাহ্মণ ভাগ শ্লোক নহে, সংহিতা ভাগ শ্লোক। ন, জী, সং।

† শুনে শুনে চলিয়া আসিয়াছিল, অনেকটা সঙ্গত। স্পষ্টকরে বলিতে হইলে গুরুমুখে শুনে শুনেই অভ্যাস করা হইত, বলিয়া উহার নাম শ্রুতি।

অর্থাৎ আর্য্যগণের ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হইবে। আর্য্যেরা ভারতে বেদ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে পারা যায় না, কারণ, তাহা হইলে অন্য আর্য্য-সম্প্রদায়, যাঁহারা ধরা মণ্ডলের অন্যস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত বা বেদের প্রথমাবস্থার একাক্ষর ত্রি অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ সকল কোন না কোন সময়ে বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু তাহা নাই। অতএব আর্য্যগণের ভারতাগমনের পরেই বেদের উৎপত্তি বলিতে হইবে। ভারতই বেদের উৎপত্তি-স্থান। এই বেদের উৎপত্তি ঘটিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সূত্র ধরিয়া সমালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্যগণ ভারতে উপস্থিত হইয়া ভারতের ভোগ-ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য বিমোহিত হইলে স্বতই তাঁহাদের অন্তঃকরণে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব একান্ত অনুভূত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের সরল হৃদয় হইতে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক আনন্দ-লহরি স্তববন্দনাদি আপনা হইতেই উছলিয়া উঠিল। ইহাই বেদ। এবং হিন্দুগণ যে স্বভাবত প্রথম হইতেই নিরতিশয় ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপ্রিয় এবং ধর্ম্মানুগত, দয়াময় ভগবানের এই অপরিমিত সচ্ছলতাই তাহার মূলীভূত কারণ। নচেৎ সীমাশূন্য সাহারা মরুভূমি কিম্বা অনন্ত সাগর বেষ্টিত নবজাত ক্ষুদ্র দ্বীপবাসি মনুষ্যগণ,যাহারা উদর পোষণে অনবরত বিব্রত, বাসার্থ মৃত্তিকা গহ্বরের জন্য বন্য-পশুদের সহিত বিবাদে রত, এবং যাহাদের নয়নের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে ঈশ্বরের নির্ম্মাণ কৌশলের কিম্বা মনুষ্য ভোগ্য পদার্থ মাত্রেরও অভাব, তাঁহাদের হৃদয়ে কি প্রকারে অসীম দয়াবান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রূপ ব্রহ্মানন্দ আপনা হইতেই উদিত হইবে; এবং তাহাদের স্বভাবে কি বলিয়াই বা আপনা হইতে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইবে। যেখানে ভগবান্ প্রকৃতিকে চারু মূর্ত্তিমতী করিয়া সহস্র হস্তে অনন্ত ভোগৈশ্বর্য্য বিতরণ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, সেই খানেই তঁাহারই বিস্তারিত হস্তে মনুষ্য হৃদয়ক্ষেত্রে বপনার্থ ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের বীজ অবস্থান করিতেছে। আর্য্যগণ বিনা পরিশ্রম লব্ধ সেই অসীম ভোগৈশ্বর্য্য মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ও প্রতিভার বলে সেই সকল সম্যক প্রকারে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য অল্পায়াসেই সেই আদিম অবস্থাতেই শিল্পকর্ম্মাদির পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, হিন্দুগণ প্রথমেই শস্যোৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ হলাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বস্ত্র বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং বাসার্থ গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অতীব

পুরাতন বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যেরা সেই প্রথমাবস্থাতে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ঐশ্বরিক আংশিক শক্তি সকলের আরাধনা এবং স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন; অর্থাৎ শস্যোৎপাদন সূত্রে ঐহিক সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই তখনকার ধর্ম্মচর্চ্চা।

আর্য্য প্রজাপতিগণ সর্ব্বাগ্রে পরাক্রান্ত মনুকে, ভারতের অনার্য্য জাতির ক্ষত হইতে রক্ষা হইবার উদ্দেশে "ক্ষত্র" রূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং আপনাদের ব্রাহ্মণ নাম চলিত রাখিয়াছিলেন। হিন্দুদের বর্ণভেদের এই প্রথম সূত্রপাত। তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ মনু যখন দেখিলেন যে, ভারতে অপরিমিত সুলভ সামগ্রীর নৈসর্গিক কারণ প্রভাবে আর্য্যগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবলতা লাভ করিল এবং উন্নতির সোপানে দ্রুত বেগে আরোহণ করিতে লাগিল, তখনই রাজ্যের মঙ্গলার্থ আর্য্যগণের বর্ণবিভাগ, সমাজ সংগঠন এবং আশ্রম নির্দ্দিষ্ট করা অনিবার্য্য বলিয়া তিনি তাহা নিষ্পন্ন করিলেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা, সর্ব্বদা পঞ্জাবের সুরম্য সপ্তনদীর তীরে অমৃতময় বেদের আনন্দময় গানে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণে, বলবিক্রম বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অনার্য্য জাতির দৌরাত্ম্য নিবারণ এবং রাজ্য বিস্তার কার্য্যে, ক্ষত্রিয় বর্ণে, কতক লোককে কৃষিকার্য্যের বহুলবিস্তার, বাণিজ্য বর্দ্ধনে এবং ধনসঞ্চয়ে রাজ্যের বলস্তম্ভ স্বরূপ, বৈশ্যবর্ণে, এবং আশ্রিত ও পরাজিত অনার্য্যগণকে তিনবর্ণের সেবার্থ শূদ্রজাতিতে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।* এবং অভিনব প্রস্ফুটিত মানব হৃদয়োচিত পবিত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে হিন্দুর সমাজ এবং তৎসম্বন্ধে যাবতীয় বৈধ প্রণালী অতি সুন্দরভাবে সংগঠন করিলেন। সেই কালই হিন্দুদের সত্যযুগ। অতএব মনু আর্য্যগণকে বর্ণবিভক্ত করিয়া বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। স্বায়ম্ভুব মনু স্মৃতি রচনা করিয়া মরীচি প্রভৃতি মুনি দিগকে শিক্ষা দেন, তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগুই সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হয়েন, তিনিই মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতা রূপে নিবদ্ধ করিয়া মুনিদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। দক্ষিণদেশবাসি পরশুরাম নামক জনৈক

---

* শূদ্রেরা অনার্য্য কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত একথা বলেন। ন, জী, সং

রাজা মনু-সংহিতা পুস্তকাকারে সঙ্কলন করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে ঐ রাজার একটী অব্দ প্রচলিত আছে, তাহা খ্রীষ্টাব্দের ১১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মান্যবর সর্ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এবং সর্ উইলিয়ম জোন্স্ সাহেব মীমাংসা করেন যে, পুস্তকাকারে মনুসংহিতার বয়ক্রম আজ ৩০৬৫ বৎসর।

কবিকুল কেশরী মহামুনি বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালীন লোক ছিলেন, কারণ বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লবকুশের দ্বারা রামচন্দ্রের সমক্ষে গীত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৩১ পুরুষ বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমুন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। শতবর্ষে চারি পুরুষের জীবনকাল ধরিলে ৩১ পুরুষের জীবনকাল ৭৭৫ বৎসর হয়। কথিত যুদ্ধ আজ হইতে ৩৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এ কথা উপরে বলা গিয়াছে। এমতে বলিতে পারা যায় যে, আজ হইতে ৪৪৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং রামায়ণ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। যাহাহোক্ রামায়ণ মনুসংহিতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ, কারণ মনুতে রামায়ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না, রামায়ণোক্ত শিব ও বিষ্ণু উপাসনার প্রসঙ্গ ও নাই, কিন্তু রামায়ণে মনুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বেদব্যাস চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন †। শ্লোকময় মহাভারত পরবর্ত্তী কালের পরিবর্দ্ধিত কলেবর মাত্র। সেই মহাভারতে মনুসংহিতার উল্লেখ ও রামায়ণের ইতিহাস বর্ণিত আছে। অতএব মহাভারত ও রামায়ণ মনুসংহিতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ। যাহাহোক্ চতুর্ব্বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুদের আদিম কালের গ্রন্থ এবং আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র। এবং জগতের যাবতীয় লোক রাশির সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলস্বরূপ. তবে এখনকার প্রচলিত আকার বিশিষ্ট পুস্তক মূলগ্রন্থ নহে, ইহা অবিবাদে বলিতে পারা যায়।

যাহা হৌক, মনুর সময় হইতে দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অবসান কাল অতিবাহিত করিয়া তৎপরবর্ত্তী আরও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত, ভারত সকল বিষয়েই সম্যক্ প্রকারে তীব্র বেগে উন্নতির পথে, ধাবমান হইয়াছিল। ভারত ধর্ম্ম বিষয়েও সেই সময়ে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত সর্ব্বোচ্চ পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং উন্নতির চরমাবস্থায় পৌঁছিয়াছিল, এস্থলে ইহাই বক্তব্য মাত্র। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন উন্নতি উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই উহা স্থগিত হইয়া পড়ে। প্রবল স্রোতের সেই বদ্ধাবস্থা।

কিন্তু স্থগিতাবস্থা অস্থায়ী। হয়, আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হও, না হয় অবনতির সূত্রপাত হইবে, এবং ক্রমশঃ বিপরীত দিকে স্রোতের গতি ফিরিবে। অতুল ঐশ্বর্য্য এং সুখ সম্পদ যখন অযাচিত ভাবে লোকেব সেবায় নিযুক্ত হইতে লালায়িত হয়, এবং যখন প্রচুর সচ্ছলতাব মধ্যে অবস্থান করিয়া যৎ-সামান্য পরিশ্রমে জীবনের আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ হইতে থাকে, তখনই সেই দেশের লোকরাশি আলস্যপ্রিয় এবং শ্রম-কাতর হইয়া পড়েন। প্রকৃতিব নিবিড় অভ্যন্তরে কি অমূল্য রত্নরাজি অবস্থান করিতেছে, সে রহস্যভেদ করিয়া প্রতিনিয়ত নূতন আবিষ্কারের পরিশ্রম সাধনে পরা-ঙ্মুখ হইয়া পড়েন। কিন্তু শারীরিক অচলাবস্থাব সঙ্গে মনেব অচলাবস্থা সম্ভব নহে। মন নিশ্চিন্ত কিম্বা বদ্ধাবস্থায় থাকিবার সামগ্রী নহে, সর্ব্বদাই কার্য্যপ্রিয় এবং কার্য্যেব প্রতি ধাবমান। শিল্প কিম্বা বিজ্ঞান জগতে মন বিচরণ করিতে না পারিলেই ধর্ম্মপ্রিয় মনুষ্য চিত্ত স্বতই ধর্ম্মজগতে অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণে ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা-পরিপূর্ণ ভারতে হিন্দুদের মন তখন, কিসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, এইচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তার পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই পৃথিবী দুঃখের ও যন্ত্রণার আকরভূমি; দেহ জড়মাত্র এবং অকিঞ্চিৎকর; জড়দেহে আত্মার অবরোধ কেবল শুভাশুভ কর্ম্ম জনিত; কর্ম্ম ভোগাশ্রয়; এবং আত্মার উন্নতি ও মুক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বর চিন্তায় প্রাপ্য। বেদের অবিরোধী সমস্ত দর্শন ও উপনিষদ্ একবাক্যে এই সত্য সংস্থাপন করিল। এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া পড়িলে, হিন্দুরা ক্রমশঃ কার্য্যজগতে অনাস্থা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া উঠি-লেন, এবং সম্যক্ প্রকারে নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন; মনের স্বাভাবিক মহৎ তেজ যখন অন্যান্য সকল বিষয়ে এইরূপে অস্ত-মিত হইল, [illegible] অগত্যা হিন্দুচিত্ত কল্পনা ও সাহিত্যের দিকে ধাবিত হইল। [illegible] সম্মুখে সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত মহিমা পূর্ণ মহান্ গৌরবান্বিত কীর্ত্তি সকল, সাধারণ লোক-হৃদয় কথিত [illegible] দর্শন [illegible] যুক্তিবীজ ধারণে [illegible], কাজেই দার্শনিক [illegible] অবলম্বনে [illegible] পুষ্টি সাধনে অনন্ত কল্পনা ক্ষেত্রের সৃজন করিল [illegible] ফলে আমাদের অসীম সমুদ্র সম পুরাণশাস্ত্র, যোগবাশিষ্ঠের জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে [illegible], এবং গীতার জগদ্বিখ্যাত পুঙ্খানুপুঙ্খ বাক্যাড়ম্বরে যোগ-

ধর্ম্মের অদ্বিতীয় মীমাংসা। আবার কালক্রমে মূল ধর্ম্ম বহুভাগে বিভক্ত এবং শাখা প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইল, হিন্দুগণ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন; এমন কি গণনা করিয়া হিন্দু সংখ্যা সম্প্রদায়ের স্থির করিবার উপায় পর্য্যন্ত থাকিল না। বস্তুতঃ বিংশ কোটী লোকের ধর্ম্মালোচনার জন্য হিমালয় সদৃশ একটী সীমাশূন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থের [illegible] হইয়া পড়িল, এবং বিংশ কোটী লোকের উপাসনার জন্য তেত্রিশ কোটী হিন্দু দেবতা স্থিরীকৃত হইল। আর হিন্দুরা যেন কতই দুর্ব্বৃত্ত! দুরন্ত হিন্দুকে সংসারে যাবতীয় বিষয় হইতে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া পরকাল চিন্তায় এবং পরমার্থ তত্ত্বে নিরতিশয় আবদ্ধ রাখিতে এত নিয়ম এত পদ্ধতি এবং এত শাসনবাক্য অবধারিত হইল যে, আকাশের তারকারাজি কিম্বা সমুদ্র তটের বালুকা কণা বরং একদিন গণনা করা যাইতে পারে, তথাপি এ সকল গণনা করিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতেও এখনো হিন্দুর তৃপ্তি নাই, এখনো প্রতিদিন নূতন নূতন দেবদেবী এবং নূতন নূতন মন্ত্রতন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে।

আদিম কালে হিন্দুর ধর্ম্মভিত্তিতেই হিন্দুর জাতিবিভাগ। সংস্থাপন কালে তাহা যতই মঙ্গল বিধান করিয়া থাকুক, এখন উহা কি ভয়ানক অমঙ্গল ও অনিষ্টের হেতু, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। ধর্ম্মের অনুরোধেই হিন্দু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৈরীভাব। অতএব বলিতেই হইবে যে, হিন্দুর অমৃত ময় ভ্রাতৃস্নেহবিশিষ্ট একজাতিত্ব হিন্দুর ধর্ম্মানুরোধে বিধ্বংসিত। ধর্ম্মের অনুরোধেই হিন্দুর জীবনের অবসান। অন্যদিকে হিন্দুর দেশহিতৈষিতা স্বার্থে পর্য্যবসিত। ধর্ম্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের নিজকল্পিত স্বত্বের অপ্রতিহত প্রভাব রক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে লোকরাশির শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন; অমোঘ ব্রাহ্মণ বাক্যই তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত শাস্ত্র-স্থানীয় করিয়া দিলেন; এবং ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাই তাঁহারা পশুবৎ প্রতিপালন করিবেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। ফলত স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই বিদ্যালাভেও বঞ্চিত হইয়া পড়িল। অতএব আর্য্যগণ ভারতাগমন করিলে আদি কালে যে সনাতন ধর্ম্ম সরস্বতী-তীরে উদিত হইয়াছিল, মধ্যকালে বদরিকাশ্রমে তীব্র তেজ প্রদান করিয়াছিল, অবশেষে নৈমিষারণ্যে স্নিগ্ধকর হইয়াছিল, আজ সেই পবিত্র ধর্ম্ম প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া অস্তমিত হইল। শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস

এবং কুসংস্কার এই অন্ধকারের ফল। দেবানুকূল দেশে ধর্ম্মের পরিণাম এইরূপ।

সর্ব্ব-সুপ্রতুল কারিণী কামধেনু ভারত ভূমি কোন দেশের নিকট কখনই ঋণী এবং কাহারো মুখাপেক্ষিণী নহেন। এই অহঙ্কারে ভারতবাসিগণ চিরদিনই স্ফীত এবং অন্ধ হইয়া আছেন; এবং এই জন্যই পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী দেশ সমূহের সহিত কখন কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। সে সকল দেশাভ্যন্তরে সংসারের যাবতীয় অত্যাবশকীয় বিষয়ে উন্নতির তীব্র বেগের এবং তাহাদের জাতীর ক্ষমতার পরিমাণ যে কত উচ্চ হইতেছিল, তাহার কোন সংবাদই তাঁহারা কখনই লইতেন না। হিন্দুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসিরা বর্ব্বর, বন্য এবং অনার্য্য জাতি. অনন্তকালেও তাহাদের কোন বিষয়েও কোন উন্নতি সম্ভব নহে, অতএব হিন্দুরা তাহাদের প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা ও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাদের কোন আন্দোলনে হিন্দুরা কর্ণপাত করিতেন না। এই কারণে হিন্দুদের নৈসর্গিক ঘটনা-পরিদর্শন-ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সহানুভূতি প্রবৃত্তি সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছিল। ফলত ভারতকেই সমগ্র ধরামণ্ডল কল্পনা করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এই জন্যই ভারতে প্রবাদ যে পৃথিবী ত্রিকোণা। হিন্দুরা ভাবিতেন যে, তাঁহারাই মনুষ্য এবং অপর সকলেই পশু, তাঁহারাই পবিত্র এবং অপর সকলেই অস্পৃশ্য এবং ম্লেচ্ছ, এই কুসংস্কার যখন তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল, তখন পার্শ্বস্থ মুসলমানদের রাজ্য সিন্ধুনদের পরপার হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রকৃত ধরামণ্ডলের অর্দ্ধাংশে, বিস্তীর্ণ হইয়াছে, এবং তাহাদের ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র কেতন সেই সীমাশূন্য ভূভাগে অপ্রতিহত ভাবে উড্ডীয়মান হইয়াছে। এ দিকে আমাদের পুরাণকর্ত্তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ-তত্ত্বজ্ঞ প্রত্যাদিষ্ট ও ভগবদভিপ্রায়-বক্তার অভাব ছিল না। তাঁহারা শাস্ত্রে লিপীবদ্ধ করিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছ-কর-কবলিত হওয়া ভারতের অদৃষ্টলিপী, অখণ্ডনীয়। শাস্ত্রবাক্য অমোঘ। শাস্ত্রে হিন্দুর অন্ধ বিশ্বাস। ফলত হিন্দুরা নিরুৎসাহ, ভগ্নহৃদয়, হইয়া যুদ্ধবৃত্তি পরিচালনে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। গিজনির মামুদ এই কারণে ক্ষত্রিয় গণকে পরাভূত করিলেন। এই কারণে বক্তিয়ার খিলিজি ১৬ জন মাত্র মর্কটাকৃতি তুরুক সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া বিনা কণামাত্র শোণিত পাতে, বঙ্গদেশকে চিরদিনের জন্য ম্লেচ্ছপদ-দলিত করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেন শাস্ত্রের গৌরব রক্ষায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অতএব ভারতের পরাধীনতা ও অধঃপতনের কারণ যিনি যাহাই বলুন, আমরা নির্ভয় চিত্তে অবশ্য বলিব যে, হিন্দু শাস্ত্র এবং শাস্ত্রে অন্ধ বিশ্বাসই এই সর্ব্বনাশের কারণ। অথবা হিন্দুর অসাধারণ প্রতিভা—এবং ধর্ম্মতত্ত্বই হিন্দুর পরম শত্রু।

মুসলমান অধিকারে যবনান্নে, যবন-তরবারে, এবং যবন-দৌরাত্ম্যে অনেক হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইয়াছে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মচর্চ্চা, শাস্ত্রপ্রণয়ন, দেবদেবী-আবিষ্কার এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি—যথা বিধানে চলিয়াছিল ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবদের গ্রন্থাবলি এবং শাক্তদিগের তন্ত্র সকলের অভ্যুদয় এই কালে। বৈষ্ণবদের সম্প্রদায় বিভাগ এই কালে। এবং এই কালেই মুসলমানের সত্যপীর, সত্যনারায়ণ হইয়া এবং ওলাবিবি ওলাইচণ্ডী হইয়া হিন্দুদেবীর শ্রেণীভুক্ত হইযাছেন। লোক মধ্যে বিদ্যার বিমল জ্যোতি তাদৃশ ভাবেই নিরতিশয় অভাব, এদিকে শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস সেই রূপ অপ্রতিহত। পুরাতন গ্রীকদিগেরও অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া যে পরিভ্রমণ করেন, পৃথিবী যে নিরাধার ও গোলাকার এবং আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমান, এসকল কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পুরাণের কুসংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে একান্ত বদ্ধমূল,—অর্থাৎ রাহু, চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া গ্রহণ উৎপাদন করেন, পৃথিবীর অবস্থান বাসুকি-মস্তকে, পৃথিবী ত্রিকোণ বিশিষ্ট, সূর্য্যদেব স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে বিচরণ করেন এবং পর্ব্বত কন্দরে রাত্রে নিদ্রা যান, ইত্যাদি;

তাহার পর ইংরাজের লোক-বিমোহন রাজ্যশাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইলে, হিন্দুর ধর্ম্মজগতে আবার এক নূতন মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। সত্য বটে, ইংরাজ প্রশস্ত হস্তে বিনা বর্ণবিচারে বিদ্যা বিতরণ করিতে থাকিলে, হিন্দুর চির কুসংস্কার-পরিপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন চিন্তার পবিত্র আলোক সঞ্চারিত হইল। সত্য বটে, শূদ্রেরা পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণারোপিত অন্যায় অবরোধ সতেজে ভগ্ন করিয়া হিন্দু শাস্ত্র-সাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাশ্চাত্য বিদ্যাবলে শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ আবিষ্কারে কৃতসংকল্প হইলেন। সত্য বটে, হিন্দু জড়ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাধীন অবস্থায় যতদূর সম্ভব সংসারের যাবতীয় কার্য ক্ষেত্রে চিত্তকে

বিচরণ করিতে নিযুক্ত করিলেন, এবং সত্য, বটে ভারতের ভাবি মঙ্গলাশা ক্ষণপ্রভার ন্যায় লোকের হৃদয়ে সমুদিত হইল;—কিন্তু ইংরাজের ধর্ম্মচর্চ্চার পরিপাটী বন্দোবস্তর লোভটী অনুকরণপ্রিয় হিন্দুরা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের চিরাবদ্ধ ধর্ম্মচর্চ্চার অপ্রতিহত তেজ পুনরুদ্দীপিত হইল, কিন্তু এবার ধর্ম্মচর্চ্চা নববিধানে। অর্থাৎ সমস্তই মৌখিক। সমস্তই ভণ্ডামির বাজভাণ্ডার। মৃত রাজা রামমোহন রায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া কালক্রমে বহুল যত্নে যে প্রশস্ত বৃক্ষটী উৎপাদন করিয়া গিয়াছিলেন, কালে কেশববাবু সেই রাজযত্ন-প্রতিপালিত বৃক্ষে বাইবেলের অনুকরণে সাহেবী ধরণে এক পরগাছা তুলিয়া দেন। পরগাছার নাম "উন্নত", কিন্তু পরগাছে ফল ধরিতে না ধরিতে বাবুর কন্যার বিবাহের ঝড়ে গাছটী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। সেই সময় হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অনুকরণে খোলবাজানো ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হয়। মূলগাছে এবং পরছায় জোড় মিলাইয়া নূতন ধরণের দুইটী কলমের চারা প্রস্তুত হয়। এই চারার চারা তস্য চারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং প্রবল প্রবল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; অনেক নাবালকের দল সেই সকল গাছে চড়িয়া ফল ভক্ষণ করিতেছেন। এদিকে হরিসভার ছড়াছড়ি এতদূর হইয়া উঠিয়াছে যে, সভা স্থাপনের স্থান পর্য্যন্ত পাওয়াই কঠিন। হরিসভার মূলমন্ত্র হরিনাম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" এই মহাবাক্য লোকের বদন হইতে অনর্গল নির্গত হইতেছে। সভার সভ্য ও শ্রোতাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই দাঁড়াইয়াছে যে, যতই কেন পাপ কর না, একবার হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম করিলেই সকল পাপ কাটিয়া যায়। থিয়েটরওয়ালাদেরও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবারও কসুর নাই, খেমটারনাচের সঙ্গে হরিনামের ঢেউ তুলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে মাতাইয়া তুলিতেছেন এবং সুন্দরী বেশ্যাদের কৃষ্ণচৈতন্য সাজাইয়া ভগবানের প্রকৃত রূপরাশি দেখাইয়া লোকের মনকে ধর্ম্মের দিকে টানিতেছেন। নাটক রচয়িতারা হরিগুণানুবাদ ভিন্ন আর নাটক লেখেন না। নাটকের সমস্ত রসকস্ এক হরিনামে। গিরীশ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুর নাটকই এখন হিন্দুশাস্ত্র। অপর দিকে সংবাদপত্র চিরদিনের স্থাপিত ব্রত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে মতি দিয়াছেন। সাময়িক পত্রে ধর্ম্মচর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা ভিন্ন অন্য প্রবন্ধ প্রায় দেখা যায় না। মাথামুণ্ড ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক অর্থ আবিষ্কার, রূপকচ্ছেদ এবং রহস্যভেদ প্রকা-

দের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন নূতন ধর্ম্মপত্রিকা নিত্য নিত্য প্রকাশ হইতেছে। আর এক দিকে একদল যোগী বড়ই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছেন। ঘাটে মাঠে, পথে প্রান্তরে পরিষ্কার পরিধেয়োত্তরীয়-সুশোভিত সেই যোগীবর সকল। রেলের গাড়িতে, ট্রাম্‌কারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যোগীরা আসন করিয়া বসিয়াছেন, এবং চাদর চাপা দিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। ইঁহারা মৃগচর্ম্ম মহার্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্লীহা, যকৃৎ, বহুমূত্র, অর্শ প্রভৃতি রোগের যোগী, আর অনেকেই সুরাদেবী প্রসাদাৎ। যে শূদ্র দৈবাৎ একটী 'ওঁ' বলিলে আপনাকে মহাপাপী জ্ঞানে মনস্তাপে মরিতেন, আজ তাঁর ইড়া ও পিঙ্গলা আর জড়াজড়ি করিয়া থাকে না, এবং তাঁহার উদর মধ্যে প্রণব অনবরত মেঘবৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। এই যোগীদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, জগত সমস্তই অনিত্য, দেহ কিছুই কিছু নহে, আমার কিছুই নহে, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার একগাছি তৃণ গ্রহণ কর অমনি তিনি খড়্গহস্ত। কেহ তত্ত্বমসির দোহাই দিয়া কখন কখন স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া বসিতেছেন। গোয়ালার ছেলে 'চ্যাঁ চোঁ' ছাড়িয়া যোগ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যোগশিক্ষা দিতেছেন। কর্ম্মকার ভায়া একলক্ষ টাকা পাইলে সূর্য্যমণ্ডলস্থ বৈরাজ পুরুষকে দেখাইয়া দিতে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রতিশ্রুত। কাশীর জনৈক স্ত্রীপুত্রওয়ালা বাবুযোগী পঞ্চ মুদ্রা এন্‌টারেনস্‌ ফি লইয়া যাহাকে তাহাকে এক কথায় যোগী করিয়া দিতেছেন, এবং শিষ্যের চক্ষু অবরোধ করিয়া পরম জ্যোতি দেখাইয়া দিতেছেন। কোন কোন নব্য যোগীর ক্ষমতা এত দূর হইয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের সহিত চক্ষে চক্ষে কিছুক্ষণ চাওয়াচায়ি করিয়া বন্ধ্যার ক্রোড়ে সন্তান সমর্পণ করিতেছেন। ইঁহাদের এক প্রস্থ ঔষধ আছে; শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহা সকল রোগেই খাটে, কিন্তু যোগী দেহ ভিন্ন অন্য দেহে খাটে না। ডাক্তার বাবু বিলাতি ঔষধের দ্বারা কোন যোগীবরের গঙ্গাযাত্রা বন্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কার যে, কোন ভ্রাতৃযোগীর প্রদত্ত জলপানে তিনি রোগ মুক্ত। এই যোগীরা হিন্দুশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ কদাপি গ্রহণ করেন না। গ্রন্থ যাহাই হোক্, যাবতীয় গ্রন্থের যাবতীয় ব্যক্তিগণের নামের আধ্যাত্মিক অর্থ আছেই আছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার। অক্ষয় বাবুর গ্রাবু খেলার আধ্যাত্মিক অর্থের ন্যায়, ইঁহারা সমস্ত মহাভারত খানার মায় ঐতিহাসিক

নাম সকলের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিয়াছেন। এই দলের কোন মহা যোগী সম্প্রতি মনুসংহিতার একখানি আধ্যাত্মিক অর্থের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। মনুতে ব্রহ্মাবর্ত্তের ও আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বর্ণন, টীকাকার কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথি যে অর্থে ভারতের যে স্থানকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আজ তাহা ভ্রম হইয়া পড়িয়াছে, ইনি বলিয়াছেন, উহা যোগীদের অমুক অমুক স্থান মাত্র, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্থ। মহাভারত রামায়ণের সঙ্গে বোধ হয় এবার মনুও যান। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, শাস্ত্র আলোচনার গোলযোগটা এবার কিছু গুরুতর। সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন, এ স্রোতের পরিণাম কোথায়? তবে আমাদের ভয়, না জানি ভারতবর্ষের অদৃষ্টে শাস্ত্রে আরো কি বিষম বিভ্রাট সঞ্চিত আছে।

ভগ্ন-প্রণয়।

নিশীথে নীরব ঘোরে স্বপনে নিরখি তোরে,
জাগিল পূর্ব্বের স্মৃতি হৃদয়ে আবার!
পুন তপ্ত অশ্রুবিন্দু মথিয়া বিষাদ সিন্ধু
বিশুষ্ক নয়ন সিক্ত করে অনিবার॥

সেই দিন সেই দেখা মুছাই বিষাদ রেখা
দেখামাত্র একবার দেখিলাম চোখে!
বিরহ শয্যায় শুয়ে মাটীতে মাথাটী থুয়ে
ভাবিয়া সেদিন আজ ভাসিতেছি শোকে!

সেই হাসি ফুল্ল মুখে বিজলী খেলিয়ে সুখে
ফুটাইলে হৃদে মোর ভাল বাসা-ফুল!
না মিটিতে মন সাধ ভাঙ্গিলে প্রেমের বাঁধ
চলে গেলে তুমি মোরে করিয়া আকুল!!

সেফুল্ল কমল মুখ স্মরিলে বিদরে বুক
হরিণ নয়নে সেই প্রেমের চাহনি !!
সেই যেতে যেতে ধীরে কত যে কহিলে ফিরে
ভাবিতে এখন তাহা হৃদে দংশে ফণি।
বিস্তৃত বকুল তলে সেই বসে কুতূহলে।
দাঁড়ায়ে সঙ্গিনী কাছে হাসি মাখা মুখে।
শাখী গায় পাখী গুলি সুস্বর লহরী তুলি !
তরুরে ব্রততী বাঁধে আলিঙ্গনে বুকে !!
মৃদুল অনিলে ধীরে ফুটে কলি তরু শিরে,
মধুলোভে চারিদিকে মধুকরগুঞ্জে।
হেরি অবসান বেলা সাঙ্গ দিনেশের খেলা
কুমুদ ভাতিল নীরে তাই পুঞ্জে পুঞ্জে।।
নলিন মলিন মুখে মদিল নয়ন দুখে।
সুদুর গগণে চাঁদ চাহে উঁকি দিয়ে।।
বলে—"আর কি ভাবনা ? প্রেমে কোথা প্রবঞ্চনা ?
পেয়েছি তোমারে এবে কুমুদিনী প্রিয়ে।
"যাও ভানু অস্তে যাও নলিনীর মাথা খাও।
সারা নিশি বাস মম নীরদের কোলে !
বৃথা কেন কর রোষ সময়ে সবারি তোষ !
প্রভাতে আমিও পড়ি এইরূপ গোলে !!"
বিদ্রূপে দিনেশ হায় ক্রোধে আরক্তিম কায় !
রক্ত-বৃষ্টি হল যেন নেত্র দিয়ে তাঁর,
কচিপাতা সাদা সিধে সে জ্যোতি ধরিল হৃদে
সরল প্রাণের এক অদ্ভুত ব্যাপার !!
সে জ্যোতি ও মুখে প্রিয়ে হেরি তৃপ্ত হল হিয়ে,
ভাবিলাম মনে হয়ে হরষে বিভোর !
বৈজয়ন্ত মনো লোভা মন্দার কুসুম শোভা
এর চেয়ে সুষমায় নহেত সুন্দর !!
উত্তপ্ত কাঞ্চন সম তনুরুচি মনোরম !
শিল্পীর নৈপুণ্য তায় কতই প্রকাশ !

পদ্মের পরাগ ছানি বিরলে বদন খানি!
গড়েছে চতুর বিধি লয়ে অবকাশ!
কি আর বলিব প্রিয়ে যার হৃদি বিদারিয়ে!
সহস্র বৃশ্চিক তার দংশে অনিবার।
বিস্তৃত নিরাশা মরু নাহি রে আশ্রয় তরু!
বিরহ তপন তাপে তপ্ত চারিধার।
শুষ্ককণ্ঠ এ পথিক নাহি জ্ঞান দিগ্বিদিক!
শ্রান্ত পিপাসিত সেই মরু মাঝে চলে।
প্রেম পুণ্য পয়োধির বিশুদ্ধ সুশীত নীর!
ভ্রান্তিতে পড়েছে তবু মরীচিকা-ছলে!!
নিরখি বদন তোর কিদশা ঘটেছে মোর!
নাহি দিতে পরিচয়, না মিটিতে সাধ!
তৃষিত আমারে যেলে সচ্ছন্দে চলিয়া গেলে।
আমারি ঘটিল সাধে বিষম বিষাদ!!
অ রে ভালবাসা তোর একি যে বিষম জোর!
তোর গুণে হয় কত অসাধ্য সাধন।
পাষাণে তরঙ্গ ছোটে শুষ্কগাছে ফুল ফোটে,
নীরস জীবনে হয় প্রেমের সিঞ্চন।
তাইত তাহারে দেখে গিয়েছি বিষম ঠেকে,
দুর্ব্বল মানস মোর হয়েছে পাগল।
হেরিয়ে নশ্বর রূপ মুগ্ধ-মন এইরূপ!
রূপ-সাগরের একি সামান্য হিল্লোল!!
এই যে চাঁদের হাসি সুগন্ধ কুসুম রাশি,
বিচিত্র বিনানে শোভা-জলধর দল!
পল্লবিত তরু চয় মলয় অনিল বয়,
তর তর করে যত তটিনীর জল!!
নলিনী ফুটিছে নীরে উড়িছে মধুপ ধীরে!
ফুল্ল কুমুদিনী ঘুমে মুদিতেছে আঁখি!
তরুণ অরুণ উঠে আঁধার পলায় ছুটে;
বিহঙ্গের কলকণ্ঠে আরাবিত শাখী!

শিশু জননীরে পেয়ে যেতেছে কোলেতে ধেয়ে,
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে পুন ডাকে "মামা" বলে!
সে স্বর শুনিয়া কাণে পাগল জননী প্রাণে!
দেহ ছাড়ি শোক তাঁর যায় দূরে চলে!
ওই যে রমণী মুখ যা দেখি ভুলিল দুখ,
এসব সৌন্দর্য্য হায় যাঁহার সৃজন!
রূপের সাগর তিনি যোগীন্দ্র মানস-মণি,
সে মোহনরূপে এবে মুগ্ধ হও মন!!
ফের ভালবাসা স্রোত ভেঙ্গে ভেল অবরোধ,
নশ্বর পার্থিব রূপে চল ত্যজি যাই,
হেরি গে বিশ্বের ভূপ অনন্ত যাঁহার রূপ।
সে রূপসাগরে গিয়ে এরূপ মিশাই!
ছাড় মন ছাড় ভ্রান্তি পাইবে অপূর্ব্ব শান্তি,
এ তটিনী ধরে চল সাগর সঙ্গমে!
পাবে পূর্ণ ভালবাসা মিটিবে প্রণয় আশা,
এ ভগ্নপ্রণয়ে আর মরিবে না মরমে॥

আখিরা-গ্রাম
রামপুর হাট-পোষ্ট।

শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
আখিরা-গ্রাম

ভারতে দাস ব্যবসায়ের ইতিহাস।

ইতিহাস পাঠকেরা ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের কথা অনেক পাঠ করিয়াছেন, অনেক জানেন। কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে যে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, ও এখনও পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, আসামে এবং ভারতের অপর কোন কোন স্থানে এককপ ভাবে প্রচলিত আছে, অনেকে তাহা জ্ঞাত নহেন। ভারতে কিরূপ ভাবে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, ও ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের সহিত ভারতের দাস ব্যবসায়ের প্রভেদ কি, এই প্রবন্ধে তাহার কিছু পরিচয় দিব।

ইংলণ্ডে উইলবরফোস যে সময় তথাকার দাস ব্যবসায় লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, সেই সময় ভারতের দাস ব্যবসায়ের কথা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদিগের প্রথম কর্ণগোচর হয়; ডিরেক্টরদিগের মধ্যে অনেক উইলবরফোস, ক্লার্কগণ, বাক্সটন প্রভৃতি দাসত্ব উচ্ছেদকারীদিগের বন্ধুও ছিলেন, কিন্তু সে সময় কোম্পানি একে আপন ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে এদেশ সম্বন্ধে তখন তাঁহাদিগের জ্ঞান অতি অল্পছিল, এই সকল কারণে তখন এসম্বন্ধে বিশেষ কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ হয় নাই। ১৮৩২ সালে কোম্পানি ভারতে বাণিজ্যের এবং ভারত শাসনের নিমিত্ত যে, নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন, (Charter Act of 1832) তাহাতে এই দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে ও যাহাতে শীঘ্র বিনা গোল যোগে এই নিষ্ঠুর ব্যাপার রহিত করা হয়, তজ্জন্যও উপদেশ প্রদত্ত হয়। পরে এই সম্বন্ধে ডিরেক্টরদিগের সহিত কোম্পানির (ভারত গবর্ণমেণ্টের) আরো লেখা লেখি চলে।

এই সকলের ফলে ১৮৩৫ সালের ১৫ই জুন ল কমিসন নামে কমিসন বসে, তৎকালিক গবর্ণমেণ্টের আইন প্রণেতা মেকলে সাহেব এই কমিসনের সভাপতি হইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা, বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং সিংহলের বিচার বিভাগের বিজ্ঞ সিবিলিয়ানগণ ইহার সভ্যের কাজ করেন। ভারতে ফৌজদারী আইন (Indian Penal Code) লিপিবদ্ধ হইবার এই প্রথম সূত্রপাত। এই কমিসনে এদেশীয় দাস ব্যবসায় ও দাসদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিঠি পত্র কমিসনের সভ্যদিগের হস্ত গত

হয়, সেই সকল চিঠিপত্রের দ্বারা এদেশীয় দাসদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ কমিসনবের গোচর হয়, তাহা পাঠ করিয়া কমিসনের সভ্যেরা এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া স্বতন্ত্র আইনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সকল চিঠিপত্রেব লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রাহ্য ন' কবিয়া, আর স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের অনুমোদন কবেন নাই।

পবে এই সম্বন্ধে এক রিপোর্টেব নিমিত্ত ১৮৩৯ সালের কমিসন উদ্যোগী হন, ১৮৪১ সালেব ১৩ই জানুয়ারি এক প্রকাণ্ড পুস্তকাকাবে এই রিপোর্ট বাহিব হয়। এই বিপোর্টে সমগ্র ভারতেব জজ, মাজিষ্ট্রেট ও পলিটিকাল কর্ম্ম-চারীদেব সাক্ষ্য, মতামত, সবকাবী, বেসবকাবী লোকের সাক্ষ্য, দাস ব্যব-সায়ী সাক্ষ্য ও অনেক দাসেব সাক্ষ্যেব উপব নির্ভর করিয়া লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে এ দেশেব প্রত্যেক বিভাগেব সবিশেষ বিবরণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাসন কালে দাস ব্যবসায়েব বৃত্তান্ত ও আবো আরো অনেক প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।

সে সময় সমগ্র ভাবতে কত ক্রীত দাস ছিল, যদিও তাহার ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, তথাপি যেরূপ হিসাব দেখা যায়, তাহাতে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইংবেজদিগের উপনিবেশ সমূহে যত দাস ছিল তাহার অপেক্ষা ভারতের দাস সংখ্যা যে অধিক ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পাবা যায়। কমিসনের গড় হিসাবে আশী হইতে নব্বই লক্ষেব ভিতর বোধ হয়। ১৮৩৪ সালের ১ লা আগষ্ট ইংরেজেবা আপন দেশে ও উপনিবেশ সমূহে যে দাসদিগকে মুক্ত কবিয়া দেন, তাহাব সংখ্যা আট হইতে দশ লক্ষের ভিতর, এবং ১৮৬০ সালে আমেবিকায় যে সকল ক্রীতদাস স্বাধীনতা লাভ করে, তাহাব মোট সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ, সুতবাং উভয় দেশে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক নয়, কিন্তু একা ভারতে আন্দাজী হিসাবে তাহা অপেক্ষাও ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ অধিক; হিসাবটা পাকা হইলে আবো কিছু বাড়া অসম্ভব নয়। এক বাঙ্গালায়, যদিও সমুদায় সংখ্যাব ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, তথাপি এক অষ্টমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এমন কি কোন কোন জেলায় অর্দ্ধেক লোকও এই শ্রেণীস্থ বলিয়া হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় যে আটচল্লিশটি জেলার হিসাব লওয়া হইয়াছিল, তাহাব সকল গুলিই এইরূপ সংখ্যায় একটা না একটার অন্তর্গত। ১৮৩৯।৪০ সালে এই হিসাব গ্রহণ কবা হয়। তখন বাঙ্গালায় এখন কার মত

অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সকল ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যেই এইরূপ দাস রাখা প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত জমিদারেই দুই শত, আড়াই শত, তিন শত বা আরো অধিক সংখ্যা দাস রাখিত, এই শ্রেণীস্থ পরিবার মধ্যে কাহারও কাহারও প্রত্যেকের জন্য এক হইতে কুড়ি জন পর্য্যন্ত দাস নিযুক্ত থাকিত। এস্থলে মনে রাখা উচিত, এখনকার ন্যায় তখনকার জমিদারদিগের এত ভগ্ন দশা উপস্থিত হয় নাই।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে অনেক জমিদার এক এক রাজার ন্যায় ক্ষমতার সহিত জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। তখনকার অনেক জমিদার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এখন হায়দ্রাবাদের নিজাম, ভূপালের বেগম, গোয়ালিয়োর ও ইন্দোরাধিপতিরও ইংরাজানুগ্রহে সে ক্ষমতা নাই। বাঙ্গলায় প্রায় সকল জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত এই সকল দাস সংগ্রহ করিতেন। এই সকল কৃষিজীবী জমিদারদিগের মধ্যে কোন কোন জমিদার কৃষিকার্য্যের জন্য দুই সহস্র করিয়া দাস প্রতিপালন করিতেন, এইরূপ জমিদার সংখ্যাও প্রায় আড়াই শত ছিল। এক্ষণে বাঙ্গলায় যে সকল ইতর জাতীয় কৃষিজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের অনেকের পূর্ব্বপুরুষ এই দাস শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালার সহিত উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতের দাসদিগের এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার ভদ্রলোকেরা যেমন প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত দাস সংগ্রহ করিত, তথাকার ভদ্রলোকেরা ইহার পরিবর্ত্তে গৃহকর্ম্মের নিমিত্ত দাস প্রতিপালন করিত। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই চাষবাসের জন্য দাস ক্রয় করিত। আর বাঙ্গালার সহিত আরও প্রভেদ এই, এখানে যেমন তৎকালে ভদ্রলোক মাত্রেই অল্প বিস্তর দাস ক্রয় করিত, ও সকল স্থানে তাহার পরিবর্ত্তে কেবল বড় বড় সহরের লোকেই দাস রাখিত।

ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাসদিগের সহিত এদেশের দাসদিগের এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় যেমন কেবল কাফ্রী এবং আদিম আমেরিকানদের ধরিয়া আনিয়া জোর করিয়া দাস করা হইত, ও তাহার একটা রীতি মত ব্যবসা চলিত, এ দেশে ঠিক সেরূপ ভাবে দাস ব্যবসায় চলিত না। অনেক স্থলেই দাসেরা আপন প্রয়োজন বশতঃ বা পুরুষানুক্রমিক

চলিত নিয়মানুসারে অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দাসখৎ লিখিত। তবে একবারে যে চুরি করিয়া ধরিয়া আনয়ন ব্যাপার ছিল না, তাহা নহে, তবে ইহার তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি যৎসামান্য। আমরা এ স্থলে দাসদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া একটা তালিকা প্রদান করিলাম, ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, এ দেশে কয় শ্রেণীর দাস ছিল, ও কোন শ্রেণী কোন সূত্রে দাসত্বে আবদ্ধ হইত।

১ম শ্রেণী। দুর্ভিক্ষ বা অপর কোন প্রকার কষ্টে পড়িয়া পিতামাতা অর্থের অনাটনে আপন সন্তানকে কিছু অর্থ লইয়া প্রদান করিত, যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিত, সে চিরকাল তাহারই অনুগত হইয়া চলিত, ও তাহার সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইত।

২য়। বেহার অঞ্চলে মাতা বা মাতৃপক্ষ কর্ত্তৃক সন্তান বিক্রয় হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাও যে প্রতিপালনে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

৩য়। স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী বিক্রয়। সচরাচর নীচ জাতীয় লোকের স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে বা বিবাদ বিসম্বাদ হইলে এই কাজ করিত। এখনও বিলাতের ছোট লোকেরা মদের জন্য স্ত্রী বিক্রয় ও বন্ধক দিয়া থাকে।

৪র্থ। কুমাউণ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে পরিবারস্থ বিধবা স্ত্রীলোক দিগকে প্রতিপালনে অক্ষম হইলে তাহার পুত্র বা যাহার উপর তাহার প্রতি-পালনের ভার পড়িত, সে তাহাকে বিক্রয় করিত।

৫ম। দুর্ভিক্ষ কালে বা অর্থের প্রয়োজন হইলে অনেক লোক আপ-নাকে আপনি বিক্রয় করিত। ইহারা সুবিধা হইলে বিক্রয়ের মূল্য ফেরত দিয়া খালাস হইত। ইহা এক প্রকার আপনাকে বন্ধক দেওয়ার ন্যায় ছিল, ইহার লেখা পড়া ও বসিদ থাকিত। এই প্রকার দাসই যে কষ্টে পড়িয়া সেচ্ছা-ক্রমে দাসত্ব স্বীকার করিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইংরেজদিগের দেশস্থ দাসের সহিত এই দাসদিগের কোন সংশ্রব নাই, তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রথা এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। এই পাঁচ প্রকার ছাড়া কমিসন আর পাঁচ প্রকার দাসের এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন।

১ম। অপরাধী দাস। কোন কোন রাজা অপরাধী বিশেষকে দাস শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লইতেন, ইহা দিগকে পুরুষাণুক্রমে রাজ অধীনে কাজ করিতে হইত।

২ য়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বহুকাল প্রচলিত একপ্রকার দাস ছিল, এই দাসগণ ভারতের আদিম অধিবাসীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা বিজিত হইয়া অবধি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ইহারাই বোধ হয় ভারতের আদিম দাস জাতি। শেষে, ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে।

৩ য়। বিবাহাদি সূত্রে দাসত্বে বদ্ধ। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক বা পুরুষ বিবাহ সূত্রে বা প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া দাসের সহিত সহবাস করিত; সেই সহবাস জনিত সন্তানেরা প্রভুর অন্নে পালিত হইয়া তাহার দাস শ্রেণী মধ্যে গণিত হইত।

৪ র্থ। পূর্ব্বে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে আরব বণিকেরা বালক বালিকা ও যুবা দাস আমদানী করিত। কলিকাতা এই শ্রেণীর দাস বিক্রয়ের এক সময় আড্ডা ছিল। ইহাদের পুরুষদিগকে প্রায় খোজা করিয়া আনা হইত, ও সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান, নবাব ও দিল্লীর সম্রাটের নিকট ইহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। এই দাসদিগের বিষয় অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন। ইহাদিগকে হাবসী গোলাম ও স্ত্রীলোক দিগকে বাঁদী বলিয়া ডাকা হয়। ইহারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সাহসী বলিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকেরা জানিতে পারেন, এই হাবসী গোলামগণ কেহ কেহ ক্ষমতাপন্ন হইয়া বাঙ্গালার সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিল। বোধ হয়ত, এই শ্রেণীর দাসদিগের মধ্যে অনেককে চুরি করিয়া আনা হইত।

এই চারি শ্রেণী ভিন্ন আর এক শ্রেণীর কথা উল্লেখে, ল কমিসন তাহাদিগকেও দাস শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে যদিও চুরি করিয়া আনা হইত, কিন্তু ইহাদিগকে দাস শ্রেণীর অন্তর্গত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বালিকা চুরি করিয়া আনিয়া সহরের অসৎসম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগকে বা যাহারা নৃত্য গীতের ব্যবসা করে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। ইহা এখনও ভারতের সকল স্থানে অল্প বিস্তর চলিত আছে ও এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ধরা পড়িলে এখন ছেলে ধরা (Kidnapper) বলিয়া সাজা পাইয়া থাকে। এরূপ মোকদ্দমার সংখ্যাও বড় কম নয়। ইহা ছাড়া পূর্ব্বে ঠগেরা ছেলে চুরি করিয়া দলভুক্ত করিত, কিন্তু তাহারা বিক্রয়ের ব্যবসা করিত না। ঠগেরা অনেকে একটি বালকের জন্য এক একটা পরিবার নষ্ট করিয়া

খেলিত। তবে অনেকে ঠগীদের বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ব্যবসা চালাইত। এই সকল বালকেরা বড় হইয়া ঠগী ব্যবসা আরম্ভ করিত, কিন্তু ইহাদিগকেও ঠিক দাস শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে আমরা আসল কথা বলিব। ইংরেজদিগের দাস ব্যবসায় উঠাইবার মূল কারণ, দাস প্রভুরা তাহাদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত বলিয়া। আর আজ কাল আসামের কুলী লইয়া যে এত আন্দোলন চলিতেছে, তাহারও মূল কারণ এই অত্যাচার, নহিলে কেবল লোক ঠকাইয়া আনিয়া কুলি দলে প্রবিষ্ট করাইলে, আজ কখন এত আন্দোলনের রব উঠিত না, ও এই অত্যাচার না থাকিলে আজ ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দাস ব্যবসায়ও অটুট থাকিত। এক্ষণে ভারতীয় দাসদিগের প্রতি তাহাদিগের প্রভুরা কিরূপ ব্যবহার করিত একবার দেখা যাউক। এ দেশীয় ক্রীতদাসদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ল কমিসন স্থানীয় জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীদিগের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ন্যায় এ দেশের প্রভুরা আপন দাসদিগের প্রতি (অতি নিষ্ঠুর লোক ছাড়া) কখন কোন প্রকার অত্যাচার করিত না। আর অত্যাচারী নিষ্ঠুর প্রভুর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত এ দেশের প্রভুদের এই প্রভেদ ছিল, তাহারা ব্যবসার জন্য দাস সংগ্রহ করিত, ক্রীত দাসেরা তাহাদের পণ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত, আর এ দেশের প্রভুরা সকলেই আপন প্রয়োজনের নিমিত্ত দাস রক্ষা করিত। তদ্ভিন্ন ইংরাজ ও এ দেশীয় সমাজের মধ্যে রীতি নীতির এমন একটা পার্থক্য আছে, যাহাতে সেই রীতি নীতির বশবর্ত্তী হইয়ায় একজন এ দেশের লোক অত্যন্ত নির্দ্দয় পাষণ্ড হইলেও একজন ওই দলের ইংরাজের তুলনায় তাহার অন্তর নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইবে। অপেক্ষাকৃত আর শুদ্ধ ভারত বাসী কেন এসিয়া বাসীগণ যে তাহাদের দাসদিগের প্রতি ইংরাজ এবং আমেরিকানদের অপেক্ষা চিরকাল অধিকতর সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, ইংরাজদিগের মুখেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ল কমিসনের রিপোর্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশীয় দাসদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুরা তাহাদের বেতন ভোগী ভৃত্যদিগের ন্যায় সম ব্যবহার করিত এবং অনেক স্থলেই ইহারা প্রভুদিগের নিকট বেতন ভোগীদিগের অপেক্ষা সদ্ব্যবহার পাইত, কমিসন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এই

সকল দাসেরা প্রভুদিগের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইত ও ব্যামোহ ব্যাবামে চিকিৎসিত হইত; এ সম্বন্ধে প্রভুদিগেব তাচ্ছল্যেব কথা কমিসনেব রিপোর্টে উল্লেখ নাই ববং ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে ইতব জাতীব গবিব লোক বেতন ভোগী দাসদিগের অপেক্ষা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবাব নিমিত্ত, বিবাহেব ব্যয় এড়াই বার নিমিত্ত, এবং বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অন্নেব সংস্থানের নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দাসত্বে আপনাকে বাঁধা দিত বা বিক্রয় কবিত। কাবণ দাসপ্রভুবা সমস্ত জীবন খাটাইয়া অকর্ম্মণ্য ও বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদেব অন্নেব একটা সংস্থান না কবিয়া, কখন তাহাদেব তাড়াইয়া দিত না, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বৃদ্ধ দাসেব একটা অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইত, নতুবা সমাজে তাহার বড় নিন্দা হইত, এখনকাব মত তখন সমাজেব নিন্দাব ভয়কে কেহ অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইত না। আব এক কথা, এই সকল দাস দিগকে বিক্রয় কবিবার, ভাডা দিবাব বা হস্তান্তব কবিবাব ক্ষমতা তাহাদেব প্রভুদের হস্তে থাকিলেও সহসা তাহাদিগকে কেহ বিক্রয় কবিত না, করিলে বড নিন্দা হইত; ববং অবস্থা হীন হইলে অনেকে দাসদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন করিয়া দিত তথাপি লোক নিন্দাব ভয়ে বিক্রয় কবিত না। আব ইহাদিগেব প্রতি যে বড় একটা নিষ্ঠুব ব্যবহাব হইত না, তাহাব আব একটা প্রমাণ এই, এই সকল দাসেবা কোন প্রকাবে যদি কিছু উপার্জ্জন কবিত, তাহা হইলে হিসাব মত সেই উপার্জ্জিত অর্থ তাহাব প্রভুর হইত, কিন্তু কমিসনেব রিপোর্টে দেখা যায়, প্রভুদেব প্রায় কেহই এই অর্থ গ্রহণ কবিতেন না, ইহা তাহাদিগের থাকিত। আব দাসদিগেব প্রতি অত্যাচাব করিলে তাহাব প্রতি রাজদণ্ডেরও বিবিধ ব্যবস্থা ছিল। মোটের উপব এ দেশীয় ক্রীতদাসদিগের অবস্থা ইংলণ্ড ও আমেরিকাব ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল ছিল, এবং বেতন ভোগী ভৃত্যদিগের অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা মন্দ ছিল না। সকলের অবগতিব নিমিত্ত কমিসনের মন্তব্যের আমরা ইংরাজি অংশ টুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The food, clothing, and lodging provided for slaves by their masters were not worse than those of the free labourer."

"On the whole, the commissioners consider that the system of Indian slavery was usually of a very mild character, the slaves having frequently a better lot than the hired servant."

এ দেশে যে রীতিমত একটা ক্রীতদাসের ব্যবসায়ের প্রথা ছিল না, কেবল লোকে আপন কার্য্যের জন্য দাস রাখিত, ও দাসদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুরা অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন তাহার আর একটা প্রমাণ, আইন দ্বারা পঞ্চাশ বৎসর মাত্র যে এত বড় একটা গুরুতর নিষ্ঠুর অত্যাচার জনক ব্যাপার বন্ধ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারটা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। এমন কি, আধুনিক যে সকল সুশিক্ষিত লোক এ দেশ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন বৃত্তান্ত ইতিহাসাদিতে জ্ঞাত হইযাছেন, তাহাদের মধ্যেও এ দেশে যে এক সময় দাস ব্যবসায় নামক একটা নিষ্ঠুর ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, অতি অল্প লোকেই তাহা জ্ঞাত আছেন। দ্বিতীয় এ দেশের কোন প্রাচীন পুস্তকে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র উল্লেখ নাই, যদি প্রকৃত পক্ষে একটা ভীষণ নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন গ্রন্থেই কি তাহার উল্লেখ থাকিত না? তৃতীয়, যদি প্রকৃত পক্ষে ইহার একটা ব্যবসা থাকিত, তাহা হইলে যে ইংরাজকে বিশ কোটি টাকা দিয়া স্বদেশের, ও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর আমেরিকার দাস ব্যবসায় উঠাইতে হইয়াছিল, যদি এ দেশে ইহার রীতি মত একটা ব্যবসায় থাকিত, তাহা হইলে কি ইংরাজ, কেবল মুখের কথায় তাহা উঠাইতে সক্ষম হইতেন, এ সম্বন্ধে কি দাস-প্রভুদিগের পক্ষ হইতে কোন একটা আপত্তি উঠিত না? ক্রীতদাসদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুরা যে সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহার আর একটা প্রমাণ এই, এসিয়া খণ্ডের লোকের একটা প্রধান গুণ এই যে, যাহাকে নিজস্ব বলিয়া জানে, তাহার প্রতি তাহার মায়া মমতা, স্নেহ স্বাভাবিক অধিক হয়, তাহাকে তাহারা আপন পরিবারের অন্তর্গত মনে করে, তাহার প্রতি যদিও কখন ক্রোধ পরবশ হইয়া কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাহাও কেবল তাহাকে আপনার ভাবে বলিয়া। বেতন ভাগী দাসদিগের অপেক্ষা এই শ্রেণীর দাসদিগকে তাহাদের প্রভুরা অধিক আপনার জ্ঞান করিত, সুতরাং ইহাদের প্রতি ইহাদের প্রভুরা যদিও কখন কোন অসদ্ব্যবহার করিত, তাহা হইলেও তাহা যে ইংরাজ ও আমেরিকানদের মত নহে, ইহা দৃঢ় করিয়া বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ল কমিসনের মেম্বরেরা কি বলেন দেখুন; The punishment for misconduct which masters considered they had the right of infliction were usualy as a father would inflict on his child, or a master on his apprentice." যদি কাহারও কোন দাস একান্ত অবাধ্য

রামানন্দের ঝাঁপি।

সম্পাদকের হোটেল।

নানা গুণে আমি কমলাকান্তকে ভাল বাসিতাম। আফিঙ্গের আবশ্যক হইলে কমলাকান্তের নিকট প্রায় সকল সময়েই ধার পাওয়া যাইত; অনেক সময়ে অমনিও মিলিত। তদ্ভিন্ন কমলের তামাকের বড় সুবন্দোবস্ত ছিল। নশীবামবাবুর বাটীতে অবস্থানকালে কমলাকান্তের মন্দিরে যখনি প্রবেশ করিয়াছি, তখনি দেখিয়াছি, তাহা তাম্রকূটের ধূমে আচ্ছন্ন, আর তাম্বুল, কস্তুরী, একাঙ্গী, আতর গোলাপ প্রভৃতি তাম্রকূটের মশালা-দ্রব্যের সৌরভে সে স্থান আমোদিত। শারদীয়া দুর্গোৎসবে আরতির সময় পূজার দালানে গিয়া ধূপ-ধুনা-গুগ্গুল-কর্পূর প্রভৃতির ধূমে ও তদুদ্ভূত সুসৌরভবাহী বায়ুরাশির মধ্যে বিচরণ করিয়া যত না আনন্দিত হইতাম,—কমলার সে তাম্রকূটের ধূম্রাচ্ছন্ন গৃহে গিয়া তাহার অধিক প্রীতি পাইতাম। পূজার সময়ে শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল প্রভৃতির বাদ্যোদ্যমে প্রাণ যত না নাচিয়া উঠিত,—কমলার গৃহে গড়্গড়ার সেই বুড়্ বুড়্ বুড় বুড়্ গম্ভীর জীমূত মন্দ্রে অন্তর ততোধিক নাচিয়া উঠিত। আর তথায় উপাধানে বাহু সংন্যস্ত করিয়া সেই সুদীর্ঘনলসঙ্কুল আল্বোলা বা গড়্গড়ায় তাওয়া-দেওয়া খাস্ খাম্বিরা চড়াইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে টানিতে টানিতে যখন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতাম—আফিঙ্গের মৌতাতটুকু বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিত—তখন ভাবিতাম যে, কমলাকান্ত যথার্থই বড় ভাগ্যবান্, তাই এই "অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং টানে টানে" লাভ করিতেছে। বল দেখি, এত গুণে কোন্ অহিফেন-সেবী না কমলাকান্তকে ভাল বাসিবে?

বাস্তবিক লোকটার নিরুদ্দেশ হওয়ায় আর কাহারও কিছু ক্ষতি না হউক, আমার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। সে সরস 'দপ্তরের' লহরও কোথাও মিলে না। সে তামাক-টীকা-গুলের বাহারও কোথাও দেখিতে পাই না। কম-

লাকান্তের ন্যায় সুহৃদ এবং সাধু-সঙ্গ হারাইয়া ও সেই বঙ্গবসের-বুক্‌নি-দেওয়া জ্ঞান-ভরা অমৃতোপম 'দপ্তরের' রসাস্বাদ বিহীন হইয়া সংসার নিতান্ত বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কান্‌ব্যাস্‌-ব্যাগ্‌টীতে তল্পী-তল্পা পুরিয়া ঠন্‌ঠনিয়ার চটী জোড়াটী পায়ে দিয়া মল্‌মলের উড়ানি খানি স্কন্ধে ফেলিয়া, নানাবর্ণের বহুতালি সংযুক্ত পৈত্রিক ছাতিটী মাথায় দিয়া বাহির হইলাম। অভিপ্রায়—একবার কমলার খোঁজ করিব। কমলার দেখা কোথায় পাইব ?

ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রিটিশ-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্যত্র বিশেষ পরিচয়ের অভাবে, পরিচিতের বাস-স্থানের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে, এক হোটেল বা Messএ গিয়া মিশিলাম। দেখিলাম, Mess যথার্থই এক Regular Mess ! দিব্য পবিত্রস্থান—দ্বিতীয় জগন্নাথ ক্ষেত্র বলিলেও চলিতে পারে !

এই জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া কমলার কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে একদা মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম! তখন সেই মেশের শ্মশান ক্ষেত্রে পতিত থেলো-হুকাটী (আহা। তবুও তাহা অন্তর্লোলবস ও কত মনোমুগ্ধকরী!) কুড়াইয়া আনিয়া অল্পে অল্পে তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। দিব্য চক্ষে তখন অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম যেন,—সমস্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রের আফিসগুলি এক একটী হোটেল্‌ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! পাঠক বা গ্রাহক সম্প্রদায় তাহার মেম্বর — সম্পাদকগণ মেসের ম্যানেজার (অধ্যক্ষ)। হোটেলের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য— প্রত্যেক মেম্বরের নিকট হইতে মাসিক খরচ আদায় করিয়া প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারের যোগাড় করিয়া দেওয়া। সম্পাদকের কার্য্য—গ্রাহক-গণের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা প্রেরণ করা। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে—কি মেম্বর, কি গ্রাহক—উভয় দলই ক্রোধে আরক্ত-লোচন হন। তবে তাহার উপর যদি ভোজনের ভালরূপ বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে মেম্বরদের সে রাগ অনেকটা উপশান্ত হইতে দেখা যায়। পত্রিকাতে প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও মনোরম হইলে গ্রাহক বা পাঠকও কাগজের অল্প বিলম্বজনিত দোষ বড় একটা মনে করেন না।

এক একটী প্রবন্ধ এক একটী ব্যঞ্জন স্বরূপ। আমার বোধ হয়, মাংস ও মৎস্যের তরকারী—উপন্যাস। উপন্যাস নহিলে পত্রিকার আদর নাই—

পত্রিকা চলেও না। মাছের তরকারী দেয় না—এরূপ হোটেল কেহ দেখিয়াছ? তবে বঙ্কিম, রমেশ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাস কিছু সকলেই সকল সময়ে দিতে পারেন না। পাঁটা কিম্বা পাকা রুই মিরগেল ভেট্‌কী মাছও সকল হোটেলে বা সকল সময়ে জুটে না, রুচি পোনা ও বাটাতেই অনেকেই কায সারে। হরিদাস, তারক বিশ্বাস প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই প্রায় সকল কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল হোটেলে কেবল বাগ্‌দা চিঙ্গড়ী খাওয়ায়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সেখানে কোন ভদ্রলোক খান না। "মদন মোহনের" ন্যায় উপন্যাস যে কাগজে থাকে, তাহার কোন ভাল পাঠক নাই।

দাল—পদ্য। দাল একটা আবশ্যক আহার্য্য। পদ্যও কাগজে থাকা চাই। তবে আজকাল বঙ্গদেশে কেরাণীর সংখ্যা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রায় সকলেই পেট-রোগা হইয়া পড়িয়াছে। তাই মুগের দালই সকলে খাইতে চায়। নাচনীছন্দের বাক্যমাত্রসার রুচি পদ্যেরই আদর বেশী। অরহর দালের কেহ বড় একটা আদর করে না, কেন না হজম করা কঠিন। তাই সারবান্ হইলেও কোন হোটেলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ন। মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহার, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় লেথার বিশেষ আদর দেখা যায় না—মর্ম্ম বুঝাও বুঝি কঠিন। তবে রবিঠাকুরের ন্যায় সোনামুগের দাল, সুসিদ্ধ ও ভাল রন্ধন হইলে খাইতে মন্দ লাগে না—মুখরোচকও বটে। তবু কোন কোন ডাক্তার (সমালোচক) বলেন,—ইহার সারভাগ অল্প। কিন্তু আজকাল সোনামুগের অনুকরণে 'অশ্বমুগ' বলিয়া যে এক প্রকার দালের আমদানী হইয়াছে,—তাহার না আছে স্বাদ, না আছে সৌরভ। অধিকাংশ হোটেলে এই দালেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; তাহাও না কি আবার, অনেক সময় শুনিতে পাই, ভাতের মাড়-মিশানো।

পল্‌তার ঝোল, নিম্‌ঝোল বা শুক্তানি—ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ। খাইতে ভাল লাগে না বটে, কখন কখন মুখরোচক, কিন্তু সকল সময়েই বড় উপকারী। কে কবে দেখিয়াছ, সাধু, সদ্বুদ্ধিমান্ অথবা ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল-বৈতরণী-ভয়-ভীত লোক ভিন্ন ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে চায়?

দাল্‌না—আলঙ্কারিক লেখা (Ornamental writing)! সকল হোটেলে বা সকল পত্রিকাতে সকল দিন পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া গেলে গরম-মসলার গন্ধে একরূপ মন্দ লাগে না।

চাট্‌নি—রঙ্গরস বা রহস্য (Wit and Humour)। ইহা বড় হোটে-লেই এক আধটু রাখিয়া থাকে; অন্যত্র মিলিবার সম্ভাবনা অল্প। বঙ্কিম বা * * * * ন্যায় চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে সকল কাগজ জানে না। তবে চাট্‌নীর পরিবর্ত্তে একটা খাট্টা বা অম্বল অধিকাংশ হোটেলে পাওয়া যায়; তাহা যেমনি টক্‌, তেমনি অম্লরোগোদ্দীপক, সকল কাগজেই কখন কখন এক আধটু রঙ্গরস বা তাহার বিকার 'অম্বল' থাকে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই শ্রুতিকটু অথবা কুরুচি-উদ্দীপক।

এই সকল হইতে স্বতন্ত্র একটা তরকারী সকল হোটেলেই দিয়া থাকে, এবং তাহাই হোটেল সকলের "জান"। ইহার অপর কোন ভাল নাম না থাকাতে ইহাকে "গোলাম-ঘণ্ট' বলিয়াই অভিহিত করা হয়। এই গোলাম-ঘণ্টের ন্যায় হাব্‌জা-গোব্‌জাপূর্ণ বাজে লেখার দ্বারাই অধিকাংশ পত্রিকা আজকাল পূর্ণ থাকে। এবং তাহার দ্বারাই পাঠক গণকে 'নিজগুণে কৃপা করিয়া' একরূপ উদরপূর্ত্তি—শ্রীবিষ্ণু—পাঠেচ্ছানিবৃত্তি করিতে হয়।

ভাজা, ভাতে, পোড়া প্রভৃতিগুলিও বাজে তরকারী। সুতরাং তাহা-দের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব!

হোটেলের অধ্যক্ষরূপী সম্পাদকগণ এইরূপ নানাবিধ প্রবন্ধ-ব্যঞ্জনদ্বারা তাঁহাদের হোটেল বা পত্রিকা চালাইতেছেন ও খরিদ্দার বজায় রাখিতেছেন। সকলেরই ইচ্ছা অল্পখরচায় কাগজ-হোটেল চালাইবেন। এই উদ্দেশ্য সাধ-নার্থে অনেক সম্পাদক শস্তাদরে রাজ্যের ঝোড়ো পেঁপে, জোলো পটল ও শস্তার মূলো আনিয়া খরিদ্দারের কেবল গোলামঘণ্ট খাওয়াইতেছেন। আনিস উপন্যাসের বেলাতেও 'কোঁকড়া-কই' ওরফে "Lobster বা বাবা লোক"! বলা বাহুল্য যে, এরূপ হোটেল কোন সুখ্যাতিই কিনিতে পারেন না। ভাল ভাল খরিদ্দার অল্পদিনেই ভাগিয়া পড়েন। আবার এমন খরি-দ্দারও আছেন, যাঁহারা ভাল খাইতে পাইলেও কিছুদিন এক হোটেলে খাইয়া তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য তাগাদা করিলেই অন্য এক হোটেলে গিয়া উপস্থিত হন। এইরূপ খরিদ্দার হইতেই অনেক হোটেলও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়! কিন্তু আজকাল এরূপ এক সম্প্রদায় হোটেলকারীও দেখা দিয়াছেন—যাহারা খরিদ্দারের নিকট হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া অগ্রিমমূল্য আদায় করেন ও ২।৪ দিন খাওয়াইয়া তার পর অকস্মাৎ এক

রাত্রি যোগে গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়েন! এইরূপ প্রবঞ্চক ব্যবসাদার হইতেই অনেক ব্যবসা মাটী হইয়া গিয়াছে!

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম,—পটলডাঙ্গার এক হোটেলে বসিয়া কমলাকান্ত খালি নিমভাজা ও পলতার ঝোল দিয়া ভাত মারিতেছে! আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"এ কি, কমলাকান্ত,—এখানে এ কি?"

কমলাকান্ত উত্তর করিল—"আর ভাই! আমাশয় ও ক্রিমিরোগাক্রান্ত হওয়াতে কবিরাজ মহাশয় এইরূপ আহারই আমার পক্ষে মেধ্য ও হিতকারী বলিয়াদিয়াছেন। তিনি বলেন—নিম, পলতা, চিরেতা প্রভৃতি তিক্তপদার্থের আশ্চর্য্য ক্রিমিনাশক ক্ষমতা আছে।"

বুঝিলাম, লোকটার নিশ্চই বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলাম —"তোমার কবিরাজের ভুল হইয়াছে। তিনি তোমার ধাত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাই এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুমি কি জান না, যে ব্যক্তি কালাচাঁদের প্রেমে নিমগ্ন, তাহার নিকটে যম ঘেঁসিতে পারে না; ক্ষুদ্র ক্রিমি ত ছার পদার্থ! উঠিয়া আইস, আর তোমার পলতার ঝোল দিয়া ভাত মারিতে হইবে না। কেন? আফিঙ্গের অপেক্ষা কি পলতা অধিক তিক্ত? তিক্ত খাইলে যদি ক্রিমির ভয় না থাকে, তবে আফিঙ্গের মাত্রা—"

আমার বাক্য শেষ হইতে পাইল না। আফিঙ্গকে তিক্ত বলাতেই কমলাকান্ত ভাত ফেলিয়া ক্রোধ সংরক্ত নয়নে বলিয়া উঠিল,—"কি পাপিষ্ঠ! আমার নিকট আফিঙ্গের নিন্দা? আফিঙ্গ তিক্ত? তুমি পাঁচ ভরি আফিঙ্গ জলে গুলিয়া আমায় দিয়া দেখ, আমি চন্দ্রবদনে রসগোল্লার স্নতারে তাহা এখনি উদরস্থ করিয়া ফেলিব! বৃথায় আমি এতদিন ধরিয়া তোমায় আফিঙ্গ খাওয়াইয়াছিলাম! আজিও আফিঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে না? দূর হও আমার সম্মুখ হইতে, পামর!—"

হঠাৎ উরুদেশে একটা জ্বালাবোধ হওয়াতে চাহিয়া দেখি, হস্তস্থ থেলো হুঁকার কলিকা হইতে (বোধ হয়, কমলার ধমকে চমকিয়া উঠিয়াছিলাম!) একখানি সাগ্নিক টীকা ভ্রষ্ট হইয়া বস্ত্রভেদ করত উরুদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধকরিতেছে।

শ্রীরামানন্দ শর্ম্মা।

নীরবে নয়ন-জলে সম্ভাষ আদর!

১

অর্দ্ধভগ্ন হৃদে ভেসে নয়নের জলে,
নীরবে দুজনে যবে হনু ছাড়াছাড়ি,
দোঁহে দোঁহা একযোগে বহু দিন তরে ;
তখনি কপোল তব মলিন শীতল,
শীতল শীতলতর চুম্বন তোমার,
এ দুখের পূর্ব্বাভাস বলে ছিল মোরে।

২

তরুণ উষার সেই শিশিরের কণা
বিধে ছিল কপোলেতে তীক্ষ্ণ বাণ সম,
তখনি তা বুঝেছিনু পূর্ব্বাভাস বলে,
এখন যা অনুভবি সদা মন্তস্তলে ;
প্রতিশ্রুতি সব তব ভেঙ্গেছে এখন,
যশোগীতি যত তব হয়েছে বিলয় ;
তোমার মধুর নাম শুনি লোকমুখে,
লাজে মরি লোকে যবে তব নিন্দা করে।

৩

লোকে যবে তব নাম করে মোর আগে,
সমাধি-ঘণ্টিকা ধ্বনি সম বাজে কাণে,
অমনি যে শিহরিয়ে উঠে মোর দেহ ;
কেন তুমি ছিলে মম এত প্রিয়তম ?
জানে না তাহারা, আমি জানি যে তোমার,
জানার মতন জানা জানিত যেজন !
নীরব গভীর ভাবে আজীবন তরে,
কাঁদিবে তোমার লাগি এপরাণ মম।

৪

নিরজনে সংগোপনে মিলেছি' দু'জনে,
নীরবে কাঁদিছি তাই ভেবে মনে মনে,

ভুলিবারে পারে মোরে তোমারো হৃদয়,
ছলনা করিতে জানে তোমার অন্তর।
কে জানে কখন যদি বহুদিন পরে
দৈবযোগে চারি চোখে হয় সম্মিলন,
কেমনে করিব আমি অভ্যর্থনা তব ?
নীরবে নয়ন জলে-সম্ভাষ আদর।

(Lord Byron)

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

মধুর হরিনাম কে শুনিবি আয়!
বাহু তুলি গৌর ঐ ডাকিছে সবায়॥
কিবা সুন্দর গৌরবরণ, পূর্ণচন্দ্র শোভা সুবদন,
আলোময় শ্রীঅঙ্গ আভায়।
প্রভুভক্তি অবতার, কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণভক্তি করেন জগতে প্রচার,
অদেয় দুর্লভ ভক্তিধন সামান্য জীবে বিলায়॥
কিবা দুঃখী কিবা ধনী, কিবা মূর্খ কিবা জ্ঞানী,
সকলের ত্রাণের উপায়, (হরিনাম)
বাহুতুলি গৌর আমার, ডাকি সবে বলেন বারে বার,
ভক্তি বিনে ভজন পূজন যোগ যাগ সকল অসার,
ভক্তি পথে খোলা পাবি মুক্তির দুয়ার,
দাঁড়ায়ে নগর-বাসী বল কেন আর ?
ত্বরা করি এসো সবে মিছে মায়ায় দিন বয়ে যায়।

নবজীবন

৫ম ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১২৯৫। } ২য় সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

(৪৪ সূত্র)

সমালোচন। সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন "ইহাদ্বারাই সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির ব্যাখ্যা করা হইল," আমরাও যদি ঐ কথা বলিয়া সূত্রান্তর আরম্ভ করি, তা হইলে "হরিবোল হরি" বলিয়া পাঠকগণের মধ্যে অনেকই হয় ত এই খানেই পাঠ শেষ করিবেন, সুতরাং আমাদের কিঞ্চিৎ বাক্যব্যয় আবশ্যক হইতেছে। "ইহা দ্বারাই" সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির কিরূপ ব্যাখা হইল, তাহা ঠিক বুঝান যাউক বা না যাউক, বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। এই কথাটি বুঝিতে হইলে একবার "বিতর্ক, বিচারা-নন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" (১৭ সূ, ১ অ,) এই সূত্রটির উপর দৃষ্টি করা উচিত। এই সূত্রে বলিযাছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার :—বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত; তাহার মধ্যে ;—বিতর্কানু-গত স্থূলবিষয়ালম্বী, বিচারানুগত সূক্ষ্ম বিষয়ালম্বী ইত্যাদি। সেই স্থূল বিষয় আশ্রয় কারী বিতর্কানুগত সমাধির আবার দুই প্রকার অবস্থা হয় ;— (১) সবিতর্কসমাপত্তি, (২) নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি। সবিতর্কসমাপত্তি কিরূপ এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তিই বা কিরূপ ইহা পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইল। তাহার পর সূত্র কার বলিলেন ইহাদ্বারা সবিচার এবং নির্ব্বিচারসমাপত্তির কথা বলা হইল অর্থাৎ স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত চিত্তের যেরূপ অবস্থা হইলে সবিতর্ক সমাপত্তি হয়, সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত সেইরূপ অবস্থা হইলে সবিচার সমাপত্তি বলে এবং স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত চিত্তের যেরূপ অবস্থা হইলে নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি হয়, সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন

করিয়া সেইরূপ অবস্থা হইলে নির্ব্বিচার সমাপত্তি হয়। সবিতর্কের সহিত সবিচারের সর্ব্বাংশেই তুল্যতা,—কেবল আলম্বনীয় স্থূল, সূক্ষ্ম ভেদ, সেইরূপ নির্ব্বিতর্কের সহিত নির্ব্বিচারের সর্ব্বাংশেই তুল্যতা,—কেবল আলম্বনের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ, এই জন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন "ইহা দ্বারাই সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তির ব্যাখ্যা হইল"।

তন্মাত্র হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করত চিত্ত যখন তদাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত অভিন্ন হয়, অথচ সেই সঙ্গে সেই সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধি দেশ, কালাদিরও অনুভব হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থার নাম সবিচার সমাপত্তি। আর যখন সেই সকল দেশ কালাদি কিছুরই অনুভব হয় না, এক মাত্র সূক্ষ্ম বিষয় চিত্তাকারে পরিণত হইয়া ভাসমান হয়, তখন নির্ব্বিচার সমাপত্তি হয়।

ভাষ্যকার এইরূপে সবিচার এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তি বুঝাইয়া পরিশেষে এই উভয়ের ভেদ দেখাইয়াছেন যথা—"তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা, নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্ম বিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ। এবমুভয়ো রেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কয়া বিকল্পহানি ব্যাখ্যাতেতি"।

এক্ষণে জানা গেল সমাপত্তি চারপ্রকার, সবিতর্কা, নির্ব্বিতর্কা, সবিচার এবং নির্ব্বিচার। এই চার প্রকার সমাধির মধ্যে সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক এই উভয় বিধ সমাপত্তিই স্থূল বস্তুবিষয়ক এবং সবিচার এবং নির্ব্বিচার এই উভয় বিধ সমাপত্তি সূক্ষ্ম বস্তুবিষয়ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি বিকল্প শূন্য হওয়ায় সবিচার এবং নির্ব্বিচার এই দুই প্রকার সমাপত্তিই বিকল্প শূন্য, তাহার কারণ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, যখন সবিচারের পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বিতর্কাবস্থায় বিকল্প ত্যাগ হইয়াছে তখন সবিচারে আর বিকল্প হইতে পারে না। কেহ বলেন স্থূল বলিতে সমুদায় বিকৃতি, তাহাদের মতে ইন্দ্রিয় এবং পরমাণু ইহারাও স্থূলের মধ্যে পরিগণিত। কেহ কেহ আবার ইন্দ্রিয়গণকে সূক্ষ্মের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারপ্রকার (১) বিতর্কানুগত, (২) বিচারানুগত, (৩) আনন্দানুগত (৪) অস্মিতানুগত। ইহাদের মধ্যে বিতর্কানুগতের দুই প্রকার অবস্থা সবিতর্কসমাপত্তি এবং নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি, এই রূপ বিচারানুগতেরও সবিচার সমাপত্তি এবং নির্ব্বিচারসমাপত্তি এই দুই রূপ অবস্থা হয়। গ্রাহ্য সমাপত্তির এই চারপ্রকার ভেদ; এইরূপ সানন্দানু-

গত সমাধির চরমাবস্থাকে সানন্দ সমাপত্তি, (ইহাই গ্রহণ সমাপত্তি) এবং অস্মিতানুগতের চরম অবস্থাকে অস্মিতা সমাপত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (উহাই অস্মিতা সমাপত্তি)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সমাধি এবং সমাপত্তির মধ্যে প্রভেদ কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, সমাধি বলিতে চিত্তের ধ্যানরূপ ক্রিয়া, দেহকে স্থির করিয়া কোন এক বিষয়কে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করত সেই বিষয়ের সহিত চিত্তের একাকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমুদয় ধ্যান ক্রিয়ার নাম সমাধি-স্তুতরাং সমাধির মধ্যে ভঙ্গ হওয়া সম্ভব। সমাপত্তি সমাধির চরমাবস্থা, ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকার প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি, সমাপত্তি লাভ হইলে আর সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫।

পদচ্ছেদঃ। সূক্ষ্ম-বিষয়ত্বং, চ অলিঙ্গ-পর্য্যবসানম্ (পরি-অবসানম্)।

পদার্থঃ সূক্ষ্মঃ বিষয়ো যস্যাঃ সা তস্যাভাবঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং সূক্ষ্মবিষয় সমাপত্তিত্বং ইতি যাবৎ, অথবা সূক্ষ্মশ্চাসৌ বিষয়-শ্চেতি সূক্ষ্মবিষয়স্তস্য ভাবঃ চ পুনঃ অলিঙ্গপর্য্যবসানং ন কচিল্লীয়তে, নবা কিঞ্চিল্লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গং প্রধানং প্রকৃতিরিতি যাবৎ তত্র পর্য্যবসানং অন্তো যস্য তৎ প্রধান পর্য্যন্তমিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ

ভাবার্থঃ। সবিচার নির্বিচারয়োঃ সমাপত্যোঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং উক্তং অথ কিম্পর্য্যন্তং তৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং ইত্যাশঙ্ক্যাহ সূক্ষ্মবিষয় ইতি প্রধানপর্য্যন্তমেব সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চিত্তং যদা সূক্ষ্মবিষয়াকারং ভবতি তদা প্রধান এব তস্য পর্য্যবসানং ভবতি, প্রধানাৎ পরং সূক্ষ্মং নাস্তীতি ভাবঃ। তথাহি গুণানাং পরিণামে চত্বারি সর্ব্বাণি (১) বিশিষ্টলিঙ্গং, (২) অবিশিষ্টলিঙ্গং, (৩) লিঙ্গমাত্রং, (৪) অলিঙ্গঞ্চেতি তত্র বিশিষ্টলিঙ্গং ভূতানি, অবিশিষ্টলিঙ্গং তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি, লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ, অলিঙ্গং প্রধানং প্রকৃতিরিতি। প্রধানস্য ন কুত্রচিল্লয়া বর্ত্ততে, তত্রৈব সূক্ষ্মতায়াঃ পর্য্যবসান মিতি ভাবঃ।

অনুবাদ। প্রকৃতিই চরম সূক্ষ্মবিষয়।

সমালোচন। সবিচার এবং নির্বিচার এই উভবিধ সমাপত্তিকে সূক্ষ্মবিষয় বলা হইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা কতদূর অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শেষ,

যাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম নাই, এমন কোন বস্তু?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ৪৬ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, সূত্রকার বলিলেন অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিই চরম সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা আর কোন সূক্ষ্ম বস্তু নাই। ভাষ্যকার যথাক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ের একটি তালিকা দিয়াছেন যথা—

পার্থিব পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় গন্ধ-তন্মাত্র, জলীয় পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় রস-তন্মাত্র; তৈজস পরমাণুর রূপ-তন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ-তন্মাত্র, এবং আকাশীয় পরমাণুর শব্দ-তন্মাত্র। এই সকল তন্মাত্রের সূক্ষ্ম অহঙ্কার, অহঙ্কারের মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের প্রকৃতি। প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই। যদি বল পুরুষ অর্থাৎ চিৎ শক্তিও ত সূক্ষ্ম, প্রকৃতি অপেক্ষা তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া গণনা করা না হয় কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন এস্থলে উপাদান-কারণতা অনুসারে সূক্ষ্মত্বের গণনা করা হইয়াছে। পুরুষ সূক্ষ্ম হইলেও উহা অপরিণামী, কাহারও উপাদান কারণ নয় সুতরাং এস্থলে তাহার গণনা হইতে পারে না, উপাদান-কারণতা অনুসারে প্রকৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। পুরুষ কাহারও উপাদান নয়, তবে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মহদাদি সৃষ্টির প্রতি নিমিত্ত কারণ বটে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই কথা বলা হইয়াছে যথা—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" আমার অধিষ্ঠান বশেই প্রকৃতি এই সচরাচর জগতের সৃষ্টি করেন। অন্যান্য পুরাণেও এইকথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬।

পদচ্ছেদঃ। স্পষ্টম্।

পদার্থঃ। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু সমাপত্তয় এব (অবধারণে) সবীজঃ বীজেন আলম্বনেন সহ বর্ত্তত ইতি সজীবঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ যোগ ইত্যর্থঃ। উদ্দেশ্যবিধেয়স্থলে লিঙ্গবচনয়োরতন্ত্রতেতি সমাধাবেকবচনত্বং ন দুষ্টং।

অন্বয়ঃ। কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সর্ব্বাসাং সমাপত্তীনাং সালম্বনত্বাৎ সবীজত্বমিতি ভোজরাজঃ। যোগপ্রভাকরস্তু—তা এব সবীজঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ বিবেকস্যাভাবেন বন্ধবীজসত্ত্বাৎ সবীজত্বং দ্রষ্টব্যমিত্যাহ।

অনুবাদ। পূর্ব্বকথিত সমাপত্তি গুলিই সবীজ সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সমালোচন। এই সূত্রের উপর ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্ব্বস্তুবীজা" ইতি সমাধিরপি সবীজঃ তত্র স্থূলে-হর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ সূক্ষ্মেহর্থে সবিচারো নির্ব্বিচার ইতি চতুর্দ্ধোপ সংখ্যাতঃ সমাধিরিতি"।

বিজ্ঞানভিক্ষু এই ভাষ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন পূর্ব্বোক্ত গ্রহীতৃ, গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়ক সমাপত্তিই সবীজ সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ। যদিও যোগের স্বাভাবিক কোন ভেদ নাই তথাপি সমাপত্তিরূপ সাক্ষাৎকারের উৎপাদন হেতুক যোগে সমাপত্তির ধর্ম্মের আরোপ হইয়াছে। এই সকল সমাপত্তি বহির্বস্তু বীজ অর্থাৎ সংস্কারাদি দুঃখ বীজের কারণ। সেই সমা-পত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় এ স্থলে সম্প্রজ্ঞাতযোগও সবীজ বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে। যদি বল বাস্তবিক ধরিতে গেলে সমাপত্তি ছয় প্রকার হয় (১) সবিতর্ক, (২) নির্ব্বিতর্ক (৩) সবিচার, (৪) নির্ব্বিচার, (৫) সানন্দ, (৬) সাস্মিতা তবে ভাষ্য কার চারপ্রকার সমাপত্তি বলিলেন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার নিজেই বলিতেছেন যে স্থূল আলম্বন জন্য সমাপত্তি এবং সূক্ষ্মালম্বন জন্য সমাপত্তি এক একটি বলিয়া ধরিতে হইবে। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে (১৭।১ সূত্রে) বিতর্কানুগতাদি রূপে সমাপত্তি চার প্রকারে পরিগণিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার এবং এবং নির্ব্বিচার এই চার প্রকার সমাপত্তিই সবীজ, বিজ্ঞান ভিক্ষু ইহা খণ্ডন করিয়াছেন তিনি বলেন সম্প্রজ্ঞাত যোগই সবীজ; কারণ সম্প্রজ্ঞাত যোগে সংস্কার থাকায় দুঃখের বীজ থাকে। সেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চার প্রকার,— বিতর্কানুগত বিচারানুগত আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। সুতরাং এই চার প্রকার সমাধিই সবীজ উহাদের মধ্যে কেবল বিতর্কানুগত ও বিচারানুগত সমাধিকে সবীজ বলিলে সূত্রকারের ন্যূনতা হয়। সকল প্রকার সমাপত্তির মধ্যে নির্ব্বিচার সমাপত্তির শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেছেন।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥৪৭॥

পদচ্ছেদঃ। নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যে-অধ্যাত্ম (অধিআত্ম) প্রসাদঃ।

পদার্থঃ। নির্ব্বিচারত্বং ব্যাখ্যাতং বিশারদস্য ভাবঃ বৈশারদ্যং নৈর্ম্মল্যং

নির্ব্বিচারস্য নির্ব্বিচারায়াঃ সমাপত্তেঃ বৈশারদ্যে প্রকৃষ্টাভ্যাসবশাৎ নৈর্ম্মল্যে সতি অধ্যাত্মপ্রসাদঃ আত্মনি বুদ্ধৌ বর্ত্ততে ইত্যধ্যাত্মং তাদৃশঃ প্রসাদঃ স্ফুট প্রজ্ঞালোকঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধেঃ বৈশারদ্যং প্রকৃষ্টাভ্যাসবশাৎ রজস্তমোভ্যামনভিভূতত্বাৎ তত্র সমাধৌ চিত্তস্য দার্ঢ্যং ভবতি তদা সত্ত্বোৎকর্ষাৎ প্রজ্ঞালোকস্য সম্যক্ স্ফুটতা জায়তে। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। নির্ব্বিচার সমাধিতে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মাইলে জ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়।

সমালোচন। বৈশারদ্য শব্দের ভাষ্যকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন— "অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধি সত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহী বৈশারদ্যং"। অশুদ্ধি বলিতে পাপবুদ্ধি, সেই পাপবুদ্ধি রূপ যে আবরণ মল তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত অতএব প্রকাশ-স্বরূপ বুদ্ধির রজঃ এবং তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত এবং ধ্যেয় বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ যে একাগ্রতা তাহার নাম বৈশারদ্য অর্থাৎ দর্পণ যেমন মলদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে তাহাতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু মাজিয়া ঘসিয়া মল দূর করিলে স্বীয় স্বাভাবিক নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া বস্তুর প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হয়, সেই রূপ অনবরত ধ্যান করিতে করিতে পাপ বুদ্ধি রূপ মল অপগত হইলে বুদ্ধি নিজ স্বাভাবিক সত্ত্বময় প্রকাশ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন উহাতে রজঃ এবং তমোগুণের সম্পর্ক না থাকায় উহা এরূপ নির্ম্মল হয় যে ধ্যেয় বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব আসিয়া উহাতে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে একাকারতা প্রাপ্ত হয়, অবিচ্ছেদ রূপ সেই একাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকার নাম বৈশারদ্য। নির্ব্বিচার সমাধিতে যখন চিত্তের সেই বৈশারদ্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চিত্ত নিরন্তর ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়, তখন উহার জ্ঞানালোক এরূপ প্রস্ফুট হয় যে, উহাতে একেবারে সমুদয় তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ হইতে প্রতিভাসিত হয়। যোগী তখন ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান সমুদয় বিষয় একেবারে নখ দর্পণের মত জানিতে পারেন। যেমন উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া নিম্নস্থ সমুদয় বস্তু একেবারে দর্শন করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ যে যোগীর প্রজ্ঞারূপ আলোক সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তিনি সমুদয় জাগতিক পদার্থকে একেবারে দর্শন করেন।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ।

পদচ্ছেদঃ। ঋতম্ভরা, তত্র, প্রজ্ঞা।

পদার্থঃ। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্যয়েনাচ্ছাদ্যতে সাঋতম্ভরা, তত্র তস্মিন অধ্যাত্ম প্রসাদে প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ।

অন্বয়ঃ। তত্র তস্মিন্ সতি প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। তত্র অধ্যাত্ম প্রসাদে সতি সমাহিত চিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে সা ঋতম্ভরেতি কথ্যতে, যথার্থা চ সা যতঃ সা সত্যমেব বস্তুনঃ প্রকৃতং স্বরূপমেব বিভর্ত্তি পশ্যতি ন তত্র ভ্রমলেশোপি বিদ্যতে। তথাচোক্তং আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমমিতি। ধ্যানস্য চিন্তনস্য যোঽভ্যাসঃ পৌনঃ পুন্যং তত্র যোরস আদরস্তেন। অন্যং স্পষ্টং।

অনুবাদ। অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থাৎ প্রজ্ঞারূপ আলোকের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হয়।

সমালোচন। আমাদের যে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম বা অন্যরূপ অযথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ অবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের প্রজ্ঞারূপ আলোকের অপরিস্ফুটতা মাত্র। ঐ সম্পর্কবিদূরিত হইলে জ্ঞানালোক যখন সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন যে বস্তুর ঠিক স্বরূপই জ্ঞাত হইব তদ্বিষয় আর সংশয় কি?

শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ।

পদচ্ছেদঃ। শ্রুত অনুমান-প্রজ্ঞাভ্যাং অন্য-বিষয়া, বিশেষার্থত্বাৎ।

পদার্থঃ। শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যাং শ্রবণমননাভ্যাং অন্য বিষয়া অতিরিক্ত বিষয়া, বিশেষার্থত্বাৎ বিশেষঃ অর্থঃ যস্যাঃ সা বিশেষার্থা, তস্যাভাবঃ, তস্মাৎ বিশেষ বিষয়ত্বাদিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টং

ভাবার্থঃ। শ্রুতেন শ্রবণেন অনুমানেন চ যা প্রজ্ঞা জায়তে সামান্য বিষয়া এব তথাহি ঘটপদেন ঘটত্বাবচ্ছিন্নস্যৈব জ্ঞানং ভবতি, নতু তত্তদ্বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য, এবমনুমানমপি বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ বহ্নিত্বসামান্যাবচ্ছিন্নস্যৈব জ্ঞানংভবতি নতু তত্তদ্বিশেষবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নস্য তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো

নকশ্চিদ্বিশেষোক্তি, ইয়ং পুনর্নির্বিচার বৈশারদ্যসমুৎপন্না প্রজ্ঞা তাভ্যাং বিলক্ষণা অস্যাং হি প্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টানামপি বিশেষঃ স্ফুটেনৈব প্রতি ভাসতে ইতি।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা শ্রবণ বা অনুমান জন্য জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ উহাদের অন্তর্গত নয়, কারণ ইহার দ্বারা বস্তুবিশেষের উপলব্ধি হয়।

সমালোচন। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল,—আগম অর্থাৎ আপ্তবাক্য (শাস্ত্র) বা অনুমানদ্বারা প্রত্যক্ষের অগোচর সমুদয় তত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে, অতএব সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য যোগ অভ্যাস, করে কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? এই আশঙ্কার উত্তর করিবার নিমিত্তই এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রে ব্যবহৃত শ্রুত শব্দের অর্থ আগম। আগম বলিতে শাস্ত্র, শাস্ত্র সকল শব্দময় সুতরাং আগমজন্য জ্ঞান এবং শাব্দ বোধ একই কথা। শব্দ শ্রবণ করিয়া জ্ঞান হয় বলিয়া উহাকে শাব্দ বোধ বলে। শব্দ ঘট, পট ইত্যাদি; ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিয়া ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থের সামান্য রূপে জ্ঞান হয় মাত্র, বিশেষ রূপে নয়। "এই স্থানে ঘট আছে" এই কথা শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে প্রসিদ্ধ ঘট জাতীয় পদার্থ একটি এখানে আছে, কিন্তু সেটি কাল, রাঙা বা সাদা তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না, এই রূপ সকল স্থলে শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই শব্দ প্রতিপাদ্য বস্তুর সামান্য রূপে জ্ঞান হয় মাত্র, তজ্জাতীয় বস্তুবিশেষের জ্ঞান হয় না। অনুমান দ্বারাও ঐরূপ অনুমেয় বস্তুর সামান্যরূপে জ্ঞান হয় মাত্র, তজ্জাতীয় বস্তুবিশেষের জ্ঞান হয় না। বিবেচনা কর কোন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলাম। সেই অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নিজাতীয় একটা পদার্থ আছে এইরূপ জ্ঞানই হইল কিন্তু সে বহ্নি কিরূপ, সে জ্ঞান হইল না অর্থাৎ বহ্নিবিশেষের জ্ঞান হইল না। কিন্তু সমাধি জন্য যে জ্ঞান হয়, তাহাতে বস্তুর বিশেষ রূপ উপলব্ধি হয়, যোগাভ্যাস ভিন্ন সেরূপ জ্ঞান লাভ হয় না অতএব যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে।

প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর বিশেষ রূপ উপলব্ধি হয় বটে কিন্তু বস্তু স্থূল ও ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট না হইলে হয় না। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বা দূরস্থ বস্তুর কি সামান্যরূপ, কি বিশেষরূপ কোন রূপই প্রত্যক্ষ হয় না। সেরূপ বস্তুই নাই একথা বলিতে পারা যায় না কারণ তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। ফল স্থূল বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম যদিও প্রত্যক্ষ অনুমান বা আগম দ্বারা কোন রূপে জ্ঞাত

হওয়া যায়, কিন্তু তন্মাত্রাদি-সূক্ষ্ম-বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম সমাধিজন্যজ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়ে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাদৃশ বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান করিবার নিমিত্ত যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা।

তজ্জসংস্কারোঽন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ।

পদচ্ছেদঃ। তজ্জঃ, সংস্কারঃ, অন্যসংস্কার—প্রতিবন্ধী।

পদার্থঃ। তয়া পূর্ব্বোক্তয়া প্রজ্ঞয়া জনিতঃ সংস্কারঃ, অন্যাঃ সংস্কারা, অন্যসংস্কারাঃ, তাদৃশপ্রজ্ঞোৎপত্তেঃ পূর্ব্বজাতাঃ সংস্কারা ইত্যর্থঃ, তান্ প্রতিবধ্নাতি স্বকার্য্যকরণাক্ষমান্ করোতীতি অন্য সংস্কারপ্রতিবন্ধী।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সমাধিপ্রজ্ঞয়া চিত্তে যঃ সংস্কারউৎপদ্যতে স স্বপূর্ব্বজান্ চিত্তস্থিতান্ সর্ব্বানেব সংস্কারান্ প্রাগভিভূয় প্রবলোভবতীতিভাবঃ।

অনুবাদ। সেই সমাধিপ্রজ্ঞা জনিত সংস্কার দ্বারা অপর সংস্কার সকলের কার্য্যকারিতা শক্তি বিলুপ্ত হয়।

সমালোচন। চিত্তের যত গুলি পরিণাম হয়, সেই সেই পরিণামানুসারে এক একটি সংস্কার হয়। সেই সেই সংস্কার-বশে চিত্ত আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, একথা পূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়া আসিয়াছি। সমাধি প্রজ্ঞা অবস্থায় চিত্তের যে সংস্কার হয় সেই সংস্কারের প্রাবল্য হেতু তখন উহার পূর্ব্ব সংস্কার সকল একবারে বিলুপ্ত হয় না বটে কিন্তু তাহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না। একবারেই যে সম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধি এবং পূর্ব্ব সংস্কারের রোধ হয় তাহা নয়, অনেক বার সংপ্রজ্ঞাত যোগের অভ্যাস দ্বারা সম্প্রজ্ঞাতের দৃঢ়তা হয়। সম্প্রজ্ঞাত সুদৃঢ় হইলে তবে পূর্ব্ব সংস্কার সকলের সম্পূর্ণরূপ বিলোপ হয়। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ভাল প্রজ্ঞাসংস্কারের প্রাবল্য হেতু অন্যবিধ সংস্কারের লোপ হওয়ায় চিত্তকে সেই সেই সংস্কার অনুসারে কার্য্য করিতে না দিউক কিন্তু প্রজ্ঞাসংস্কারত সংস্কার উহা স্বয়ং প্রবল হইয়া চিত্তকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না করে কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, তখন কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু অবিদ্যাদির বিনাশ হওয়ায় সমাধি প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারেরা চিত্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। কারণ যে অবধি তত্ত্বজ্ঞানলাভ না হয় সেই অবধিই চিত্তের চেষ্টা থাকে; তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে চিত্ত আপনাকে কৃতকৃত্যবোধ করিয়া আর কোন রূপ সৎ বা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

তখন চিত্তের কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না বটে কিন্তু সমাধি প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারের প্রাবল্য হওয়ায় চিত্ত একবারে বৃত্তি শূন্য হয় না ঐ সংস্কাররূপ বৃত্তি উহাতে থাকে, এই জন্য উহাকে সবীজ সমাধি বলা হয়।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ॥৫১।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, অপি, নিরোধে, সর্ব্ব-নিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।

পদার্থঃ। তস্যাপি প্রজ্ঞাকৃতসংস্কারস্যাপি নিরোধে অত্যন্তাভিভবে জায়মানে সর্ব্বনিরোধাৎ সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং প্রবিলয়াৎ নির্ব্বীজঃ নিরালম্বনঃ অথবা দুঃখবীজৈঃ সংস্কারৈঃ শূন্যঃ সমাধিঃ যোগঃ।

অন্বয়ঃ। আবির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং তত্রাপি বৈরাগ্যাৎ যোগাভ্যাস বলেন সমাধিপ্রজ্ঞাকৃত সংস্কারস্য প্রবিলয়ে সর্ব্ববৃত্তি নিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ নিরালম্বনো দুঃখবীজসংস্কারাশূন্যোবা সমাধিঃ অসংপ্রজ্ঞাতরূপঃ উপজায়তে। তস্মিন্ সতি- পুরুষঃ স্বরূপমাত্রনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি। স এব মোক্ষ ইতি ফলিতম্।

অনুবাদ। সেই সমাধি প্রজ্ঞাজনিতসংস্কারের বিলয় হওয়ায় নিখিল চিত্তবৃত্তির বিলয় হয় এবং তখনই নির্বীজ সমাধির আবির্ভাব হয়।

সমালোচন। প্রথমেই বলা হইয়াছে যোগ দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। ৫০ সূত্র অবধি সংপ্রজ্ঞাতের কথাই বলা হইল; কেবল ৫১ এই অন্তিমসূত্রে অসম্প্রজ্ঞাতের বিষয় বলিতেছে। সংপ্রজ্ঞাত যোগ যখন চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ বিদিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ রজঃ এবং তমোগুণরূপমলশূন্য হওয়ায় সত্ত্বময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অপর সমুদয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই আত্মজ্ঞানরূপ বৃত্তিকে আশ্রয় করে; সুতরাং উহাতে তখন সেই আত্মজ্ঞান জন্য তাদৃশ একটি সংস্কারও থাকে; এইরূপ অবস্থা সংপ্রজ্ঞাতের সীমা। উহাতে ঐ আত্মজ্ঞানরূপ বৃত্তি এবং তজ্জন্য সংস্কার থাকায় উহাও সবীজ সমাধি, কিন্তু যদি কোন যোগী উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সুদৃঢ়অভ্যাসবলে ঐ বৃত্তি টুকুর রোধ করে তাহলে তজ্জন্য সংস্কারের বিলোপ হয় এবং চিত্তের আর কোন রূপ বৃত্তিই থাকে না, চিত্ত তখন নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত এবং প্রশান্ত সাগরের মত গম্ভীর ভাব ধারণ করে। সেই নির্ম্মল এবং স্থির চিত্তে নির্ম্মল আত্মার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব আসিয়া পতিত হওয়ায় একপ্রকার

অনির্ব্বচনীয় যোগের উৎপত্তি হয়। ইহা সামান্য যোগ নয়, জড় চৈতন্যের একীভাব, অথচ উভয়েই নির্লিপ্ত, জীবন মরণের একত্র লীলাখেলা। এই মহাযোগের নামই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। সে সমাধিতে জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা নাই। কার্য্য নাই, চেষ্টা নাই, প্রবৃত্তি নাই, সংস্কার নাই, কার্য্যের বীজও নাই। সেই সঙ্গে আর কতকি নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আবার দুঃখও নাই, সুখও নাই। আছে কেবল আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং মুক্ত, আর সত্ত্বময় নির্ম্মল স্থির চিত্ত। দেহ থাকিতে পারে, না থাকিতে পারে। ইহাই চরমযোগ এবং যোগীদের পরম পুরুষার্থ। এক জন্মে নয়, দুই জন্মে নয়, শত সহস্র জন্মজন্মান্তরের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা কেহ কেহ এরূপ যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের সমাধিপাদ নামক প্রথমপাদ।

সম্পূর্ণ।

শশ্মানেশোকদৃশ্য।

১

দিবা অবসান,—প্রশান্ত প্রকৃতি,—
বক্তিম বিভায় হাস্যময়ী সতী।
পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়েছে—
দীনেশ—জগত-জ্যোতি।
অই তবঙ্গিণী স্বচ্ছ সচঞ্চল,—
আপনাব ভাবে আপনি বিহ্বল,
মৃদু কলনাদে নীলাম্বু উদ্দেশে
অনন্ত অশ্রান্ত গতি।

২

তটিনীব স্নিগ্ধ শ্যামল দু-কূলে,—
সুশোভিত চারু পল্লব মুকুলে,—
দাঁড়ায়ে বয়েছে মহীরুহ বাজি—
শান্তিব প্রহবী প্রায়।
বনবিহঙ্গেব মনোমুগ্ধকব,—
বাজিছে মধুব মৃদু কণ্ঠস্বর;
নীবময়ী নদী শিহবি উঠিছে—
মৃদুল মৃদুল বায়।

৩

তটিনীর তীরে শ্মশান-শয্যায়,—
মলিন বিবর্ণ প্রভাশূন্য কায়,—
শায়িত রয়েছে শবদেহ এক.—
চিব নিদ্রা অভিভূত।
একটী ষোড়শী অদূরে দাঁড়ায়ে,—
ঘোমটা ঘুচায়ে রহিয়াছে চেয়ে,—
মৃত যুবকের মুখপানে হায়!
পাষাণ প্রতিমা মত

৪

বমণীব নেত্রে ঝরে অশ্রুজল,
নিদারুণ শোকে হৃদয় বিকল,
নিরাশাব তাপে শুকায়ে গিয়াছে,
কোমল পবাণ তাব।
স্বভাব-সরলা,—হায় অনাথিনী,
এসেছে শ্মশানে সাজিতে যোগিনী ;
আহা কি কঠোর অনিবার্য্য বিধি,
নিদারুণ বিধাতাব।

৫

বিষাদে নিষ্প্রভ ম্লান কলেবব,—
পশ্চিম সাগবে ডুবিলা ভাস্কব ,
আলোর বক্তিম শেষ আভাটুকু—
ভাসিছে গগণ তলে।
ধীবে ধীবে আসি সন্ধ্যা-সীমন্তিনী,
করুণ-হৃদযা শান্তি স্বপিণী,
ঢাকিয়া ফেলিল শবেব বদন
আপন বসনাঞ্চলে।

৬

"হবিবোল হবি,''—কবি ভগবন্,
সঙ্গী দ্বিজগণ জ্বালি হুতাশন,
প্রদানিলা হায়, শোক-সন্তাপিতা—
সতীব কোমল কবে।
কম্পমান করে লয়ে হুতাশন,
শবেব মুখাগ্নি করি সমাপন,—
করযোড়ে দেবী দাঁড়াইলা সরি—
নয়নে শোকাশ্রু ঝরে।

৭

জলিল শ্মশান,—"হরিবোল হরি"
অনাথা রমণী কেন প্রাণ ধরি,—
সংসার-শ্মশানে ভুগিতে যাতনা,—
বাঁচিয়া রহিল হায়।
সংসারের সুখ,—জীবন সর্ব্বস্ব,—
শ্মশান-অনলে পুড়ি হইল ভস্ম;
পরাণও পুড়িয়ে গেল দুখিনীর,—
পুড়িল না শুধু কায়।

৮

করে সমাপন শবের সৎক্রিয়া,—
বিধবা বালার বেশ বদলিয়া,—
দ্বিজগণ সব;—শোকেতে না সরে,
বদনে কাহার বাণী।
তটিনীর নীরে স্নানে শুদ্ধ হয়ে,—
ফিরিলা সকলে আপন আলয়ে,
বিসর্জ্জিয়ে শোক সাগর সলিলে,
সোনার প্রতিমা খানি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি।

আসাম।

চাকর সাহেব দিগের কল্যাণে বাঙ্গালীর শিক্ষিত অশিক্ষিত, ছোট বড় কাহারও নিকট আসামের নাম অপরিচিত নহে। স্বভাবের শোভা দর্শন করিবার পক্ষে আসাম অবশ্য দর্শনীয় স্থল; আসামে বৃহদকার নদ নদী, বন উপবন, পাহাড়, পর্ব্বত ও উপত্যকার অভাব নাই। যাঁহারা দেশ ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন, অথচ ভ্রমণের একটু কষ্টস্বীকার করিতে ক্লেশ বোধ করেন না, আসাম তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য দর্শনীয়। আমরা এই প্রবন্ধে আসামের ও আসাম বাসীর যৎকিঞ্চিৎ মোটামুটি পরিচয় দিব।

প্রথম, আসাম নামের উৎপত্তি। পূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল বলা যায় না। আহম নামকজাতি কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত হওয়ার পর হইতে আহম্ শব্দ হইতে আসাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই অবধি এই দেশ আসাম নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গে ভাগীরথী যেরূপ শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া রাখিয়াছেন, আসামে ব্রহ্মপুত্রও সেইরূপ আসাম ভূমিকে নানা প্রকারে বেষ্টন করিয়া তাহাকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। পথ ঘাটের অসুবিধায় আসাম ভ্রমণ ইচ্ছা থাকিলেও অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না বলিয়া আসামের একটা মোটামুটি বিবরণ আমরা প্রদান করিলাম।

কলিকাতা হইতে আসাম যাইতে হইলে, আসামের প্রথম ষ্টেশন ধুবড়ীতে নামিতে হয়, তথা হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ষ্টিমার যোগে গোয়ালপাড়ায় পঁহুছান যায়। আসাম ভ্রমণ-কারীর পক্ষে গোয়ালপাড়া একটি দর্শনীয় স্থান। এখানে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে; এই সকল পাহাড়ের উপর সাহেবদিগের সুরম্য বাঙ্গালা আছে। গোয়ালপাড়ায় পাহাড়ের উচ্চ শিখর হইতে আসামের অনেক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, উচ্চস্থান হইতে উত্তরে হিমাচলের ও দক্ষিণে গারো পর্ব্বতের সুন্দর দৃশ্য শীঘ্র ভুলিবার নহে, ভ্রমণকারী দর্শকের মনে অনেক দিন তাহা জাগিয়া থাকে।

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়া গৌহাটি আসাম যাত্রীর তৃতীয় দর্শনীয় স্থান। গোয়ালপাড়া হইতে ষ্টীমার যোগে গৌহাটী যাইতে একদিন সময় লাগে। গৌহাটি হিন্দুর পক্ষে কেবল সুদর্শনীয় স্থান নহে, ইহা এক প্রসিদ্ধ

তীর্থ স্থল। কামাখ্যা দেবীব মন্দিব এই গৌহাটীতে। এতদ্ভিন্ন আসামেব মধ্যে ইহা একটি অতি প্রাচীন নগব, মহাভারতে ইহা রাজা ভগদত্তের বাজধানী বলিয়া পরিচিত তখন নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ।

ইংবাজরাজও আসাম গ্রাস করিয়া প্রথমে এই প্রাচীনস্থানে নিজ বাজ-ধানী স্থাপন কবেন, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কমিসনব সাহেব নিজ মনো-মত স্থান চিরবসন্ত বিবাজিত সিলংয়ে লইয়া গিয়াছেন। গৌহাটি তথাপি এখনও অসামেব মধ্যে প্রধান নগর। গৌহাটির পর তেজপুব; ইহাও দেখি-বার পক্ষে অনুপযুক্ত নয়। আসামেব মধ্যে প্রধান প্রধান নগবেব পবিচয়েব সহিত ব্রহ্মপুত্রেব একটা পবিচয় দেওয়া উচিত। এখানে ব্রহ্মপুত্রেব ভয়ানক দৌরাত্ম্য, ইহাব দৌবাত্ম্যে আজ যেখানে জনাকীর্ণ গ্রাম, সহব, লোকে সুখে সচ্ছন্দে বসবাস কবিতেছে, দেখিবে কিছুদিন বাদে সেখানে আব সে সকলেব চিহ্ন মাত্র নাই, তথা দিয়া এক বিস্তীর্ণ নদী প্রবাহিত হইতেছে। আবার কাল যেখানে নদীগর্ভ আজ সেখানে মাঠ, ঘাট, বাজাব বসিয়াছে। ব্রহ্মপু-ত্রেব ভয়ে আসাম বাসীকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত চিত্তে থাকিতে হয়।

আসাম ভ্রমণ কাবীব পক্ষে অক্টোববেব মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়াবী মাস পর্য্যন্ত পাচ ছয় মাস কাল অতি মনোরম সময়। বর্ষাকালে আসামে কদাচিৎ আসিবে না। ঐ পাঁচ ছয় মাস কাল এখানকাব জলবায়ু যেমন সাস্থ্যকব দৃশ্যও তেমনি মনোহর। প্রাতে ঘন কুয়াসাব মধ্য হইতে পাহাড় পর্ব্বত ও অবণ্যেব ক্ষীণ দৃশ্য হৃদয় ও মনমুগ্ধকারী; মধ্যাহ্নে এখান কার তীক্ষ্ণ সূর্য্যবশ্মিও তেমনি সুখদায়ক; শীতল বায়ু তাহার প্রখবতা নষ্ট করিয়া তাহাকে বড মধুব করিয়া তুলে। শিকাব প্রিয় ইংবেজেবা এই কয়েক মাস এখানে পরমানন্দে কাটাইয়া থাকে।

আসামের অধিবাসীগণ স্বভাবত বড় অলস, অপবিস্কাব, ভীরু ও দুর্ব্বল। আসামের বর্ষা যেমন দীর্ঘ তেমনি কদর্য্য ও ভয়ানক, তাহাব ফলে অধিবাসী গণ সর্ব্বদা জ্বরে চিররুগ্ন। তাহার উপর সোনায় সোহাগা, ইহাবা আফিং, গুলির বড় ভক্ত, প্রজাবৎসল ইংরাজেব কল্যাণে এ সকল লাভেব জন্য তাহাদিগকে বড ভাবিতেও হয় না। পাড়ায় পাড়ায় গুলির আড্ডা; বিক্রেতারা আফিং দ্বারে দ্বারে লইয়াও বিক্রয় করিয়া থাকে। এক্ষণে ভাবুক পাঠক, আসাম বাসী সাধারণ লোকের আকৃতি একবার মনে ভাবিয়া দেখুন দেখি মনে থাকে যেন, গুলিতে জীর্ণ, জ্বরে শীর্ণ দেহ মধ্যে উদরে এক একটি স্ফীত

প্লীহা বিরাজ করিতেছে। জ্বর ও প্লীহা ব্যতীত, উদরাময় আসামবাসীর নিত্য সহচর অনেক ইংরাজকেও ইহার জ্বালায় বিব্রত হইতে হয়। ওলা-উঠারও অনুগ্রহ মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ হইয়া থাকে, গড়ে প্রতি পাঁচ বৎসরে ওলাউঠায় দেশের এক এক স্থান একবারে উজাড় হইয়া যায়। অহিফেন ভক্তেরাই এই অনুগ্রহের বেশী মাত্রা লাভ করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আসামে কুষ্ঠব্যাধি শ্লীপদ এবং গলগণ্ড রোগের সংখ্যা বড় মন্দ নহে। এখানকার জলের দোষে শেষোক্ত দুই রোগে অনেককে ভুগিতে দেখা যায়। আসামের সাধারণ অধিবাসীর এত সুখ।

এত রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও আসামবাসীর ঔষধ পত্র অপেক্ষা মন্ত্র তন্ত্রের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর অধিক রোগ যখন অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, আর মন্ত্র তন্ত্র খাটে না, তখনই ইহারা চিকিৎসকের আশ্রয় লইয়া থাকে কিন্তু এরূপ অবস্থায় আশ্রয় লওয়া না লওয়া তুল্য কথা। মনুষ্যের পীড়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা ত এরূপ গেল; গো, মেষ, মহিষাদি গৃহপালিত জীব-দিগের জন্য ব্যবস্থা আরো চমৎকার. ইহাদিগের কাহারও কিছু হইলে একটা সজীব কোলা ব্যাং কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তবে আসামে একটা এই তারিফ্ দেখিতে পাওয়া যায়. প্রতি পরিবার মধ্যেই বৎসরে দুই এক জনের সংখ্যা হ্রাস হইলেও এখানকার লোকেরা নিষ্কর্ম্মা বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহ ইহাদের উপর অচলা, পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস পায় না।

আসামবাসীগণকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে. সাধারণ এবং ভদ্র শ্রেণী। আসামের ভদ্রলোকগণকে বাঙ্গালী ভদ্রশ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত বিদ্যা বুদ্ধিতে তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু আসা-মের সাধারণ বা নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের বড় দুর্দ্দশা; পূর্ব্বে ইহার কতকটা পরি-চয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর তাহারা ঘোর মূর্খ, কোন প্রকার বিষয় বুদ্ধি তাহাদের মনে আজও ভালরূপ প্রবেশ করে নাই, অথচ বড় একটা কোন ভাবনা চিন্তাও নাই। আসামের ভূমি বড় উর্ব্বরা, আহারের জন্য বড় পরি-শ্রম করিতে হয় না। তবে আর ভাবনা চিন্তা কিসের জন্য? লেখা পড়ার দিকে বড় একটা কেহ যাইতে চাহে না। তবে আজ কাল ইংরা-জের যত্নে আসামেরও অন্ধকার ক্রমে ঘুচিয়া আসিতেছে। আসামে একটা সুখ এই, আসামীগণ যেমন শান্ত শিষ্ট, তেমনি অন্ন চিন্তা না থাকায় এখানে

চুরি ডাকাতিরও বড় ভয় নাই, গৃহস্থকে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধভাবে সতর্ক থাকিতে হয় না। রাত্রে গৃহের দ্বার খুলিয়া সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে কাহারও ভয় হয় না। তবে আসামে ক্রমে ইংরাজি সভ্যতার বিস্তার হইতেছে, কেবল খাইয়া পরিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার দিন ঘুচিয়া ক্রমে অর্থের আবশ্যকতার দিন পড়িতেছে, সুতরাং ক্রমে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না।

আর এক বিষয়ে আসামীদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আসামীদের মধ্যে কেহ আপন নিরাশ্রয় আত্মীয় স্বজনকে ভাসাইয়া দেয় না, ইতর ভদ্র সকলেরই এ বিষয়ে সম দৃষ্টি। যাহার অবস্থা অতি খারাপ, সেও আপন গ্রাসের অর্দ্ধেক অম্লান বদনে আপন আশ্রিত পরিজনকে না দিয়া আহার করিবে না। এই কারণে আসামে যাহার একটু অবস্থা ভাল বা যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট আফিসে কাজকর্ম্ম করিয়া দু, দশ, টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাকে এইরূপ অনুগত আশ্রিত প্রতিপালন করিতে তাহার নিজের আর কিছু সঞ্চয় করিবার যো থাকে না। ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে বাঙ্গালার ন্যায় পরে আসামেও এ প্রথার কিরূপ পরিণাম দাড়াইবে বলা যায় না।

আর এক বিষয়। আসামে এখনও গুরুজনের প্রতি, সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আছে—তাঁহাদের সহিত বিনীত ও নম্র ব্যবহার এবং শ্রদ্ধা ভক্তির এখনও লোপ হয় নাই। Young Bengal এর ন্যায় Young Assam এর সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও দেশময় ছড়াইয়া পড়ে নাই। এখনও তাহারা রাস্তা ঘাটে ব্রাহ্মণ দেখিলে পথ ছাড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। আসামীদের ইংরাজ ভক্তিটারও কিছু বাড়াবাড়ি। রাস্তা ঘাটে ফিরিঙ্গিদের দেখিলেই সেলাম করা, ছাতা বন্ধ করা ও ঘোড়া হইতে নামা রোগ টুকু এখন ও যায় নাই। এই সকল আস্কারা পাইয়া সাহেবেরাও কিছু উপর চালে চলিয়া থাকে।

গোহাটী। গোহাটীতে প্রচুর সুপারি গাছ জন্মিয়া থাকে ও এই কারণে অনেকের মতে এই স্থানের নাম (গুয়া=গুপারি, হাট=বাজার) গৌহাটী হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে সুপারির বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। কামাখ্যা দেবীর মন্দির ব্যতীত গৌহাটীতে আরও বিস্তর দেব দেবীর মন্দির স্থাপিত আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির গৌহাটি নগরের পরপারে নীলাচল পর্ব্বতোপরি স্থিত। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থ-যাত্রী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে এই

তীর্থ স্থানে বিস্তর নরবলি হইত, ইংরেজ শাসনে এক্ষণে এই নিষ্ঠুর কার্য্য রহিত হইয়াছে। আসামে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এই পর্ব্বতে তাহারও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির ব্যতীত মহামুনির আশ্রম কামরূপের একটি প্রধান তীর্থ। ইহা হজু নামক স্থানে (কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে অল্প দূরে) দুই শত হস্ত উচ্চ এক পর্ব্বতের শিখরোপরি স্থিত। আশ্চর্য্যের মধ্যে এই মহামুনি হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েরই আরাধ্য দেবতা। হিন্দুর ন্যায় চীন তিব্বং প্রভৃতি দূর দেশান্তর হইতে যাত্রীগণ এই স্থানে আসিয়া নিজ নিজ পাপ ভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যায়। এই দুইটি ব্যতীত কামরূপ যাইবার পথে আরও অনেক ছোট খাট তীর্থ স্থান আছে, তবে সে গুলি তত প্রসিদ্ধ নয়।

সিলং ;—সিলংএর পরিচয় কিছু পূর্ব্বে নবজীবনে একবার বাহির হইয়াছিল, সুতরাং আর এস্থলে দেওয়া গেল না।

তেজপুর, নৌগং, গোসাঘাট, জোড়হাট, শিবসাগর এবং লক্ষীপুর আসামের এই কয়েকটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। তন্মধ্যে তেজপুরে আসাম-চায়ের আবিষ্কারক চার্লস ব্রুস সাহেবের বাস স্থান। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে তিন হাজার একার ভূমি পুরস্কার স্বরূপ নিস্কর দান করিয়াছেন। ব্রুস সাহেবের চারি পুত্র এবং এক জামাতা এক্ষণে চাকরের কার্য্য চালাইতেছেন। ইহারাই আসামের প্রথম চাকর।

এক্ষণে জোড়হাট শিবসাগর এবং লক্ষীপুর এই স্থানের একটু পরিচয় দেওয়া যাউক।

জোড়হাট ;—ষ্টীমার যোগে এ স্থানে গমন করা যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহানল এ স্থানে স্পর্শিয়াছিল। ইংরাজ-তাড়িত আসাম-রাজের এক পুত্র এই স্থানে ইংরাজের অনুগ্রহ ভিখারী হইয়া বাস করিতে ছিলেন। তিনিই কতিপয় অনুগত লোকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এখান কার মহাপুরুষদের সমূলে নির্ম্মূল করিবার যোগাড়ে ছিলেন; কিন্তু কার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বে সমস্ত মন্ত্রণা শিবসাগরের ডেপুটি কমিসনর কর্ণেল হলরয়েডের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি রাতারাতি রাজকুমারকে কয়েদ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া আসামের প্রাচীন স্বাধীন রাজ বংশের নাম লোপ করিয়া দেন।

শিবসাগর,—শিবসাগর আসামের মধ্যে একটি দর্শনীয় এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। এই স্থানে আসাম রাজের অক্ষয় কীর্ত্তি-চিহ্ন শিবসাগর নামক বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই জলাশয়ের নাম হইতেই এই স্থান শিবসাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ সরোবর দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় দুই মাইলের অধিক হইবে। ইহা যেরূপ সুগভীর, ইহার জলও সেইরূপ পরিষ্কার, ইহার তীরে তিনটি মন্দির, তন্মধ্যে মধ্যকার মন্দির ব্যতীত দুই পার্শ্বের দুই মন্দির নিরেট করিয়া গ্রথিত, তাহাতে দেবতাদি থাকিবার স্থান মাত্র নাই। মধ্যের মন্দির সুবৃহৎ ও উচ্চ। তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ এবং অপরাপর দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত ফুট উচ্চ ও অগ্রভাগ স্বর্ণ মণ্ডিত। অনেকে এই স্বর্ণ লাভের আশায় এই চূড়ার ধ্বজায় বন্দুকের গুলি করিয়াছে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরোবর সম্বন্ধে এখানকার লোকের মুখে অনেক প্রকার প্রবাদ ও জনরব শুনিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, ইহার মধ্যে স্বর্ণের কচ্ছপ আছে। বস্তুত, এই সরোবরের মধ্যে বিস্তর কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্মীপুর,—এই জেলায় কয়লা তৈল এবং চূনের অনেক খনি আছে। ডিব্রুগড়, লক্ষ্মীপুরের সিবিল ষ্টেসন। এখানে ইংরাজেরা বাসকরিয়া থাকে। লক্ষ্মীপুরে বক্রকুণ্ড নামক তীর্থ থাকায় প্রতি বৎসর অনেক যাত্রী এই পবিত্র তীর্থে অবগাহন মানসে আসিয়া থাকে।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের শেষ করিব। বাঙ্গালায় যেরূপ মিসনরি সাহেবেরা প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত করেন, আসামেও সেইরূপ আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিসনের সাহেবের, তথায় প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সূত্র পাত করেন। ইহাঁদিগের চেষ্টায় আসামী ভাষায় অনেক গুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। আসামে এক্ষণে ধীরে ধীরে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে।

শ্রীকালিপ্রসন্ন দত্ত।

সংসার ও সন্ন্যাস।

"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?" আমায় কে ডাকৃছে—আমায় কে টান্‌লে। কে ডাকৃছে—কোথায় ডাকৃছে—কেন ডাকৃছে, তা' জানিনে। প্রাণ চায়, তাই চাই ; কি জন্যে কা'র কাছে কোথা যাই, তাও বুঝ্‌তে পারিনে। দিশে-হারা—লক্ষ্যভ্রষ্ট—আপনা বঞ্চিত—আমি অভাগা। শূন্য প্রাণে শূন্য মনে শূন্যভাবে শূন্য দৃষ্টিতে কোথা যাইতেছি ? কূল নাই, পার নাই, শেষ নাই, সীমা নাই, কা'র উদ্দেশে কি ভাবে বলিতেছি ? দূর—দূর—অতি-দূর অনন্ত। দৃষ্টির বহির্ভূত—কল্পনার অতীত—জ্ঞানের অচিন্ত্য। ভাষায় নাই—বর্ণনায় নাই—উপদেশে নাই। ইহা ভাব রূপ অব্যক্ত। কি ভাবে আমার প্রাণ বিভোর হইল ? কেন আমি বিষয়-মোহে অন্ধ হইলাম ? তা' হইলে ত আর আমায় এমন বিজাতীয় যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হ'ত না ? হায় ! আমায় কে পথ দেখাইবে ? কে উদ্ধার করিবে ? মা জগজ্জননি জগদম্বে ! মাগো, তুই তোর্ অলৌকিক ভুবন মোহিনী বিশ্বেশ্বরী রূপে আমায় একবার দেখা দে। মা, আমি প্রাণ ভরিয়া—আশ মিটায়া তোকে দেখে, আমার পাপ-দগ্ধ জর্জ্জরিত প্রাণ শীতল করি, আপনাকে চিনিয়া লই; আপনার কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হই। মা, তুই কি সত্যই পাষাণী ? না—না, তুই পাষাণী হ'লে তোর ছেলেও ত পাষাণ হ'বে। যে পাষাণ, তার কি চক্ষে জল থাকে ? না মা, আমি জানি, তুই দয়াময়ী—দয়ার অধার-স্বরূপা। তাই বলি, তুই কি তোর অভাগা ছেলেকে কোলে নিবিনে মা ! হায় ? এ অনিবার্য্য আকর্ষণের গতি কোথায় ? এর পরিণাম কি ? এখন যাই কোথা—করি কি ? মাগো ! আর কতকাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে শূন্যে—শূন্যে—মহাশূন্যে ভ্রমণ করিব ? চারিদিকে অন্ধকার—ভীষণ হইতেও ভীষণতর ! এ রাজ্যে সূর্য্য নাই—চন্দ্র নাই—নক্ষত্ররাজি নাই—আলোকের লেশ মাত্র নাই। এ জীবন-উদ্যানে ফুল নাই—ফল নাই—বৃক্ষ নাই—পত্র নাই। এখানে জল নাই—বাতাস নাই—ছায়া নাই—দেহ—এ ভগ্ন-হৃদয় ভীষণ সাহারা মরুভূমি হইতেও ভয়ানক ! ভীষণ নৈরাশ্যের করাল-ছায়া করাল-মুখ ব্যাদান করিয়া যেন অট্টহাস্যে আমায় সদাই গ্রাস করিতে আসিতেছে। কোথায় যাই—কি করি ? এক দিকে সংসারের মোহিনী আকর্ষণ, অন্যদিকে বৈরাগ্যের মধুর আহ্বান ! এক দিকে

কামিনী কাঞ্চনের অব্যর্থ প্রলোভন, অন্যদিকে আত্ম-ধর্ম্ম-নিরত মনীষা-সম্পন্ন মহাত্মাগণের অমূল্য উপদেশ। এক দিকে ধর্ম্মের মৃদু গম্ভীর রব, অন্যদিকে বহুলোক সমাকীর্ণ বিষয়ীর বিষয়-ভেরীর গভীর নিনাদ! এক দিকে শান্তির প্রাণস্নিগ্ধকর স্বর্গীয় ছবি, অন্যদিকে মহাবিপুগণের তীব্র উত্তেজনা। একদিকে একজনে বিমল আনন্দ-বিভোর প্রাণে ডাকিতেছে, অন্যদিকে বহু বিষয় মদিরাপানোন্মত্ত সংসার-কীট তাহার বুদ্ধি-বৃত্তিতে তীব্রভাবে দংশন করিতেছে। এখন আমি কোন পথে যাই? দুই উন্মত্ত মাতঙ্গের মধ্যস্থলে আমি, 'জলে কুমীর—স্থলে বাঘ', কোন পথে যাইলে রক্ষা পাই? হায়। কে বলিবে? মানুষ? না—না, মানুষ দুর্ব্বল—চির দুর্ব্বল; সে আপনার ভাবে আপনি অস্থির, আপনার স্বার্থ লইয়া সে সদাই ব্যস্ত। সে জানিলেও কি বলিয়া দিবে? তাই ডাকিতেছিলাম, --মা। সর্ব্বমঙ্গলে দুর্গতিনাশিনী অভয়ে!—"বল্ মা তারা দাড়াই কোথা?"

এ আত্ম-বিস্মৃত উন্মত্ত ভাব শুধু আমার নয়।—যখন প্রাণে প্রথম বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয়, তখন মানুষ মাত্রেরই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। ঘটনা স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাতে যখন উপর্য্যুপরি প্রাণে নৈরাশ্যের বিকট ছায়া পতিত হয়, তখন মানুষের মন এই ভাবে বিভোর হইবেই; ইহা প্রকৃতির নিয়ম,—ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তা' কি ভাল বিষয়ে—কি মন্দ উদ্দেশ্যে। অভাব মানুষের চির সহচর। এই অভাব যখন মানুষের অন্তঃস্থলে প্রবল-রূপে আঘাত করে,—একবার নয়—দুইবার নয়—পুনঃ পুনঃ যখন প্রত্যেক বিষয়ে, –প্রত্যেক ঘটনায়, –কখন ধন মান, কখন প্রেম প্রীতি,—কখন বিষয় বিভব, প্রত্যেক কার্য্যে—কখন পাশব ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভাবে যখন বার-ম্বার 'যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে,—তখন দুর্ব্বলচেতা মানুষ অধীর হয়—উন্মত্ত হয়—প্রলাপ বকে, এমন কি সময়ে সময়ে আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই সময়—এই সমস্যায়—এই ঘটনা স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে আবার কেহ কেহ এমনও হইয়া থাকে, যাহার আদর্শ জীবন মানব-জগতে শীর্ষস্থানেও উপনীত হয়।' যে বেশী পাষণ্ড, সে যদি ঈশ্বর পরায়ণ হয়, তবে তাহার প্রতিভা—তাহার সুযশ সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এখন সে কথা যাক। বৈরাগ্যের এই প্রথম অবস্থা' বড়ই জটিল—বড়ই সমস্যা পূর্ণ, বড়ই রহস্যময়। এই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, মানুষের ভাগ্য বড়ই শুভপ্রদ হয়। কিন্তু হায়! কয়জনের অদৃষ্টে এ সুপ্র-

সাদ ঘটিয়া থাকে? যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অনন্ত কিরণ সম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের অতুল জ্যোতির নিকট অতি ক্ষুদ্রতর কণা পরিমিত দীপ-শিখায় কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ সংসারের অসীম ধন-জন-সমাকীর্ণ, বহু ভোগ-বিলাস দ্রব্যপূর্ণ, কমনীয় কামিনীর বিলোল কটাক্ষ, রত্ন কাঞ্চনের মোহিনী আকর্ষণের সহিত, প্রথম বৈরাগ্যের অতি দূর—অস্পষ্ট অদৃশ্য—অথচ অপূর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন মাহাত্ম্যের কোন কার্য্যই বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। এক আধ জনের ভাগ্যে যাহা মিলিয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র, তাহাতে সাধারণ নিয়ম খাটিতে পারে না। তাই বলিতে ছিলাম, বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ইহাতে জ্ঞানের লোপ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির চালনা থাকে না, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দূরে পলায়ন করে, প্রাণ অস্থির হয়। কোন কার্য্যে—কোন বিষয়ে মন স্থির থাকে না—এ অবস্থা—এ গভীর সমস্যার কাল না গৃহী—না সন্ন্যাসী! তাই বলিতেছিলাম, ভাই, তুমি যদি কখন এ হেন কঠিন সমস্যায় পতিত হও, তবে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, তুমি একদিন প্রাণের ব্যাকুলতায় অধৈর্য্য হইয়া নিশ্চয়ই নির্জ্জনে বালকের ন্যায় অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিবে, আর মুখে তোমার উপাস্য দেবতার নাম করিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রকৃতি বা শক্তিকে ডাকিবে। উপাসক হও, তবে বলিবে,—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"?

প্রকৃত সংসার বা সন্ন্যাস উভয়ই কঠিন ধর্ম্ম ও কঠিন আশ্রম! প্রকৃত সংসারী বা সন্ন্যাসীর দায়িত্ব অতি কঠিন। ইহ সংসারে এ দুয়েরই অভাব বিশেষরূপ বিদ্যমান। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সঙ্গত প্রকৃত সুখী বা সন্ন্যাসী হইতে হইলে কত ত্যাগ স্বীকার—কত সহিষ্ণুতা—কত অধ্যবসায়—কত তিতিক্ষা-কত সৎগুণের প্রয়োজন, তাহা নিম্নলিখিত কোন সাধুপ্রমুখাৎ শ্রুত এই গল্পটী আলোচনা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গল্পটির সারাংশ এই ;—

কোন মনীষা সম্পন্ন ঋষিতুল্য মহাত্মার দুইটি শিষ্য ছিল। শিষ্য দ্বয় বাল্য কাল হইতেই গুরুগৃহে থাকিয়া তদীয় ব্রহ্মচর্য্যরূপ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অপনা আপন প্রতিভাবলে অতি অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু কেবল মাত্র শাস্ত্রালোচনা করিলে ব্রহ্মচর্য্যার প্রকৃত মহত্বের পূর্ণ বিকাশ বা সেই কঠোর ব্রতের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন হয় না। যে যে মহৎ দ্রব্যগুণের সংস্পর্শে ব্রহ্মচর্য্যরূপ জ্বলন্ত আগুণের সৃষ্টি হয়, তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল দ্রব্যের কোন কোন অংশের অভাব বা

অসম্পূর্ণত্ব ছিল। শিষ্যদ্বয় সে অসম্পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের গুরুদেব কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি শিষ্যদ্বয়ের বিদায় কালে একটু ইতস্তত করিয়া কৌশল পূর্ব্বক কহিলেন যে, অমুক রাজ্যের অমুক রাজকন্যার নিকট গমন করিলে, তিনি তাঁহাদের উপযুক্ত আশ্রম অবলম্বনের কথা বলিয়া দিবেন। অর্থাৎ শিষ্যদ্বয় গার্হস্থ্য কি সন্ন্যাস আশ্রমীর যোগ্য, তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

শিষ্যদ্বয়ও উক্ত কথা মত গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া রাজকুমারীর উদ্দেশে সেই রাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। তাঁহারা আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অরণ্যের মধ্যে লোকালয় মিলিবে কিরূপে? সুতরাং তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া সেই বন মধ্যস্থ একটি সুবিস্তৃত বৃক্ষের তলে পর্ণ শয্যা রচনা করিয়া রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বৃক্ষ শাখায় শুক ও সারী স্ত্রী-পুরুষে নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সারী কহিল,—"দেখ, ইহারা আমাদের আশ্রমে অতিথি হইয়াছে,—সমস্ত দিন উপবাসী, অতএব আমাদের সাধ্যমত অতিথি সৎকার করা প্রয়োজন।"

শুক উত্তর করিল,—"তা' সত্য বটে, কিন্তু আমরা সামান্য বিহঙ্গ হইয়া মানুষের কি উপকার করিতে পারি?"

সারী,—"না পারিই বা কি? আমরা একটু চেষ্টা করিলেই ত অনায়াসে আগুনের উপযোগী কোন পদার্থ আনিয়া দিতে পারি, তারপর ইহারা আহারের যোগাড় করিয়া লইতে পারিবে।"

তাহাই স্থির হইল। শুক স্থানান্তরে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃহৎ চঞ্চু দ্বারা একখণ্ড অগ্নিজনক পদার্থ আনিয়া বৃক্ষের নিম্নদেশে ফেলিয়া দিল, অতিথিদ্বয় অরণ্যের শুষ্কপত্র একত্রিত করিয়া তাহা দ্বারা আগুণ প্রস্তুত করিল। কিন্তু অনেক অন্বেষণেও আহার মিলিল না দেখিয়া, তাঁহারা বিষন্ন অন্তরে বসিয়া রহিলেন।

সারী শুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আগুন হ'ল বটে, কিন্তু এরা এখন খায় কি? আমাদের ত গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন করা চাই;—এক্ষণে যে কোন উপায়ে হোক, অতিথি সৎকার করিতেই হইবে। অতএব আমি এই আগুনে পুড়িয়া মরি, তাহাতে এরা এক প্রকার আহারের সংস্থান

করিতে পারিবে।" শুক উত্তর করিল,—"তুমি যদি যাও, তবে আমারই বা বেঁচে থেকে কি লাভ! আর বিশেষত এরা দেখ্‌ছি দু'জন, তোমার একার মাংসেই বা দুজনের কি হ'বে। অতএব আমিও দেহত্যাগ ক'রে অতিথির সেবা করি।" তাহাই স্থির হইল,—উভয়েই এক সময়ে প্রজ্জলিত আগুনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অতিথি সৎকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল। সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, কত ত্যাগ-স্বীকার—কত সহিষ্ণুতা—কত ঔদার্য্য—কত মহত্ত্ব দেখাইতে হয়, তাহার অসাধারণ কীর্ত্তি ও অলৌকিক আদর্শ রাখিয়া শুকসারী সংসারীর ও সংসার ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষার স্থানীয় হইল।

নির্দ্দিষ্ট আশ্রম অবলম্বনে অভিলাষী হইয়া শিষ্যদ্বয় রাজকন্যার উদ্দেশে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজপথের একস্থানে বিস্তর জনতা ও পরস্পরের মধ্যে বচসা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা কিছু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার কারণ নির্ণয়ে উৎসুক হইয়া লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, সেই নগরের রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে ঈদৃশ লোকারণ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। নৃপতি কন্যার অঙ্গীকার এই যে, যে কোন ব্যক্তি অত্যুষ্ণ এক কলস জলে স্নান করিয়া, বেশ আরামের সহিত অবস্থান করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।

শিষ্যদ্বয় এই অবধি শুনিয়া দ্রুতপদে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সর্ব্ব শ্রেণীরই অসংখ্য লোক তথায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারাও একস্থানে দাঁড়াইয়া এই কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অনেকেই, রাজকন্যা লাভ করিব ও রাজ-জামাতা হইব ভাবিয়া, উষ্ণ জল পাত্রের নিকট গমন করে, আর স্পর্শ করিতে না করিতেই সন্ত্রাসে পশ্চাৎ পদ হয়। এইরূপে সর্ব্বগুণসম্পন্না পরম রূপবতী স্ত্রী রত্ন লাভে লোলুপ হইয়া রাজাধিরাজ রাজকুমার হইতে ইতর শ্রেণীর চির দরিদ্রাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

লগ্ন উত্তীর্ণ প্রায়,—কন্যার দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না দেখিয়া রাজপিতা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। এই সময়ে অকস্মাৎ এক গৈরিক বসনধারী, বিভুতি পরিলেপিত, দণ্ড কমণ্ডলু শোভিত—সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার সমস্ত গাত্রবস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক রাজ-

কন্যার প্রতিজ্ঞানুযায়ী সেই অত্যুষ্ণ জল-কলস লইয়া অবলীলাক্রমে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া রীতিমত স্নান করিলেন। সভাস্থলে উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিক হইতে মাঙ্গলিক প্রথানুযায়ী শঙ্খ ও হুলুধ্বনির গভীর নিনাদ গগণ-মার্গ ভেদ করিল। অমনি অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ হৃষ্টচিত্তে সুসজ্জিতাবস্থায় নানা প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য নব জামাতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ এবম্বিধ পার্থিব সুখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। অমনি অসংখ্য রাজপুরুষ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অতি বিনম্র বচনে বিবাহে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি যখন কোন ক্রমেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন সকলে বল পূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিল।

বেগতিক দেখিয়া সেই আত্ম-চিন্তা-নিরত মহাপুরুষ উদ্ধশ্বাসে—যেন প্রাণের দায়ে, বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুরুষগণ কেহ, অশ্বারোহণে কেহ গজারোহণে তাঁহার অনুসরণ করিল। বিবাহ সভায়-সমাগত উপস্থিত দর্শকবর্গও তাহাতে যোগ দিল।

অনেক পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি নিভৃত পর্ণ কুটীরের সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ধৃত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব্বোক্ত শিষ্যদ্বয়ও এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ সভায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি তাঁহাদের অন্তরে কিছু বিস্ময় ও অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়া আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

রাজ পুরুষেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া বিনয় বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "কেন বাপ তোমরা নিরর্থক আমাকে কষ্ট দাও? আমি রাজকুমারীর পাণি গ্রহণাভিলাষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি নাই। দেখিলাম, সকলেই রণে ভঙ্গ দিতেছে, তাই কৌতূহল বশত—উষ্ণ জলে স্নান করিলে কিরূপ আরাম পাওয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এই মাত্র। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহে বা রাজৈশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? কামিনী কাঞ্চন সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রবল শত্রু। অতএব তোমাদের অনুনয় করিতেছি, আমাকে আর বিরক্ত

করিওনা।" রাজ অনুচরগণ বিফল মনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন।

শিষ্যদ্বয় কিছু কৌতূহলভাবে অথচ হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"প্রভু। আপনি ও রাজকুমারী ত বিবাহ-ব্যাপারে মত্ত, এক্ষণে আমরা কাহার নিকট আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হই?—কে আমাদের উপযুক্ত আশ্রম অবলম্বনের কথা বলিয়া দিবে?"

পূর্ব্বোল্লিখিত শুকদেব তখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"কেন বাপু তোমাদের আশ্রম অবলম্বনের কথা ত বলা হইয়াছে! যদি সংসারী হইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে চাও, তবে অরণ্যমধ্যস্থ সেই শুক সারীর বিষয় চিন্তা কর,—আর যদি সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতে বাসনা থাকে, তবে উপস্থিত যাহা প্রত্যক্ষ করিলে, এই মত কার্য্য করিও।"

শিষ্যদ্বয় তখন নির্ব্বাক, বিস্মিত ও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে সবিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"প্রভু যথেষ্ট হইয়াছে, আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। বুঝিলাম, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের এখনও অবসান হয় নাই। চলুন গুরুদেব, আপনার আশ্রমে ফিরিয়া যাই। সংসার ও সন্ন্যাস, এ দুই আশ্রমের মধ্যে আমরা কোনটিরও উপযুক্ত নহি। অদ্যাবধিও আমরা সংসার ও সন্ন্যাস এ উভয়ের কোন ধর্ম্ম পালনের অধিকারী হই নাই।"

গল্পটির মধ্যেই বড়ই মর্ম্মভেদী জীবন্ত সত্য ও অলৌকিক শিক্ষার বীজ নিহিত আছে। শুক সারীর মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাই প্রকৃত সংসার-আশ্রমের কার্য্য—তাহাই সংসারীর ধর্ম্ম। কত সহিষ্ণুতা, কত ত্যাগ স্বীকার, কত ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, তবে সংসার ধর্ম্ম পালন করা যায়—তবে সংসারী হইবার সামর্থ হয়! অতিথি সেবায়—শরণাগতকে রক্ষার জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। আর রাজ কন্যার বিবাহ ঘটনাটির মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষী-ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস ধর্ম্মের অবলম্বন—তাহাই সন্ন্যাসীর লক্ষ্য। যখন পরমার্থ-পদ সার করিবে, তখন যদি পরম রূপবতী ও সর্ব্ব-গুণান্বিতা মহিষী লাভ করিয়া রাজরাজেশ্বর পদও পাওয়া যায়, তাহাও তুচ্ছ করিবে,—অধিক কি, সামান্য তৃণের ন্যায় ভাবিয়া তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিবে না। এই ত শিক্ষা—এই ত উপদেশ—এই ত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম! কিন্তু হায়! সংসারে আজ কি ভীষণ হলাহল স্রোত উঠিয়াছে।

ঈদৃশ কঠোর দারিদ্র ভার বহন করিয়া কয় জন সংসারী বা কয়জন সন্ন্যাসী কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন? ঈদৃশ অমূল্য গুণসম্পন্ন সংসারী বা সন্ন্যাসী জগতে কয় জন মিলে? ঈদৃশ অসামান্য গুণের পূর্ণ অধিকারী সংসারে কয় জন পাওয়া যায়? এত সহিষ্ণুতা—এত ত্যাগস্বীকার করিয়া, এত প্রলোভন-জাল ছিন্ন করিয়া, কে সংসার বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে? তাই জগজ্জননী—জগৎপূজ্যা শঙ্করীকে জানাইতেছিলাম, "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

মা! আমি দুর্ব্বল—মহাদুর্ব্বল! আমার সাধ্য কি মা যে, আমি এই গভীর উপদেশ ও জীবন্ত সত্যের অধিকারী হইয়া, সংসার বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইব? আমি সংসারে কীটাণুকীট—ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর;—আমি সংসার আশ্রমের বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত,—স্বার্থ সাধনে অন্ধ। আবার অন্যদিকে আমি কঠোর সন্ন্যাসের ভণ্ড ভেকধারী মাত্র! তবে মা! আমি কোন্ পথে যাই?—কোথায় দাঁড়াই, কি অবলম্বন করি? দুই দিকেই আমার প্রাণ টান্‌ছে—আমায় কে ডাক্‌ছে, অথচ কোন দিকেই যেতে পাচ্ছি না। বলে দে মা,—জগদম্বে! আমি কোন্ পথে যাই—কি অবলম্বন করি? হৃদয়ে বল দে মা! কর্ত্তব্য পথ চিনিয়ে দে মা! প্রাণে শান্তি জল সিঞ্চন কর্ মা! মা! তোর ঐ রাতুল চরণ দু'খানি আমার বুকে চাপিয়ে দে মা, আমি উদ্ধার পাই! হায় কোথায় যাই—করি কি? কে জ্ঞান-চক্ষু দেয়,—কে এ মায়া-যবনিকা ভেদ করে,—কে সত্য পথে লইয়া যায়? আমি না গৃহী, না সন্ন্যাসী। এ দুয়ের কোনটিরও উপযুক্ত নই, অথচ আমার প্রাণ কে টান্‌ছে—আমায় কে ডাক্‌ছে, তাই এ মহা সমস্যায় পড়িয়া গভীর আঁধারে ডুবিয়া—ভীষণ ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পৌরাণিক-প্রশ্ন।

মহাশয়, কালী-সিংহের মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্ব হইতে দুইটী আখ্যায়িকা সংক্ষেপে তুলিতেছি। পাঠক তাহাদের ঔচিত্যানুচিত্য বুঝুন, আমারও মন্তব্য আমি বলিব।

শান্তিপর্ব্বে আছে;—"চিরকারী গৌতমের পুত্র। গৌতম-পত্নী অহল্যা ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্তা হওয়ায় তাঁহার স্বামী পুত্র চিরকারীকে জননীকে হত্যা করিতে আদেশ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। চিরকারী অনেক দিন বিলম্ব করিয়া পিতা মাতার গুণাগুণ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শেষে বিবেচনা করিলেন মাতা গুরুতর, অতএব এতাদৃশী মাতাকে কি প্রকারে বধ করি? অথচ, পিতৃ আজ্ঞাপালন না করা মহাপাপ, এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে গৌতম বাটী আগমন করিলেন। তখন পিতা পুত্রকে মাতৃ বধে বিলম্ব করিয়াছে দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "পুত্র। অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়াছ।" আবার অনুশাসন পর্ব্বে দেখুন,—"অগ্নির পুত্র সুদর্শন মৃত্যুকে পরাজয় করিবার মানসে সদা অতিথি সেবা পরায়ণ ছিলেন। এক দিন তিনি বনে কাঠ কাটিতে যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রী ওঘবতীকে বলিয়া যান, যে, আমার গৃহে, দেখিও, কোন অতিথি কোন অভিলাষ করিয়া আসিলে তাহা যেন পূরণ হয়।' ইত্যবসরে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতীর নিকটে অতিথি হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।" ওঘবতী তদীয় স্বামীর নিদেশ পালনার্থ ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছে, এমন সময় সুদর্শন বাটী আইসেন। তিনি ইহা অবগত হইয়া কিছুই ক্ষুণ্ণ হইলেন না। ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের বেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার এই স্ত্রী সাধ্বী পতিব্রতা। ইহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরিণত এবং অপর অর্দ্ধ তোমার অনুগামী হইবে এবং তুমি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ।" তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রথ পাঠাইয়া সুদর্শন ও ওঘবতীকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।'

পাঠক! কেমন দুটী মজার বিসম্বাদী গল্প শুনিলে। এখন, চিরকারী পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া দোষী হইলেন, না ওঘবতীস্বামীর আদেশ পালন

কবিয়া পুণ্য সঞ্চয় কবিলেন ? স্থিব করুন। পরশুবাম পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ মাতৃবধ কবিয়াছিলেন, সত্য। তাই বলিয়া, চিবকাবী সেই ঘোব মহা-পাতকে লিপ্ত হন নাই, তজ্জন্য তিনি কি অপবাধী হইতে পাবেন ? কথনই নয়। চিরকাবীব গল্প হইতে ববং আমবা এই উপদেশ পাই যে, যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহুবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান কবে, তাহাকে সন্তাপসাগবে নিমগ্ন হইতে হয় না। ভীষ্মেব মুখে যুধিষ্ঠিব এই সাবগর্ভ কথাটী শুনিয়াছিলেন। কোন্ হৃদযবান ব্যক্তিই বা উপদেশটিব সাব-বত্তা উপলব্ধি না কবেন। আর কোন বাপই না, এমন বিচক্ষণ পুত্রেব প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন ? কিন্তু ওঘবতীব আখ্যায়িকা শুনিলে, পাঠক, তুমি কি কাণে আঙ্গুল দিবে না ? এমন কি পতিব আজ্ঞাপালন, যে আপনাকে নিব-যগামী কবিতে হইবে। ওঘবতীব পাতিব্রত্যকে ধন্য ! ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মকে ধন্য ! পতি সুদর্শনকে ধন্য। তাহাব মৃত্যু পবাজয়কে ধন্য। এবং তাহাদেব দুজনকাব স্বর্গ যাওয়াকেও ধন্য ! অধিক আব কি বলিব ?

[উপবে প্রকাশিত প্রশ্নে বা ধন্যবাদে ওঘবতীব উপাখ্যান আক্রান্ত হইযাছে। এই প্রশ্নেব বা সমস্যাব কেহ মীমাংসা লিখিযা পাঠাইলে, আমবা তাহা আদবে নবজীবনে প্রকাশিত কবিব। নবজীবন সম্পাদক।]

ভারতে ব্রাহ্মণ বাস।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ভারতের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা তাতারের নিকটবর্ত্তী স্থান বিশেষ হইতে আগমন করিয়া ভারতীয় পার্ব্বত্য জাতিদিগকে পরাজয় করিয়া ভারতে বাস করিয়াছেন। শূদ্রজাতিই ভারতের প্রকৃত আদিম বাসী। যে সকল পার্ব্বতীয় জাতি ব্রাহ্মণাদির অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শূদ্রনামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করেন। শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের বিসদৃশ ঘৃণা ও অত্যাচার, কতকগুলি ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য, কতকগুলি জাতির আকৃতির সহিত ভারতীয় গণের সাদৃশ্য এবং বাইবেল কথিত প্রলয়ের বৃত্তান্ত—ঐ সকলের প্রমাণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করিয়া তাঁহারা নিতান্ত ইতিহাসবিরুদ্ধ ও অসম্ভব এই বিবরণ সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, ইতিহাস মধ্যে আজি কালি উহা বিলক্ষণ স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।

সত্য বটে, আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস নাই, কিন্তু এই ঐতিহাসিক ব্যাপার যে কালে সংঘটন হইয়াছিল অনুমান করা হইয়াছে, কোন দেশের সেকালের ইতিহাস নাই।

অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস পৃথিবীর কোন দেশেরই নাই; যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র; নব্য পণ্ডিতগণ সকল দেশেরই প্রাচীন কালের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু সে উপকরণ ভারতে যত অধিক পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেন না ভারতে প্রাচীন কালের গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এত প্রাচীন কালের গ্রন্থ কোন দেশেই নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন, বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ কোনও দেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না সুতরাং প্রাচীন কালের কোন ইতিহাস বিশ্বাস করিতে হইলে ভারতের ইতিহাসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু আমরা ভারতীয় কোন গ্রন্থেই এরূপ আভাস পাই না, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণাদি অন্যদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন। যদি উহা সত্য হইত, তবে কোন না কোন স্থানে এরূপ আভাস থাকিত। অনেকে বলেন বেদাদি

গ্রন্থে উক্তরূপ কথা অনেক আছে। উদাহরণ স্বরূপ তাহার দুই একটীর বিষয় বলা যাইতেছে। শতহিম জীবিত থাক, বলিয়া যখন আশীর্ব্বাদ করার রীতিছিল, দেখা যাইতেছে, তখন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কোন হিম প্রধান দেশে তাঁহাদের বাস ছিল। যখন সোমরস দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, তখন যে দেশে সোমরস ছিল, সেইদেশে অবশ্য তাঁহাদের বাস ছিল। এই প্রকৃতির নানা প্রমাণ তাঁহারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি "শতহিমং জীবতু" বাদীরা হিমপ্রধান বাসী হয়েন। তবে যে বঙ্গবাসীরা "এক মাঘে জাড় পালায় না" বলিয়া প্রত্যেক আবশ্যকীয় কথার সহিত তুলনা দেয়, তাহাদের বাসও অবশ্য কোন হিমপ্রধান দেশে হইবে। আমরা প্রত্যেক কথারই খণ্ডন করিতে পারি কিন্তু প্রবন্ধের অত্যন্ত বিস্তার ভয়ে তাহা করিতে ক্ষান্ত হইতে হইল। যখন বেদাদি সকল গ্রন্থেই একই ভাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এক স্থান হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মার অঙ্গবিশেষ হইতে উৎপন্ন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে পাশ্চাত্য গণের উক্ত বাদ, আমাদের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল অনৈতিহাসিক নহে অপ্রামাণিক। কেননা যে ভারতে সর্ব্বোচ্চ গিরি সমূহ, বিস্তৃত নদী, ভীষণ মরুভূমি, সুশ্যামল সমতলক্ষেত্র, ভীষণ জলপ্রপাত, বিবিধ প্রকার জীব ও উদ্ভিদ, সর্ব্বপ্রকার বস্তু এবং সুখজনক সমুদয় সামগ্রী ও শোভাময় নানা পদার্থ অবস্থিত, সেই পৃথিবীর সর্ব্বপদার্থের আদর্শ স্বরূপ সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে সুবুদ্ধি মানব উৎপন্ন হয় নাই। যেখানে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ পদার্থের উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানে সুবুদ্ধি মানবের উপাদান নাই! ঐ সকল সৃষ্ট উপাদন হইতে কি কেবল পশুতুল্য বনমানবেরই উৎপত্তি হইল? এই কি ভারতের উর্ব্বরতার গুণ? আমার বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ভারতের জল বায়ু, উর্ব্বরতা ও সর্ব্বসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াই অতি প্রাচীন কালে ভারতবাসী এত সভ্যতা ও উন্নতি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না যে এমন উর্ব্বর ক্ষেত্র কি জন্য সুফল শূন্য হইল? দেশের প্রাকৃত শক্তি বলে ভিন্ন দেশীয়েরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা পাইল, আর সেই দেশের সেই অদ্ভুত শক্তি হইতে কেবলমাত্র কতকগুলি বর্ব্বরজাতির স্থিতি সাধন হইল। এমন বর্ব্বর যে তাহারা বহুকাল ব্যাপিয়া সভ্যতম

ব্রাহ্মণাদির প্রতিযোগী হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি করিতে পারিল না। ভীল, কুকি, গারো প্রভৃতি জাতি কি এখনও পশুতুল্য নহে? জানি না, কোন্ যুক্তির বলে এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যগণ ব্রাহ্মণাদির জ্ঞাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদির কোন বিষয়েই মিল নাই। কি বেশবিন্যাশ, কি আহারপ্রণালী, কি আচার ব্যবহার, কি গার্হস্থ্য প্রণালী, কি ধর্ম্মপ্রক্রিয়া, কি রীতিনীতি—কোন বিষয়েরই পরস্পরের ঐক্য নাই। ঐক্যত দূরের কথা, সকল বিষয়েই পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীত বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া চিরকাল ঘৃণা করিয়া থাকেন। এই অধঃপাতিত অবস্থাতেও তাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণের কাছে ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকেন। এক বংশের সন্তানগণের মধ্যে কি এত প্রভেদ সম্ভব বিবেচনা করা যায়? আমাদের বোধ হয়, কখনই না। এক হইলে কোন না কোন বিষয়ে অবশ্য মিল থাকিত। কোন বিষয়েই যে মিল নাই, তাহা আমাদের দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান হয় না। বারান্তরে তাহার চেষ্টা করিব। এ প্রবন্ধে তাহার আবশ্যকতাও নাই; কেন না, যে প্রমাণবলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সত্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যদি যুক্তিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে, আমাদের কোন প্রমাণই দিতে হইবে না, তাহা হইলেই আমাদের ঐ চিরপ্রচলিত বাদই সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক, পাশ্চাত্যগণ এই সত্য স্থাপন করিবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার বল কত।

তাঁহাদের এক যুক্তি এই যে, ভারতীয় দ্বিজগণ শূদ্রগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করেন, জেতৃ জাতি বিজিত জাতির উপর যেরূপ অত্যাচার করে, সেইরূপ অত্যাচার করেন। তাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, শূদ্র এদেশের আদিম জাতি, দ্বিজ অন্যদেশ হইতে আগমন করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। শাস্ত্র-লিখিত দেবাসুরের যুদ্ধ ব্যাপারকে দ্বিজ ও আদিম বন্য জাতির যুদ্ধ এবং দস্যু শব্দ হইতে দাস শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি শূদ্রদিগকে নীচ বৃত্তিজীবী দেখিয়া আদিম বিজিতজাতি বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় মুসলমানদিগকেও আদিম ও বিজিত জাতি বলিতে হয়।

হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ তাহাদের স্পর্শমাত্রে আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন, এবং দেশে যত নীচ শ্রমসাধ্য কার্য্য, তৎসমস্তই মুসলমানের বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট, সম্ভ্রান্ত সমস্ত কার্য্যই হিন্দুর একচেটিয়া বলিলেই হয়। অতি অল্পদিন মাত্র মুসলমানের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তৎস্থানে সমদর্শী ইংরাজ জাতি রাজপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানের এই দুর্দ্দশা। যদি হিন্দু আপন রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারিত, তাহা হইলে আর শত বর্ষ পরে কি মুসলমানের অবস্থা নিতান্ত শীর্ণ হইত না? সে সময়ে মুসলমানের সেই অবস্থা দেখিয়া মক্ষমূলের ন্যায় পণ্ডিতগণ এই যুক্তি অবলম্বনে অবশ্যই বলিতেন, মুসলমানেরাই ভারতের আদিম নিবাসী। হিন্দুরা বিদেশ হইতে আসিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব এযুক্তি নিতান্ত অসার। ইহাদ্বারা বিপরীতই সপ্রমাণ হয়। মুসলমানের উদাহরণ গ্রহণ করিলে শূদ্রদিগকেই বিদেশ হইতে আগত বলিয়া বোধ হ ত পারে। বোধ হয়, কিছুকাল তাহারা যবন দিগের ন্যায় এদেশে আ ত্য করিয়া পরিশেষে বিজিত ও দুরবস্থা-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমা তাহাও বোধ হয় না। কেননা শূদ্রগণ আবহমান কাল দ্বিজাতির তি যেরূপ আন্তরিক ভক্তিকরে এবং দ্বিজগণ শূদ্রকে বিশ্বাস করিয়া যেরূ য়ত পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, জেতৃ ও বিজিত মধ্যে কখন এরূপ ভাব হইতে পারে না। নিতান্ত সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিলেও কখন জেতৃ ও বিজিতের মধ্যে এরূপ ভাব জন্মিতে পারে না। কিন্তু দ্বিজাতিগণ কখনও তাহাদিগকে আপনাদের তুল্য ভাবেন নাই, নিয়তই তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছেন, অতি নিকৃষ্ট কার্য্য তাহাদিগের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এই ভয়ানক বিসদৃশ ব্যবহারেও জেতৃ ও বিজিতের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব হইল,—ইহা কি প্রকৃতি-সম্মত না ইতিহাস-সম্মত? কোন্ যুক্তি ইহার পোষকতা করিতেছে—কোন ইতিহাস ইহা সমর্থন করিতে পারে? কেহ কেহ বলেন, শূদ্রেরা বাস্তবিকই মনের সহিত দ্বিজাতির সেবা করিত না। অক্ষমতা নিবন্ধনই করিত ও কালে অভ্যাস বশত তাহাদের তাহা সহ্য হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহারা দ্বিজাতির বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত সমান হইবার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় একথা

কেননা পাশব শাসনে কখনও মানবকে চিরকাল এরূপ

নীচভাবে শাসন করিয়া রাখিতে পারে না। কোন দেশের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি বলেন শূদ্রগণ মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণদের সহিত সমান হইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাহাদের নয়। এক্ষণে যেমন পুরুষগণ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ সময়ে সময়ে দ্বিজাতিগণও শূদ্রকে আপনাদের সহিত সমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাক্যসিংহ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যিনি যিনি বর্ণভেদ রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই দ্বিজকুল সম্ভূত। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারক রামমোহন রায় প্রভৃতিও দ্বিজ সন্তান। কোন কোন শূদ্র সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু কেহই আপনাদিগকে অত্যাচারিত মনে করি[illegible] নিজে সমাজ বিরোধী হয়েন নাই। জেতৃ ও বিজিত জাতির মধ্যে এরূপ অপ্রাকৃতিক ও অনৈতিহাসিক ব্যাপার নিতান্ত অসম্ভব সুতরাং এযুক্তি এককালে সারবত্তা হীন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিগণের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে লাটিন,গ্রীক হিব্রু প্রভৃতি ভাষার সহিত সংস্কৃতের অনেক শব্দের মিল আছে সুতরাং ঐ সকল ভাষীগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ অবশ্য এক ভা[illegible]ছিলেন। আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের এ যুক্তিও নিতান্ত অসার। কেন[illegible] আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালা অনেক শব্দের সহিত পারস্য ভাষার অনেক শব্দের উক্ত প্রকার মিল দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, দরগা দুর্গা,—প্যাগম্বর দিগম্বর,—কোরাণ, পুরাণ,—রহিম রাম,—মহম্মদ মহাদেব,—ভেস্ত বিষ্ণু,—মহরম মহোৎসব—এই সকল শব্দ আমরা আধুনিক শব্দবিদ্যা প্রণালী অনুসারে বিচ্ছেদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ভয়ে নিরস্ত হইলাম। এই সকল শব্দের ঐক্য দেখিয়া কি হিন্দু ও মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষগণকে একভাষী বলিতে হইবে? বাস্তবিক ভাষা তত্ত্বানুসারে, বাঙ্গালী, ইংরেজ, জর্ম্মান ও মার্কিনদিগের পূর্ব্বপুরুষ এক ছিলেন, না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুতরাং এ যুক্তিতেও আদৌ সারবত্তা নাই।

উপরোক্ত পণ্ডিতগণ "আর্য্য" শব্দের উপর প্রবল বল প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী যখন ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন ছিল, যখন সকল মানব অনায়াসলভ্য পশুবৎ বন্য ফল মূল, মাংস ও দুগ্ধ মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তখন এক জাতীয় মনুষ্য কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল; ঋ ধাতু দ্বারা তাহাদের কৃষিকর্ম্ম বুঝাইত। সেই—

আর্য্য অর্থাৎ চাসা নামে অভিহিত হইল। সেই গৌরবকর আর্য্য—চাসা—শব্দ তাহাদের জাতীয় আখ্যা হইল এবং তাহাদের সন্ততিগণ যে যে দেশে গেল, সেই জাতীয় আখ্যা তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। সেই জন্য ঐ আর্য্যশব্দ—Aryan, Iran প্রভৃতি রূপে নানা দেশে চলিত হইল। যে যে জাতির মধ্যে ঐ আর্য্য বা উহার অপভ্রংশ শব্দ প্রচলিত আছে, তাহারা সকলেই সেই আদিম আর্য্য জাতির সন্তান। কিন্তু এটী নিতান্ত অসম্ভব কথা। আমাদের বোধ হয়, ইহার মূলে কোন প্রকার যুক্তিই নাই; কেন না এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ আর্য্যশব্দ যখন সকলে একস্থানে মিলিত ছিল, তখনই প্রচলিত ছিল। কেননা চাসার মান সেই আদিম কাল ভিন্ন অধিক উন্নতির সময়ে সম্ভবে না। যখন নানা প্রকার শিল্প, বাণিজ্য ও বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে, সে সময়ে আপনাকে কেহ চাষা বলিয়া সম্মানিত করিতে আশা করে না। মানব উন্নতির সময়ে আপনার সম্মানোপযোগী পদসৃষ্টি করেন। উন্নতির সময়ে হইলে জ্ঞানী, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কোন রূপ আখ্যা ধারণ করিতেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতে[illegible] আর্য্যশব্দ আদিম সময়েই প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যদি হইল, [illegible] ঐ শব্দের উচ্চারণগত এত প্রভেদ হইল কেন? যে শব্দ পিতৃ পিতা[illegible] [illegible] কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, সে শব্দ দেশে দেশে কেন এত [illegible] রূপে উচ্চারিত হইবে, সিন্ধুকে হিন্দু বলা সম্ভব; কেননা যাঁহারা হিন্দু [illegible]লেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আদৌ ঐ শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। কিন্তু আর্য্য শব্দ ত চিরাভ্যস্ত। ভাষা ভেদ হইলেও অভ্যস্ত শব্দের উচ্চারণ ভেদ হয় না। Lieutenant শব্দ না থাকিলেও ত লেফ্‌টেনাণ্টরূপে উচ্চারিত হয়; তবে কেন আর্য্য Aryan রূপে লিখিত হইয়া আদিমকালে যেরূপ উচ্চারিত হইত, সেইমত উচ্চারিত হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য শব্দের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহতে উহাকে কখনই জাতি-বাচক শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। কোন্ ভাষায় স্বজাতি বাচক শব্দ-বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া গুণ বাচক হয়? যদি কোন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীকে 'বাঙ্গালী' বিশেষণে অভিহিত করে, তবে কি তাহাতে তাহার কোন সম্ভ্রম প্রদর্শিত হয়? অবশ্যই হয় না। তবে আর্য্য রাম, আর্য্যা জানকী, আর্য্য ইন্দ্র ইত্যাদি পদবী কি রূপে ব্যবহৃত হয়? [illegible] যেখানেই ঐ পদ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, সেই খানেই

উহাতে সম্ভ্রম জ্ঞাপনা বুঝায়। স্বজাতি বাচক শব্দের এরূপ অর্থ কেন হইল? যদি বলা হয়, যে পূর্ব্বে আর্য্য শব্দ জাতিবাচক ছিল বটে, কিন্তু পরে আর উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইত না—তখন উহা পূজ্য অর্থেই ব্যবহৃত হইত; তাহাতে জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য এরূপ ঘটিল? কোন্ জাতিবাচক শব্দ উহার স্থান অধিকার করায় ঐ প্রাচীন শব্দের ব্যবহার বন্ধ হইল? এমন কোন শব্দই ত পাওয়া যায় না। হিন্দু শব্দ অতি আধুনিক, কোন প্রাচীন বা মধ্য কালের গ্রন্থে হিন্দুশব্দ দৃষ্ট হয় না। তবে কোন শব্দ আর্য্য শব্দকে পদচ্যুত করিল, আর ঐ পদচ্যুত শব্দ সম্ভ্রমেই বা কেন প্রযুক্ত হইল? সেই উন্নত কালেও কি চাসার মান মর্য্যাদা ছিল? একথা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকে আর্য্যবর্ত্ত নাম দেখিয়া আর্য্যনাম জাতি-বাচক মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মাবর্ত্ত মধুপুর প্রভৃতি নাম দেখিয়া ব্রহ্ম প্রভৃতি জাতির বর্ত্তমানতা স্বীকার করিতে। যদি নিতান্তই অর্থেরপ্রয়োজন হয়, তবে যেখানে পূজ্যগণের বাস তাহাই আর্য্যবর্ত্ত, এই রূপ অর্থ করিলে দোষ কি?

এক্ষণে হয়ত বলিবেন, আর্য্য যদি আমাদের জাতীয় আখ্যা নহে, তবে, আম... তীয় আখ্যা কি ছিল? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আ...্য শব্দে জাতীয় রূপে ব্যবহৃত হওয়া রহিত হইয়াছিল, তখন আমাদের জাতীয় আখ্যা কি ছিল? অবশ্য তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। আমাদের জাতীয় কোন আখ্যা ছিল না। আমাদের জাতির, আমাদের ধর্ম্মের, আমাদের ভাষার, আমাদের দেশের স্বতন্ত্র আখ্যা ছিল না। আমরা প্রকৃত মানব আমাদের ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আমাদের ভাষাই দেব-ভাষা, আমাদের স্বদেশই প্রকৃতির বাস ভূমি। অন্য সকল মানব ম্লেচ্ছ, সকল ভাষাই ম্লেচ্ছ ভাষা, আমাদের শাস্ত্র সম্মত আচারের বিরোধী গণই ম্লেচ্ছাচারী। আমাদের মূল ভাষার নাম সংস্কৃত নহে; বৈদিক ভাষার সংস্করণে সংস্কৃত হইয়াছে, আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ নহে। যে পর্য্যন্ত শকুন্তলা পুত্র ভরত শাসন করিয়াছিলেন সেই ভারতবর্ষ। আর্য্য আমাদের সদাচার সম্পন্ন গণের নাম; কদাচারীগণ অনার্য্য নামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও কদাচার পরায়ণ হইলে, অনা'

ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে চিত্রসেনে ন্যবেদয়ন্
গন্ধর্ব্ব রাজস্তাম্ সর্ব্বানব্রবীৎ কৌরবা নৃপ্রতি
অনার্য্যান্ শাসত্যেতাং চিত্র সেনোহ মর্ষণঃ

বনপর্ব্ব ২০০অধ্যায়।

তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল, চিত্রসেন অধীর হইয়া তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা সেই অনার্য্যদিগের শাসন কর।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ এখানে অনার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় আর্য্য কোন জাতি নহে; ইংরাজ প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাতি নহে; ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিদেশ হইতে আগত ভারত বিজেতা নহে; এবং শূদ্র দ্বিজগণের শত্রু, অসুর অথবা দস্যু নহে। যাঁহারা ঐ বিশ্বাসে পতিত হইয়া গৃহবিচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারা সাবধান হয়েন, এই আমাদের অভিপ্রায়।

শোক-স্মৃতি।

(বর্ষ-শেষে)।

কালের দোলায় চড়ি, একটি বরষ মোর
চলে গে- -বয়ে গেল—ভাঙ্গিল না ঘুম-ঘোর!
কত হাসি কত কান্না, কত যে বিষের বায়ু
বুকে ক নিয়ে গেল, দলিয়ে কুসুম-আয়ু!
কত প্রা দিয়ে গেল, নিরাশার হলাহল
কত ে ফুটাইল, মরমের তপ্ত জল!
একটি বর আজ হয়ে গেল কত-কি-যে
শত শত হ । গুলি অশ্রুধারে গেছে ভিজে!
সাঁঝের মু গুলি, ঝরিছে সাঁজের কোলে
কত যে -বালা যৌবনে—আঁখির জলে!
দেখিনু চাঁদে , কত জনম মরণ তান,
শুনিনু নদীর বুকে, উদাস—উচ্ছ্বাস গান!
দেখিনু তারার সাথে ফুলের কো"ল বাঁধা
কেউ খসে—কেউ ঝরে—ভাবের গোলক-ধাঁধা!
শীতের মরণে কেন বসন্তের ভরা হাসি?
এক সাথে হাসি—কান্না!—এই সে ভোজের বাজি!
এই মত ছয় বোনে, বরষের কোলে বসি
খেলি' খেলি' চলি গেল, ভবের গতিতে মিশি!
বসন্তের পদ-তলে লুটাইয়ে, এক পাখী
গেয়েছিল দুটি গান সাজাইয়ে ছোট শাখী!
মরমের পাখী মোর, মরমের বিহগিনী
কোথা গেলি—কোথা গেলি আঁধারের আদরিণী!
বিষাদের বিজনেতে একটী ভাবের বালা
উষার কনক-কোলে গাঁথিত মুকুতা-মালা।

দগধ-মরম-শ্বাসে মলয়ের বপু খানি
নিতি নিতি বাড়াইত —কি ভাবে কেন লো জানি।
এক দিন ফুটেছিল সোণার সুন্দর শশী
বিষাদের বনমাঝে পড়েছিল সেই রশ্মি!
হেসে ছিল ফুল-বন, গেয়ে ছিল পাখী গুলি
নেচে ছিল লতিকারা ললিত লহরী তুলি!
সেই হতে হৃদে তার ছুটে ছিল ফুল-বাস,
ননীর মু-খানি পরে খেলে ছিল চাঁদ .াঁ!
আজি সেই হৃদি খানি দলিত কলি প্রায়,
চাঁদ মুখে পড়িয়াছে মেঘের মরণ ছ ।
এক আশা বুকে বেঁধে আজিও সে চে আছে—
সেই ফুল, সেই চাঁদ, যদি বা ফুটে গাছে।
কে জানে বে পরিণাম? কেমন ঘ্রাটি তার?
ফুল-ময়-দেহ কিবা আঁধারের অব ব!
সংসারের পোকাগুলি একটি বব গাবে,
শিরায় শিরায় ও যে, কতটী শে শোষে।
বেহুস্ মানুষ তবু—সময়ের অণু .ল
মরমের কোলে হাসে ধূলির খেলায় ভুলি!
একটী বরষে মোর কত যে ঝরিয়া গেল
খসিল না মরমের একটী বিষের শেল!
ঋণেতে মরত গড়া—জীবনের সার গণা,
যোগ দিতে হয়ে গেছি বিয়োগের শত কণা।
হাসিয়া ঝরিয়া গেছে ছিঁড়িয়াছে প্রাণ-তার
ধিকি ধিকি জ্বলে আশা—মরিয়াছে অশ্রু-ভার!
সাদা সাদা ফুলগুলি মলিন মরম কোণে,
একদিন ফুটেছিল জ্যোছনার আলাপনে!
কোথা সে চাঁদের হাসি, কোথা সে কুসুম-বাস
নিরাশার ঢেউগুলি খেলিতেছে চারি পাশ!
আকাশে তপন আছে, কঠোর শীতল তান,
শশীটী দেহটী রাখি, গাহিছে কপট গান!

খেলিছে ব্যোমের কোলে চিলের বিশদ পাখা
রাখিতে স্বরগ-শোভা, আমা হতে চির ঢাকা!
বিহগেরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কি-যেন-কেমন গায়,
মরুর মরীচি মাখা কোমল মলয় বায়!
প্রকৃতির সুখমাটী, আঁধারে মিশাল অই,
আমার এ বুক ভাঙ্গা কথা গুলি কারে কই?
মরিয়াছি—মরিতেছি—মরিব গো চিরকাল,
মুহূর্ত্তে ঝরিয়া গেল জীবনের গাঁথা মাল!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

আকিরাধল গ্রাম,

পোঃ লৌহজঙ্ঘ, ঢাকা।

বঙ্গদেশের গ্রহাচার্য্যগণের জাতিনির্ণয়।

গ্রহাচার্যাগণ কি প্রকার ব্রাহ্মণ ও ইঁহাদের অধিকারাদি কি ইত্যাদির বিষয় আমরা স্বয়ং কিছুই বলিব না, তবে পূর্ব্বতন মহামহোপাধ্যায় মনীষীগণ প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করিয়া কি প্রকাশ করিয়াছেন এবং কি প্রকার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, প্রমাণার্থ উহারই প্রতিলিপি লিখিত হইল।

নিম্নোল্লেখ্য প্রথম ব্যবস্থা পত্র খানি কোন অসংস্কৃতবিৎ ব্যক্তি কৃষ্ণনগর রাজধানী হইতে নকল করিয়া আনয়ন করিয়াছে।। আমি উহার অবিকল অনুলিপি লিখিলাম. আমার মতে একটি স্থানে দুর্ব্বোধ ও অশুদ্ধ আছে, বোধ হইতেছে।

শ্রীহরি শরণং

নবদ্বীপস্থ মহামহিম শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বরে।

নিবেদনমিদং অমাদের প্রশ্ন এই, দৈবজ্ঞগণ ব্রাহ্মণ কি না এবং ক্ষত্রিয়ের নমস্য কি না, ইহার চলিত শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয়।

তত্র প্রথম প্রশ্নোত্তরং।

গৌড় দেশে আচার্য্যাপর নামা দৈবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ এব সতু ন প্রভ্রষ্টো ভবতি।

অত্র প্রমাণং, ব্রাহ্মণ বিশেষস্য নাম বিশেষ প্রশ্নে ব্রহ্ম-যামলে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে। শরদ্বীপেচ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপেচ সিদ্ধান্তি ভূমধ্যেচ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে। দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকো। অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রি সঙ্গকঃ। সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত কৈকেয়তে তিথি-বিপ্রো নাটকে নক্ষত্রসূচক। উদ্যানে জ্যোতিষ বিপ্রো ব্রহ্মলে বিধি কারকো বভ্রাটে যোগবেত্তাচ নিটালে দেবপূজকো। রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ কলিঙ্গে জানবিপ্রঃস্যাৎ আচার্য্যো গৌড়দেশকে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে। বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাৎ বেদনাচ্চ নিরন্তরং বেদ ধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূবগণকোভুবি॥

ব্রহ্ম-যামলে। গ্রহবিপ্র-মুখাদ্রাজা শৃণুয়ান্নবপঞ্জিকাং। হস্তে কৃত্বা ফলং

ভবদেব ভট্ট ধৃতং। গ্রহে দেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়াচ দক্ষিণা, গ্রহ বিপ্রায় দাতব্যা চান্যথা নিষ্ফলী ভবেৎ।

পুণ্যব্রহ্মবৈবর্ত্তে। বিপ্রাঃ ভিচার কর্ত্তাচ হিংসকো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ যাত্যেব মন্ধতামিশ্রং বর্ণাণামযুতং ব্রজ। তদাভবতি দৈবজ্ঞো হপ্যগ্রদানী চ দুর্ম্মতি স্ততঃ শূদ্রো ভবেৎ বিপ্রো ভোগেন কর্ম্মণস্তথা॥

দীপিকায়াং। তস্য সর্ব্বৌষধি স্নানং গ্রহবিপ্র সুরার্চ্চনং ইতি এবম্বিধানি বহুনি বচনানি সন্তি। লিপি বাহুল্যাত্তপেক্ষিতানি॥

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরং।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ানাং নমস্য এব ভবতীতি॥

তত্রপ্রমাণং। ক্ষত্রিয়স্য তি যাত্রাকরণে। পূজ্যান্ দ্বিজাংশ্চ সংপূজ্য সাম্বৎসর পুরোহিতৌ। গজ বাজি পদাতীনাং প্রেক্ষ্য কৌতুক মাচরেৎ। জয়মঙ্গল শব্দেন ততঃ স্বভবনং বিশেৎ। ইতি শতাবধান ভট্ট ধৃত বচনে দৈবজ্ঞস্য রাজ পূজত্বাভিধানং॥

প্রত্যুত গণক ব্রাহ্মণস্যাপি ক্ষত্রিযাভিবাদনে প্রায়শ্চিত্ত মাহ। ব্রাহ্মণ ইত্যনুবৃত্তৌ মিতাক্ষরায়াং হারীতঃ। ক্ষত্রিয়স্যাভিবাদনে অহোরাত্র মুপবসেত্তথা বৈশ্যস্যাপি শূদ্রস্যাভিবাদনে ত্রিরাত্র মুপবসেদিতি॥

রাজ-ব্যবহারে মনুবচনং। শ্মশানেষ্বপিতেজস্বী পাবকোনৈব দুষ্যতি হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে। এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্ব কর্ম্মসু সর্ব্বথ. ব্রাহ্মণাঃ. পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ। ইত্যাদিবচনে কুৎসিত ব্রাহ্মণস্যাপি ক্ষত্রিয় পূজ্যাভিধানমিতি।

যথা মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্রবচন মন্যচ্চ বিরুদ্ধ বচনং—তৎউক্ত বচনানাং বিরোধাৎ লৌকিক ব্যবহারোহি শাস্ত্রতোবলবানেষ্যতে। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বচনাৎবলবতঃ পারম্পরীণ লোক-ব্যবহারস্য বিরোধাৎ তন্ত্রোক্ত শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্তং নকুর্য্যাৎ ভাবস্পৃশ কলাবিতি বচনস্যাপি বিরোধাচ্চ কলৌবর্ণ বিভাগ রহিত কালানন্তরং বেদ প্রবৃত্তি-রহিত কালে তামসিকানং তেষাং গ্রাহ্যমন্ত্র প্রমাণং। যাবদ্বর্ণবিভাগোহস্তি যাবদ্বেদঃ প্রবর্ত্ততে তাবদেবাগ্নিহোত্রঞ্চ সংন্যাসঞ্চ প্রবর্ত্তয়ে দিত্যাদি শতাবধান ভট্টাচার্য্য ধৃত রাম প্রকাশ গ্রন্থে কূর্ম্মপুরাণে স্মৃতি বচনং॥ দেবী বাক্যং। যানি শাস্ত্রানি দৃশ্যন্তে লোকেহস্মিন্ বিবিধানিচ শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি নিষ্ঠাতেষাং হিমানীতি। অতএব দৈবজ্ঞস্য ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদের্নমস্য এবং শাস্ত্রার্থ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীরাম নাথ শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীহরিদাস শর্ম্মণাং
সাং নবদ্বীপ
রামভদ্রোজয়তি
শ্রীগোপীনাথ দেবশর্ম্মণাং
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দেবশর্ম্মণাং
সাং বহিরগাছী

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রী[illegible]নাথ শর্ম্মণাং
শ্রীদুর্গা শরণং
শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাং
শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মণাং
রামভদ্রোজয়তি
শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাং
শিবোজয়তি
শ্রী [illegible]চরণশর্ম্মণাং
শ্রী রামচরণ শর্ম্মণাং
সাং নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

সালিসি বফানামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রী৺ গ্রহযজ্ঞ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত কেবলরাম, ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি চারিজন ব্রতী শ্রীযুক্ত তিতুরাম গ্রহবিপ্রকে গ্রহপূজাদির দক্ষিণাদি দিতে প্রতিবন্ধক হইয়াছেন, আর বলেন, গ্রহাচার্য্য যে দক্ষিণাযোগ্য ব্রাহ্মণ তাহার প্রমাণ কি? এবিষয় নিষ্পত্তি কারণ উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে আপনি আমাদিগকে মধ্যস্থ মানিয়াছেন, আমরা আপনার অনুমতি অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের নিকট অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ শ্রুত হইলাম এবং আচার্য্য মজুগুর চারিদফা ব্যবস্থা পত্র দিলেন; ঐ সকল ব্যবস্থা পত্রে নবদ্বীপের রাজা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব ও ত্রিবেণী নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও পশপুরের শ্রীযুক্ত কৃপারাম তর্কবাগীশ প্রভৃতির সম্মতি ও স্বাক্ষর আছে। ঐ সকল ব্যবস্থা পত্রের নকল নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ওঁ তৎসৎ .

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণাএব ভবন্তি। রাজমার্ত্তণ্ড প্রভৃতিষু আদি গ্রন্থেষু দৃষ্টত্বাৎ পারম্পর্য্যক্রমেণ গায়ত্র্যা উপাসকত্বাৎ এতচ্চ শ্রীমন্মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণাবতারস্য

পিতৃ মুখপদ্মাৎ প্রস্তুতাৎ জাতমেব দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণ এবেতি। সর্ব্বদেশ প্রসিদ্ধত্বাচ্চ দেশাচারস্তাবদাদৌ নিষোজ্যা দেশে দেশে যা স্থিতিঃ সৈব কার্য্যা। লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতা নাচরন্তি শাস্ত্রজ্ঞোঽতো লোকমার্গেণ যায়াৎ। পরং বেদাঙ্গ-জ্যোতিঃ শাস্ত্রগণনাৎ গ্রহদেবদানগ্রহণাচ্চ প্রশস্ত ব্রাহ্মণ ইতি সতাং মতং। রাজ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।

(২) ওঁ তৎসৎ।

গ্রহযজ্ঞাদৌ অস্মিন দেশে তৎপূজাদি দ্রব্যেষু যৎ যৎ গ্রহচার্য্যাপর পর্য্যায়ৈ গ্রহবিপ্রৈল ত শাস্ত্রতো ব্যবহার বলাচ্চ তৈরেব তৎ তল্লভং নান্যৈরিতি বিদুষাং পর। ঃ॥

শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণাং শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাং শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মণাং
সাং ত্রিবেণী শ্রীশিবনাথ শর্ম্মণাং শ্রীবামকানাই শর্ম্মণাং
শ্রীআত্মারাম শর্ম্মণাং শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মণাং শ্রীদেবনাথ শর্ম্মণাং
সাং বাঁসবেড়ে সাং নবদ্বীপ শ্রীরাজারাম শর্ম্মণাং
শ্রীরামনাথ শর্ম্মণাং সাং নবদ্বীপ

উল্লিখিত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত ব্যবস্থা পত্রে দুই সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই স্বাক্ষর আছে।

(৩) ওঁ তৎসৎ

গ্রহাণামর্চ্চনা দ্ধেতোস্তদ্দান গ্রহণায়চ।
ব্রহ্মণোবদনাৎ পূর্ব্বং দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণোঽভবৎ॥

পুরাণ তন্ত্রাদি নানাশাস্ত্র পর্য্যালোচনয়া ময়ায়ং শাস্ত্রার্থঃ পরিগৃহীত ইতি বিদুষাং মতং॥

শ্রীকৃপারাম শর্ম্মণাং

সাং পশপুর

ফরাসডাঙ্গার কৌস্তিলী ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যথা

(৪) ওঁ তৎসৎ

বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাবেদনাচ্চ নিরন্তরং।
বেদাধ্যায়-পরিত্যক্তোবভূব গণকোদ্ভিব॥

ইতিব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দর্শনাৎ দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণোদানার্হশ্চ ইতি বিদুষাং মতং ॥

এই সকল ব্যবস্থা পত্র ও নানা পুরাণাদি শাস্ত্র দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং গ্রহপূজা প্রভৃতি কার্য্যের দক্ষিণাদি পাইবার পাত্র। অতএব গ্রহপূজার দক্ষিণাদি গ্রহাচার্য্যকেই প্রদেয় অন্যকে নহে; অন্য ব্রাহ্মণের গ্রহণে পাতক হইবে—ইতি সতাং সম্মতং॥

শ্রীরামলোচন শর্ম্মণাং	শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণাং	শ্রীরামকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণাং	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যস্য

এই সকল ব্যবস্থা পত্র ও শাস্ত্রীয় বচনাদি দ্বারা দৈবজ্ঞ বা গ্রহচার্য্যগণ যে ব্রাহ্মণ এবং দানাদির অধিকারী তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

তবে ইঁহারা যে সকল প্রমাণানুসারে সূর্য্যার্ঘ্য, দান গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকা এবং গণেশ ঘট ও কোন কোন স্থানে তৎপরিবর্ত্তে শান্তিকুম্ভ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল প্রামাণিক গ্রন্থের বচন উল্লিখিত হইল না। আবশ্যক হইলে গ্রহ-যামল প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন॥

গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে অনেকগুলি গোত্র আছে, তন্মধ্যে কাশ্যপ ভারদ্বাজ শাণ্ডিল্য মৌদ্গল্য গোতম গার্গ্য পরাশর অগ্নিবেশ্ম ঘৃত-কৌশিক প্রভৃতি কয়েকটী গোত্রই অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে।

অনেকে প্রথমোক্ত তিনটি গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্র গুলির কথা শুনিয়া বলেন যে এসকল গোত্র ব্রাহ্মণের কখনও হইতে পারে না। তাঁহাদের দৃষ্টির জন্য মনু হইতে গোত্রাখ্যায়ক বচনটি উদ্ধৃত হইল যথা।

শাণ্ডিল্য কাশ্যপ শ্চৈব বাৎসঃ সাবর্ণিক স্তথা। ভারদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীন স্তথা পরঃ॥ কল্পিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় বশিষ্ঠকৌ। বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥ ঘৃতকৌশিক মৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ। সৌপায়ণ স্তথাত্রিশ্চ বাসুকি রোহিত স্তথা॥ বৈয়াগ্র পদাকশ্চৈব জামদগ্ন স্তথাপরঃ চতুর্ব্বিংশতি বৈগোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥ মনুঃ।

বচনান্তরে গার্গ্য গোত্রেরও উল্লেখ আছে।

বঙ্গীয় গ্রহবিপ্রগণের অধিকাংশই সামবেদী কচিৎ যর্জ্জুর্ব্বেদীও লক্ষিত হইয়া থাকে। ভবদেব পদ্ধতিমতে ইঁহাদের বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর কলিকাতা বর্দ্ধমান মালদহ প্রভৃতি স্থানে রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পৌরোহিত্য ব্যাপার সম্পাদন করেন; এতদ্ভিন্ন স্থানে ইঁহারা স্বসমাজস্থ বৈদিক ক্রিয়া নিপুণ ব্যক্তি দ্বারা উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

বঙ্গীয় গ্রহবিপ্রগণের কিয়দংশ বিষ্ণুর উপাসক, কতক অংশ শাক্ত, শৈবের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প॥ শৈব শাক্তেরা প্রায়ই ভট্টাচার্য্য বংশের শিষ্য; অপ-রাংশ গোস্বামীগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে॥

বঙ্গে গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে তিনটী শ্রেণী লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে অশ্বত্থ সমাজ নামক সম্প্রদায়ই [illegible]ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ তিনটি নিয়ম বহুকাল হইতে [illegible]লিত আছে।

যে গৃহে, বিধবার শ[illegible]াক্ত ব্রহ্মচর্য্যের স্বল্পমাত্রও শিথিল হয়, সেই গৃহ-স্বামী অথবা যে কেহ পণ গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা দান করেন কিংবা যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সমাজ চ্যুত হইয়া থাকেন॥

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গৃহেই ৺ শালগ্রামশিলা সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

গ্রহাচার্যগণের জীবিকার মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ভোগ ও ব্রাহ্মণোচিত দান গ্রহণ এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অনুশীলন প্রভৃতি কয়েকটিই প্রধান। ইদানীং যাঁহারা ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারা বিচারক অধ্যাপক শাসন কর্ত্তা ব্যবহারাজীব প্রভৃতি হইয়া নানা বিধ কার্য্য করিতেছেন। পূর্ব্বে গ্রহাচার্য্য বংশসম্ভূত যেসকল গণিতবিৎ পঞ্জিকা গণনা করিয়া রাজধানী প্রভৃতিতে প্রদান করিয়া তাহার নিষ্কর স্বরূপ যেসকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, অধুনা তত্তদ্বংশীয়েরা উহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন॥

অনেকে স্বগৃহ প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের সেবার্থ প্রদত্ত দেবোত্তর ভোগীও আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা গ্রহাচার্য্যগণের শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাবলীর ২। ১ টী বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

যথা বরাহঃ। নাসম্বৎসরকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চক্ষুর্ভূতো[illegible] ত্রৈব পাপং তত্র নবিদ্যতে॥ ১।
পুরোধা গণকো মন্ত্রী [illegible]
এতে রাজ্ঞা সদ[illegible]

শুক্লে দক্ষিণতো রাজ্ঞো বামতস্তদ্বিপর্য্যয়ে।
দিন পঞ্জী সদা পাঠ্যা দৈবজ্ঞান তু ধীমতা ॥ ৩।

বিজয়াভিলাষী ব্যক্তি সাম্বৎসর অর্থাৎ দৈবজ্ঞহীন স্থানে বাস করিবেন না অর্থাৎবিজিগীষু নরপতি বাসভবনের সন্নিধানে দৈবজ্ঞের বাসস্থান নিরূপিত করিবেন। যেহেতু দৈবজ্ঞই চক্ষুঃস্বরূপ অর্থাৎ ভাবিফল ফলের বিজ্ঞাপয়িতা; এই দৈবজ্ঞ যেখানে বাস করেন সেখানে কোন পাপ থাকে না অর্থাৎ দুষ্কৃতির পরিণাম ফলরূপ পরাজয় বা হানি সংঘটিত হয় না ॥

যেমন পরিবারবর্গ অবশ্য পোষণীয় তদ্রূপ রাজা পুরোহিত দৈবজ্ঞ মন্ত্রী এবং বৈদ্যকে কষ্টেও পালন করিবেন। [সূর্য্য: উদয়পুরের রাণা মহাবাহু প্রতাপসিংহ অরণ্যে বাসকালেও এই এর অধীন ছিলেন ॥ ভট্টগ্রন্থ ও টড্ সাহেবের রাজস্থান দেখুন।]

বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ শুক্লপক্ষে রাজার দক্ষিণদিকে বসিয়া এবং কৃষ্ণপক্ষে বামভাগে উপবেশন করিয়া প্রত্যহ রাজাকে দিন পঞ্জিকা শ্রবণ করাইবেন।

অদ্যাপি প্রাচীন বংশীয় রাজধানী সমূহে এই নিয়ম অক্ষত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহাদের পুরোহিতের ন্যায় একজন তিথি পুরোহিতও থাকেন।

কালের কি বিচিত্রগতি! মহাভারতকার বলিয়াছেন।

গতশ্রীর্গণকান্ দ্বেষ্টি গতায়ুশ্চ চিকিৎসকান্।
গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ ব্রাহ্মণান্ দ্বেষ্টি ভারত ॥

(মহাভারত)

হে যুধিষ্ঠির যিনি দৈবজ্ঞকে দ্বেষ করিবেন তিনি শ্রীভ্রষ্ট হইবেন এবং চিকিৎসককে দ্বেষ করিলে আয়ুহীন হইবেন এবং যিনি ব্রাহ্মণকে দ্বেষ করিবেন তাঁহার উক্ত উভয়ই বিনষ্ট হইবে। কিন্তু আজ কাল অনেক মহাত্মা জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া দৈবজ্ঞেরা ইহার কোনরূপ উন্নতি করিতে পারিতেছেন না বলিয়া নানা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন; আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমান সময়ে কোন্ শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি আছে? তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ...্যাণে দুই চারিখানা কাব্য ...হিত্যের অনুশীলন পরিলক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহাও অলঙ্কার

যখন এদেশে দর্শন স্মৃতি, পুরাণ, বৈদ্যক, তন্ত্র, প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের উন্নতি ছিল, তখন দৈবজ্ঞেরাও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মুনি প্রণীত দুই চারিটি বীজ হইতে এই শাস্ত্র, শাখা প্রশাখা যুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতে পারিত না। প্রবহমান কাল পর্য্যন্ত গ্রহাচার্য্যবংশে কত সময়ে কত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বকীয় ঐশী শক্তিদ্বারা জন সাধারণকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া অনতিক্রম্য কাল শাসনের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে!

যাঁহাদের বিরচিত কোন গ্রন্থ নাই সেই সকল অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের লোক পরম্পরাগত সুস্পষ্ট বিবরণ জানিলে ও লিখিলে হয়ত সাধারণে বিশ্বাস যোগ্য নাও হইতে পারে।

তবে যাঁহাদের গ্রন্থ দ্বারা ভারতের এবং ভারতীয় জ্যোতিষের এত গৌরব, যাঁহাদের হৃদয় হইতে উদ্ভাবিত মত গুলি অদ্যাপি জলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যাহারা ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনাস্থা নিবন্ধন কোন ঐতিহাসিকই তাঁহাদের জীবনী লিখিতে প্রয়াস পান না।

উজ্জয়িনীর অধিপতি অসাধারণ গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন বরাহাচার্য্য এবং লীলাবতী, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত কতিপয় গ্রন্থের প্রণেতা বিজ্জরবীড় নিবাসী মহেশ্বর দৈবজ্ঞের বংশোজ্জলকারী তনয় ভাস্করাচার্য্য, দিল্লির সম্রাট্ জহাংগীর সাজাহানের সভাপণ্ডিত ও অন্যতম মন্ত্রী যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা নিবন্ধন জগদগুরু আখ্যা লাভ করেন, সেই কাশী নিবাসী কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ,—প্রসিদ্ধ তাজ গ্রন্থের প্রণেতা নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ—মুহূর্ত্তচিন্তামণির লেখক রাম দৈবজ্ঞ—গ্রহ-লাঘব-তিথি-চিন্তামণি প্রভৃতির রচয়িতা গণেশ দৈবজ্ঞ—সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার রঙ্গনাথ দৈবজ্ঞ—মল্লিনাথ ব্যতীত ইহাঁর ন্যায় টীকাকার অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, ইহাঁর বহুদর্শিতা অসাধারণ ও বেদ দর্শন স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে ইহাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। —কত নাম করিব। এইরূপ সহস্র সহস্র গ্রন্থকারের প্রযত্নে এই সমুদ্রবৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রের পূর্ত্তি-সাধন হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গ্রন্থের সমালোচনা ও জীবনী লিখিতে গেলে, এক এক খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

এখন আমরা অন্য প্রদেশের গ্রন্থকারদের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া

বঙ্গীয় জ্যোতিষীগণের সম্বন্ধে ২। ৪ টি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অনুমান অনধিক ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের গার্গ্য গোত্র সম্ভূত গ্রহবিপ্র বংশে রাম দুলাল বিদ্যাসাগর নামে এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র রুদ্র বিদ্যানিধি। জ্যোতিষ-সার-সংগ্রহ ইহাঁরই বিরচিত। ইনি পঞ্চকোট রাজধানীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত সাঁওতাল যুদ্ধের সময় ইহাঁর বাণী দৈববাণীর ন্যায় হইয়া ছিল ইনি শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজার অশেষ উপকার করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যানিধির পুত্র রামকৃষ্ণ বিদ্যামণি। ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পঞ্চরত্নের সভায় অন্যতম সভ্য। তদানীন্তন বঙ্গদেশের রাজধানী মুরসিদাবাদের নবাবের সহিত উক্ত রাজার রাজস্ব গ্রহণ কার্য্য সংক্রান্ত ঘটনায় ইনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া ছিলেন। হণ্টর কৃত ইতিহাসে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস লক্ষিত হয়।

উক্ত বিদ্যমণির পুত্র প্রাণ নাথ বিদ্যা-কঙ্কন। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ রাম জয় শিরোমণি। ইনি রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রায়ের সম-সাময়িক লোক। কোন একটী ঘটনায় বাঙ্গালার লেপ্‌টনাট গবর্ণর ইহাঁর গণনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পারিতোষিক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ম্লেচ্ছের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

উক্ত শিরোমণির পুত্র ছিদাম বিদ্যাভূষণ। তৎপুত্র বর্ত্তমান তারিণী চরণ বিদ্যাবাগীশ। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের সময় হইতে এপর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরের প্রত্যেক রাজার সময়ে এতদ্বংশীয় এক এক জন জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সভাপণ্ডিত হইয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকেও ইহাঁরাই এক এক খানি করিয়া পঞ্জিকা গণনা করিয়া প্রদান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য গোয়াড়ি কলেক্টরি হইতে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

বর্দ্ধমানাধিপতির জ্যোতির্ব্বিদ্বংশও অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ; ইহাঁরা স্মরণাতীত কাল হইতে পণ্ডিত। বর্দ্ধমানাধিপতি ৺ মহাতাপ চন্দ্রের সময়ে ৺ যশোদানন্দন বিদ্যাসাগর এই রাজধানীর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সভা পণ্ডিত ছিলেন। অধুনা গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকার গণক জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখর, এই রাজধানীর জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় দ্বারপণ্ডিত। ইহাঁরা কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত গ্রহবিপ্র। গোবিন্দ পুর নিবাসী ইহাঁদের অন্যান্য জ্ঞাতিরাও

জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত। ফলিত জ্যোতিষের দুরূহ বিষয় গুলি ইহাঁদেরই সাহায্যে বিশদীকৃত হইয়াছে। মধ্যবঙ্গের গ্রহাচার্য্য-বংশীয় ৺ সত্য দেব সরস্বতী যশোহর রাজধানীর দৈবজ্ঞ ও সভা পণ্ডিত ছিলেন। ইনি উক্ত রাজবংশের প্রথম অভ্যুন্নতির সময়ের লোক; ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

লেখক শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

থালকুলা

পোঃ মাতলাখালী জেঃ ফরিদপুর।

মূর্খ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিশু বাবুর পিশির পুত্র কলেজে পড়েন। গ্রীষ্মাবকাশ কালে মামার বাড়ী আসেন। এবারও আসিয়াছেন, তাঁহার নাম কৈলাসচন্দ্র। কৈলাস দেখিতে সুন্দর, যুবক; এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। "তাঁহার বুদ্ধি স্থির, তিনি চলনে বচনে ধীর এবং নৈতিক আচরণে সাধু।" এইরূপ সকলেরই বিশ্বাস, স্কুলের উচ্চ শিক্ষা তাঁহাকে বাল্য বিবাহের বিরোধী করিয়াছে বলিয়া তিনি আজিও বিবাহ করেন নাই।

বংশীধর চক্রবর্ত্তীর সহিত কৈলাস বাবুর বড় প্রণয়। বংশীধর যদিও কোন ভাষা ও বিজ্ঞান ভালরূপ জানেন না, তথাপি তাঁহারই সঙ্গে তিনি নীতি, কর্ম্ম, প্রেম, রাজনীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের আলাপ করিয়া থাকেন। বংশী ধরের পসার নাই সুতরাং কৈলাস বাবু আসিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকে না।

এবার বংশীধর একটা উপার্জ্জনের উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কৈলাস বাবুর আগমনের দুই চারি দিন পরে, সুসময় বুঝিয়া এক দিন তাঁহাকে বলিলেন "বাবু, দুঃখ হয়! কি বলিব, রামা চাঁড়ালের মেয়েটি যেমন দেখিতে সুন্দরী, তেমনি লেখা পড়ায় ও শিল্প কার্য্যে পটু, কিন্তু পড়েছে চাসার হাতে।"

"তার নাম কি?"

"সখী"

"লেখা পড়া কি করে শিখলে?"

"অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার প্রসাদে।"

"যারা নিজেরা চাসা, তাদের মেয়েদের পণ্ডিতা করা ভাল কি?"

"আমিও তাই বলিতে ছিলাম"।

"চক্রবর্ত্তী মহাশয় ফরাসির পৃথিবীর মধ্যে বেশী সভ্য ও পণ্ডিত জানত?

"আজ্ঞা হাঁ"।

কোড্ নেপলিয়নে কি লেখা আছে জান?"

"না।"

"লেখা আছে নারী কিঞ্চিৎ সাহিত্য ও অঙ্ক শিক্ষা করিবে। উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক নাই। কেন না তারা পুরুষের ন্যায় চাকরি করিবে না।"

"ঠিক্ কথা মশাই। দেখুন না যে মেয়েটীর কথা বলছি, একটু লেখা পড়া শিখেই বিগ্‌ড়ে গিয়াছে। স্বামীকে ভাল বাসে না।'

"বটে?"

"যে পুরুষ সভ্য নয়, লেখা পড়া জানে না, তাকে ভাল বাসিবে কেন? এই দেখুন, কার কাছে শুনেছে আপনি এম এ দিবেন, তাই আপনাকে দেখ্‌বার জন্য সে পাগল।"

"আমায় কি দেখে নাই?"

"দেখেছে, তাইত মুস্কিল হয়েছে।"

"কি হয়েছে?"

"আর হবে কি, আপনাকে সে চায়।"

"সর্ব্বনাশ! বল কি?"

এই অবসরে বংশীধর পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কৈলাস

বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন "এই নিন্, পুরস্কার দিন্. অশোক বন হতে জানকীর চিহ্ন এনেছি।"

কৈলাস বাবু হাসিয়া বলিলেন "পুরস্কার মুখ পোড়াইয়া দিব"। পরে ধীর গম্ভীর বদনে বলিলেন "অতি সুন্দর লেখা।"

বংশীধর বলিলেন "দেখিতে আরো সুন্দর, কিন্তু তার রূপ গুণ সবই ভস্ম হবে, যদি আপনি দয়া না করেন, সে আত্মহত্যা করিবে।

ভারতের সকল লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়া গেলে ভারতের শাসনকর্ত্তা যত বিস্মিত, যত শোকসন্তপ্ত না হইতেন, কৈলাস বাবু তদপেক্ষা শতগুণ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন"কি আত্মহত্যা। আত্মহত্যা। আমারই জন্য আত্মহত্যা।"

"আপনার জন্য"

"তোমায় বলেছে?"

"বলেছে।"

"কবে?"

"এখনও বলে, রোজই বলে।"

"বলিবার সুবিধা কিরূপে হয়?"

"তার বেয়ামের চিকিৎসা করি।"

"কি ব্যাবাম?"

"মাথার বেয়রাম, আপনারই জন্য।"

সংসার জ্ঞানশূন্য সরল কৈলাসের উচ্চ শিক্ষা বংশীধরের কুটনীতির কাছে মস্তক অবনত করিল। কৈলাসের মনে আঘাত লাগিল "ভাবিলেন যে আমার জন্য মরিতে চাহে, আমি যদি তাহাকে ঘৃণা করি, তবে আমি রাক্ষস।"

বংশীধর বলিলেন "ভাবনা কি?"

কৈলাস পুনবায় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। এবারে বড় স্পষ্ট করিয়া পড়িলেন,—

"হে মহাদেব! কে আমায় কৈলাসে লইয়া যাইবে। আমার প্রাণ যায়, তবে হে ধরাধর হে কৈলাস তুমিই আসিয়া আমার হৃদয় শীতল কর। এখন সংসার বিরেকী হইয়া শিবারধনা করিব।"

বংশীধর বলিলেন "তবু কি ধরাধরের দয়া হইবে না?"

কৈলাস বাবু বংশীধরকে সঙ্গে করিয়া নীরবে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং হাতের আংটী খুলিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার চিহ্ন স্বরূপ এইটি তাহাকে দিবে।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে বংশীধর কৈলাস বাবুর সহিত গোপনে অনেক কথা কহিলেন, তৎপর একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। কৈলাস চিঠি পড়িলেন,—

"দুঃখিনী চরিতার্থ হইল। ফুল বিল্বদলের আয়োজনত হইল, কবে আমার পূজার দিন আসিবে? কবে,—কবে শিবরাত্র হইবে, কবে বিল্বমূলে বসিব? কবে নন্দী আমার শিব আনিবে?"

বংশীধর বলিলেন "নন্দীটাকে বুঝেছেনত?"

"তুমি, আর কে?"

"চিঠির জবাব দিবেন কি?"

"দিব।"

"আর একটা কথা, তাদের বাড়ী দুখানি ঘর বই নাই। সবাই একঘরে থাকে, আর একঘরে গরু থাকে, তাই যদি পারেন কয়টি টাকা দিন,—একখানি ঘর না হলে কিছুই হচ্ছে না।"

কৈলাস বাবু ইতস্তত না করিয়া বাক্স খুলিয়া ত্রিশটি টাকা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"চিঠি লিখিয়া দিই আরো কিছু টাকা কাল দিব।"

লেখা হইলে বংশী পত্র ও টাকা ট্যাঁকে গুজিয়া বাহির হইল, কৈলাস তাহার পশ্চাত্ পশ্চাত্ চলিলেন।

ঠিক্ এই সময়ে বিশু বাবুর স্ত্রী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হাতে উল্ ও লোহার কাঁটা। দেখিলেন গৃহে কৈলাস নাই,—অথচ তাহার বাক্স খোলা রহিয়াছে, কৌতূহল হইল—বাক্সে কি আছে, দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ঐ চিঠি দুইখানি পাইলেন, পাঠ করিয়া তাঁহার বদন রঞ্জিত হইল; পরে ভ্রুকুটী করিয়া চিঠি দুই খানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছু কাল পরে কৈলাস গৃহে আসিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন

—পাশে সেলির কবিতা ছিল তুলিয়া লইলেন। বহি খুলিতেই "এমিলিয়া বিবিএনী" বাহির হইয়া পড়িল, ভাল লাগিল—অনেকবার পড়িলেন, প্রতিবারেই শেষে চরণটি একটু জোরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—

"The sighs I breathe, the tears I shed, for thee"

গ্রামের স্কুল মাষ্টার, আসিতেছিলেন, তিনি কৈলাস বাবুর মুখে "শ্বাস-ছাড়ি, অশ্রু ফেলি, তোমারই লাগিয়ে"—পুনঃ পুনঃ শুনিয়া একটু দাঁড়াইলেন—কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়াইবেন, কৈলাস বাবুর মুখ বন্ধ হয় না সুতরাং প্রবেশ করিলেন। কৈলাস বাবু সম্ভ্রমে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! সেলি বড় সুন্দর জিনিষ"।

মাষ্টার কিছু রসিক লোক, হাসিয়া বলিলেন—"সেলির প্যারাডাইস দেখেছেন কি?"

"সেকি মহাশয়?"

"কলিকাতায়, থাকেন, তা জানেন না?"

"না।"

"ঠাকুর বাড়ী যান্নি?"

"কেন মহাশয়?"

"বেশ্ সেলি পড়েন, ঠাকুর বাড়ী যান নাই? ঠাকুর মহাশয়রা চাঁদের আলোয় ভাত বেঁধে খান, চাঁদের ফুল মাথায় পরেন—চাঁদের পোলাও, চাঁদের কারি•কোপ্তা খান—চাঁদের অণু পরমাণুতে বাড়ীঘর বানান।"*

কৈলাস বাবু সরল হইলেও বুঝিলেন, একদল লোক আছেন, তাহারা হোমর বাল্মীকি, ও চসার, বিদ্যাপতি বই জগতের সকলই তুচ্ছ মনে করেন—ইনিও সেই দলের একজন হইবেন—সুতরাং একটু হাসিয়া বলিলেন—একটু ঘৃণার ভাবে—বলিলেন—"প্রাচীনেরা সেলির সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারেন না—এসৌন্দর্য্য অতি সূক্ষ্ম।"

মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—"ঠিক্ ইটালীর লোকেও আপনারই মত একটী কথা বলিয়া থাকেন"—"Tanto buon che val mente" অর্থাৎ "এত ভাল যে সকল কাজের অযোগ্য।"

কৈলাস বাবু উচ্চ শিক্ষার গৌরবে, উপাধির গৌরবে স্ফীত—সামান্য একটা গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারের বেয়াদবীতে তিনি কিছু রাগিলেন—এবং সেই কোপন স্বরেই বলিলেন—মিলটন, বায়রণ যে পড়ে নাই, সেও তার প্রশংসা

করে—মিলটন বায়রণ না বলিয়া সেলির প্রশংসা করিয়াছি, তাই আপনি বুঝি দুঃখিত ?”

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন “সেলি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সেলি নিজেও বুঝিতেন না। আর মিলটন—The structure of Milton's great poem is daring to the verge of blasphemy আর আপনার বায়রণ a palpable poison

কৈলাস বাবু আর তর্ক নাকরিয়া বলিলেন “আপনি কত বেতন পান ?”

“দশ টাকা”

“আপনি দশ টাকার মতই কথা কহিবেন।”

মাষ্টার হাসিলেন, বলিলেন—“আচ্ছা তবে দশ টাকার মতই বলি—শুনুন”—এই বলিয়া কৈলাস বাবুর কানে কানে কি বলিলেন—কৈলাস বাবুর মুখে কালিমা পড়িয়া গেল, শরীর অবশ ও দৃষ্টি স্থির হইল। এই অবসরে মাষ্টার ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিনোদ নীলার শোকে, বিশু বাবুর আরোপিত কলঙ্কে, আর লোকের কাছে মুখ দেখান না। গৃহেই পড়িয়া থাকেন। শীর্ণ দেহ আরো শীর্ণ হইয়াছে—রামার স্ত্রী কন্যা বিরক্ত করে বলিয়া তাহাদের খাতিরে দুটী অন্ন উদরে দেন। এই ভাবে ক্রমে বহু দিন গেল, কত দিন কত বৎসর গেল, বিনোদ জানে না। তিনি একবার, রাত একবার দিন—নয়নের নির্ঝর—এই দেখেন। আর হৃদয়ের আগুন, লজ্জার তুহিন—এই জানেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ। ভূতনাথ কোথায়, তাহার সংবাদ নাই চিঠি নাই, তবে তাহার কি হইল ?

সেই সময়ে রামার কন্যা তাঁহার নিকটে ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন —“সুখী—মা, আমার নীল কয় বৎসর নাই ?

সুখী বলিল “ছয় বৎসর।”

“এরই মধ্যে ছয় বছর গিয়াছে, হা বিধাতঃ। কেন আমায় ঘুমথেকে

জাগাইলে—আমার ভূতো কোথায় ? ভূত নাথ, বাবা—তুমি মাত্র সম্বল—দুঃখিনীর ধন কোথা তুমি” এই বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে উন্মাদের ন্যায় বিনোদ যাইতে উদ্যত হইলেন।

সুখী তাঁহাকে যাইতে দিয়া—বলিল “স্থির হন্—কোথা যাবেন।”

বিনোদ চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে যেন বিস্মিতের মত বলিলেন—“জান না জান না—বিশ্বনাথ আমার ভূতোকে মেরে ফেলেছে—কোথায় মেরেছে, তাই দেখ্‌ব—যাব।”

সখী বলিল—“আপনি কি পাগল হ'লেন—অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে—ভূত বাবু ভাল আছেন, প্রায়ই চিঠি লেখেন—আমি তার জবাব লিখে দিই—এই দুই মাস তাঁর চিঠি পাওয়া যায় নাই—তাই বাবা নিজে তাঁকে দেখ্‌তে গিয়াছেন। হয়ত সঙ্গে করে আন্‌তেও পারেন।”

বিনোদ এই কথা শুনিয়া কিছু কাল নীরবে থাকিয়া—একটু হাসিলেন।—ছয় বৎসর পরে হাসিলেন—হাসিলেন—চেতন হইলেন—তথাপি সম্পূর্ণ চেতন নহে। ঐ এক ভাব—জ্ঞানে—অজ্ঞানে—চৈতন্যে—অচৈতন্যে জড়িত। হাসিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “সখি,—তবে আমার ভূতো আছে, মাথার দিব্বি, সত্য বলিস ?”

সখী সরলা বালিকা—চণ্ডাল বালিকা—তথাপি বুঝিল—ঐ হাসি—শোক-কলঙ্ক-দগ্ধা উন্মাদিনীর ঐ হাসিটুকু—পৃথিবীর সকল শোক, সকল, বিষাদ—সকল জননীর স্নেহ সমষ্টি মাখা। সখীর চক্ষে জল আসিল সন্তান স্নেহ সখী জানে না, যেন জানিল—অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া মুখে হাসিয়া বলিল—“মা আমি দিব্বি করে বল্‌ছি—আপনার ছেলে ভাল আছেন—বাবা তাঁকে আন্‌তে গিয়াছে।

সখী যেন বিনোদের মাথায় বরফ ঢালিয়া দিল। আজ ছয় বৎসর পরে বিনোদের চক্ষু যথা স্থানে নামিল—তাঁহার উন্মাদের তুল্য কর্কশ বদন কোমল ও প্রশান্ত হইল—তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন—“মা—এই দেখ, আমার বুক্ পিট্ শুকিয়ে এক্ হয়েছে—দেখ, আমার হাতে শুধু হাড়—আমি কি ভুতো আসা পর্য্যন্ত বাঁচিব ?—মা তোদের গরুর দুগ্ধ আমায় দুবেলা খাওয়াস্ ?—আমি আমার ভুতোকে দেখ্‌ব—আমি যেন মরি না,—আমি ভুতোকে দেখ্‌ব ?”

* * * * * * *

এই ঘটনার পর হইতে বিনোদ স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন—এবং পুত্র দর্শন আশায় পুনরায় শরীরের প্রতি যত্ন করিতে লাগিলেন। সখী তাহাদের গরুর সকল দুগ্ধ আনিয়া বিনোদকে দেয়—বিনোদ এক এক সময় স্নেহ ভরে বালিকাকে বলেন—"আমি কি তোর দুধের মেয়ে—কত দুধ আমায় খাওয়াবি?"

যদবধি রামা ভূত নাথের তত্ত্বানুসন্ধান গিয়াছে—রামার স্ত্রী কন্যা বিনোদের বাড়ী বিনোদের কাছে থাকিয়া তাহার সেবা সুশ্রূষা করে, কেবল রামার জামাই বাড়ী থাকে, রামার কাজ কাম দেখে।

এক দিন সখী ও বিনোদ ঘাটে জল আনিতে গিয়াছেন—একটা কুকুর শৃগাল দেখিয়া পলাইতেছে, সখী তাহা দেখিয়া হাসিতেছে—তখন তাহার চক্ষু দুইজন লোকের উপর পড়িল—তাহারাও হাসিতে লাগিল। সখী মনে করিল, তাহারাও কুকুর শৃগালের কলহ দেখিয়া হাসিতেছে। ঐ দুই জন লোকের একজন বলিল "সুন্দর মুখের হাসিও সুন্দর।"

দ্বিতীয় উত্তর করিল " ও হাসিত আপনারই।"

"আমার "হলেই তোমার।"

"অন্তত পারিতোষিক ও মিষ্টান্নটাত বটে।"

এই সময়ে পশ্চাৎ দেশ হইতে কে দ্বিতীয় ব্যক্তির পৃষ্ঠে এক বিপুল লগুড়াঘাত করিল—তাহা দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি ভয়ে পলায়ন করিল।

জল লইয়া যাইবার সময় সখী বলিল—"মা"—বিনোদকে সখী মা বলিয়া থাকে—"ঐ দেখুন বংশীকবিরাজ পড়ে—বুঝি শ্যালে কামড়াইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন—"তাড়াতাড়ি চল; যাইয়া তোমার স্বামীকে—পাঠাইয়া দি।"

সখীর স্বামী আসিয়া দেখিতে পাইল, বংশী কবিরাজ তথায় নাই, দুজন দ্বারওয়ান লাঠি ঘাড়ে, কি খুঁজিতেছে; তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, দ্বারওয়ান দ্বয় তাহাকে দেখিবা মাত্র বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল।

ভূতের গল্প।

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না। একদিন নবজীবনের লেখক শ্রেণীর ভিতর আমার নাম ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুমতেই (বৈয়াকরণ মাপ করিবেন) আজি পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। হাড বাহির করিতে পারি নাই।

*   *   *   *   *

কোন এক সহরে (নাম বলিব না, কেন না, সত্য ঘটনা—) একটি বাটী ছিল। ভূতের উপদ্রব আছে বলিয়া সে বাটীতে ভাড়াটিয়া জুটিত না। দৈব যোগে একদিন এক সাহেব সে সহরে আসিয়া উপস্থিত। সাহেব বড় Economical, হিসাবী, সুতরাং কম ভাড়ায় বাটী খুঁজিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া, কথিত ভূতের বাটীই তাঁহার পছন্দ হইল। সাহেব সস্ত্রীক ছিলেন। আপনার ডেরা ডাণ্ডা আনিয়া বাটীর ভাড়া লইলেন। সঙ্গে মেম সাহেব ও একটী ছয় মাসের বাবা।

বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় সাহেবের নাসা রন্ধ্রে, কি এক প্রকার গন্ধ বাবুর্চি খানা হইতে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, জানিলেন, যে বাবুর্চি সুখাদ্য খিচুড়ি রাঁধিতেছে ও ইলিস মাছ ভাজিতেছে। সাহেব হুকুম দিলেন, "এই খাদ্য আমি ও মেম সাহেব খাইব ও খাইবেন।" বাবুর্চি তটস্থ। সাহেব বেড়াইতে গেলেন। সেই খাদ্য প্রস্তুত ও প্রচুর। ঠাঁই করিতে বলিলেন। বাড়া হইয়াছে, এমন সময় খড়ম পায়ে, বৃহদাকার এক পুরুষ, নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া আসিয়া সেই খাদ্য ভোজন করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বাবুর্চির নিবারণ শুনিল না। তখন বাবুর্চি নিরুপায় হইয়া ও আগন্তুকের বৃহদাকার দেখিয়া, সাহেবের কাছে আসিয়া 'নালিস বন্ধ হইল। সাহেব কথা অবিশ্বাস করিয়া প্রথমত তাহাকে প্রহার করিলেন। তাহাতে তাহার প্লীহা ফাটিল না দেখিয়া স্বয়ং যাইয়া ব্যাপার দেখিলেন। ঘর হইতে বিবলবার আনিয়া পাঁচবার আগন্তুকের প্রতি গুলি করিলেন। গুলি লাগিল না। আগন্তুক এই খিচুড়ী খাইতেছে, এই ইলিষ মাছ ভাজা খাইতেছে, আবার খিচুড়ী খাইতেছে, আবার ইলিষ মাছ ভাজা খাইতেছে—আবার দুই খাইতেছে—নিশ্চিন্ত ভাবে খাইতেছে—কোন বাধা কেহ দিল না

এই ভাবে খাইতেছে—আবার খাইতেছে—চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে—যেন অনন্ত ভাবে, অনন্ত খিচুড়ী ও অনন্ত ইলিষ মাছ ভাজা অনন্ত ভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া গিলিতেছে। তখন সাহেবের প্রাণে একটু আতঙ্ক হইল। আহার অবসানে আগন্তুক উঠিয়া 'দিন দুনিয়া সব্ আমারই'—এই ভাবে পা ফেলিয়া মেম সাহেবের কামরার দিকে শনৈ শনৈ গমন করিতে লাগিলেন। মেম সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিয়া সমস্ত আলো একবারে নিভাইয়া দিলেন। সাহেব এবারে নিতান্ত অস্থির।

বাবুর্চি খানা হইতে আলো আনিয়া দেখিলেন, যে মেম সাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। তখন সাহেব একেবারে 'উন্মাদ'। মাধ্যাকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া মেম সাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। এমন সময় বাবুর্চী আসিয়া বলিল 'সাহেব আমি কোরাণ পড়িতে জানি—পড়িব কি?' সাহেব সম্মত হইলে পর বাবুর্চী সেই ঘরে জলদ গম্ভীর স্বরে কোরাণ পাঠ আরম্ভ করিল। সাহেবও বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টার পর ঘড়ীর ছোট কাঁটার চালে সেই খাটিয়া নামিতে আরম্ভ হইল এবং শেষে মেজেতে—নামিল। পর দিন প্রাতঃকালে সাহেব সেই বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

* * * * *

দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়, বছর যায়—ভাড়াটিয়া জুটে না। কত দিন পরে এক সাহেব সেই বাটীতে আবার ভাড়াটীয়া হইল। জমিদার বলিলেন কিছু দিন আগে বাটীতে বাস কর, পরে এগ্রীমেণ্ট হইবে। তাই মঞ্জুর। রাত্রি আটটা—সাহেব ব্যাচিলার অর্থাৎ অস্ত্রীক--বসিয়া আছেন। অদূরে খট্ খট্ করিয়া খড়ম পায়ে কে আসিতেছে। দেখিলেন—বৃহদাকার এক পুরুষ। দেখিয়া কেদারা ছাড়িয়া আপন খাটিয়ায় চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। আগন্তুক আসিল এবং কেদারায় বসিল। আগন্তুকের চক্ষু সাহেবের উপর—সাহেবের চক্ষু আগন্তুকের উপর। এই ভাবে ১৫ মিনিট গেল। তখন আগন্তুক টেবিলের জিনিষ আদি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন টেবিলে এক খানা ক্ষুর আছে। খশ্ করিয়া ক্ষুর ধরিয়া—গেলাস হইতে জল লইয়া ভাড়াটিয়া সাহেবের দাড়িতে মাখাইতে লাগিল। সাহেব—নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তায় আকুল—কিন্তু নড়িলেনও না, চড়িলেনও না। এ গাল, ও গাল, গোঁফ, দাড়ি, ঘাড, শেষে বগল,—সব কামান হইল—কিন্তু নখ কাটা হইল না।

*　　*　　　　*　　*

সাহেব খাটিয়ায় শুইয়া—আর আগন্তুক চেয়ারে বসিয়া। কিছু ক্ষণ পরে খপ্ করিয়া উঠিয়া সাহেব আগন্তুকের গালে জল মাখাইতে অবস্ত করিলেন। আগন্তুক নিশ্চেষ্ট—নিস্পন্দ। কামান শেষ হইল। সাহেব আবার খাটিয়ায় শুইলেন, আগন্তুক আবার চেয়ারে বসিলেন,অনেক ক্ষণ বাদে—

আগন্তুক বলিল "বাঁচিলাম! কি আরাম! ভূত হইয়া পর্য্যন্ত কামাইনি। আজ তোমার হাতে কামাইয়া বড় আরাম হইল।

দেখ, এই বাড়ী আমার ছিল। আমাকে খুন করিয়া বর্ত্তমান জমিদার এই বাড়ী লইয়াছে। সেই জন্য আমি ভূত হইয়া উপদ্রব করি এবং কাহাকেও এই বাটীতে থাকিতে দিই না। কিন্তু আজ তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি—তুমি সমস্ত ভূতের চুল কামাইয়া দিয়াছ। বাটী তোমায় দিলাম। কাঁটাল তলায় যে টাকা পোঁতা আছে—তাহাও তোমার হইল, তুলিয়া লইও।"

সা। কোন দোষ ত হবে না। জমিদার কি বলিবে?

ভূত। বিপদে পড়িলে, আমাকে স্মরণ করিও।

একদিন প্রাতঃকালে জমীদারের লোক ছয় মাস পরে ভাড়ার তাগাদা করিতে আসিল। সাহেব হুকুম দিলেন যে মারিয়া ভাগাইয়া দেও। তাই হইল। পরে, জমীদার স্বয়ং আসিলেও তাই হইল। তখন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ধারানুসারে জমীদার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বাটী দখলের জন্য নালিস-বন্দ হইলেন। নালিষ—এজেহার—শমন—আসামী হাজির—মোকদ্দমা। ফরিয়াদীর এজেহার অন্তে হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিলেন যে ভূতে আসামীকে বাড়ীটি দান করিয়াছে। হাকিম প্রমাণ আছে কি না আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আসামী বলিল "হাঁ আছে।" তখন হাকিম প্রমাণ তলব করিলেন। আসামী ক্ষণ কাল চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিল। তখন মট্ মট্ করিয়া শব্দ হইল। হাকিমজী চাহিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার টানা পাখার উপর দারুণ পা ঝুলাইয়া কে এক জন বসিয়াছে। আসামী কহিল "ঐ আমার সাক্ষী।" হাকিমের সওয়ালে টানা পাখা আসীন আগন্তুক কহিল যে, "হাঁ সে আসামীর পক্ষে সাক্ষী বটে।" আরও কহিল যে সে একজন ভূত। জোবানবন্দী লইবার উদ্যোগ হইল। ভূত সাক্ষী কহিল "আমি হলফ পড়িতে পারিব না।" তখন হাকিম মহা

বিপদে পড়িলেন। শেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে ব্রাডলার মত ভূত সাক্ষীকে সলেম্ আফরমেশন দেওয়া হইবে। ভূতের জোবান বন্দীতে প্রকাশ পাইল যে, সে বাটী আসামীকে দান করিয়াছে। সে তাহার বাটীতে ছিল এবং জমীদার তাহাকে হত্যা করিয়া বাটী অধিকার করিয়াছে। হাকিম তখন রুমাল সাহায্যে তিন বার ঘর্ম্ম মুছিলেন। পরে ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভূত-সাক্ষীকে জেরা করিবে কি না। ফরিয়াদীর উকীল জেরা করিতে অস্বীকার হইল। তখন হাকিম মহোদয় উভয় পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া (তিনি ইষ্ট-তুচ্ছ-চুরি) আসামীর দখল বাসের আজ্ঞা দিলেন। ফরিয়াদী খরচা দিতে বাধ্য হইল।

শুনা যায় সে সহর কলিকাতা হইতে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত, কিন্তু কোন দিকে তাহার কিছু নির্ণয় নাই।

হাড় বাহির হইল। [খানিকটা বটে। নবজীবন সম্পাদক।]

শ্রীগুরুগোপেশ্বর।

শান্তিপুর গ্রাম-ধাম, শ্রীগুরু তাহার নাম,
কোন এক, ব্রাহ্মণ-কুমার।
জুয়া চুরি করি দ্বিজ, সংসার পালিত নিজ,
বিপ্রবংশে, বড় কুলাঙ্গার॥
ভাগিনেয় গোপেশ্বর, ছিল তার সহচর,
উভয়েতে, এক অন্নে থাকে।
শ্রীগুরু যেখানে রয়, গেপেশ্বর ছাড়া নয়,
ফাঁকি দেয়, যাকে পায় তাকে॥
একদিন গোপেশ্বরে, শ্রীগুরু মধুর স্বরে,
বলে, "চল, বিদেশেতে যাই।
চিরকাল একদেশে, রহিয়াছি কায়-ক্লেশে,
উন্নতির, উপায় ত নাই॥
অদৃষ্টে যা থাকে মাপা, অন্য দেশে চল বাপা,
একবার গিয়া, দেখে আসি।"
গোপেশ্বর শুনি কথা, "সেত মামা মন্দ নয়,
বিদেশ গমন, ভাল বাসি॥"
যুক্তি করি দুইজনে, শুভ দিনে শুভ ক্ষণে,
দেশ থেকে, প্রস্থান করিল।
বহুপথ পর্য্যটনে, ক্লান্ত হয়ে দুইজনে,
কোন দেশে, আসিয়া পৌঁছিল॥

মুদীর দোকান দেখে, গোপেশ্বরে দূরে রেখে,
শ্রীগুরু যাইল, যুক্তি দিয়ে।
আমার আহার হ'লে, মোরে শীঘ্র দাও ব'লে,
মুদীরে কহিবে, সম্ভাষিয়ে॥
শ্রীগুরু এতেক বলি, দোকানেতে গেল চলি,
বলে, "খাদ্য আছে কি প্রস্তুত?
লুচি মণ্ডা ভাল চাই, ভাল দধি দিবে ভাই!
দাম নাহি দিব, পেলে খুঁত!॥"
সম্ভাষিয়া মুদী কয়, "এস দ্বিজ মহাশয়,
ইচ্ছামত, খাদ্য হেথা পাবে।
তুল্য চীজ অল্প দামে, পাইবে না এই গ্রামে,
খেলে, দশ মুখে, গুণ গাবে।॥"
এত বলি মুদীজন, খাদ্য আনি ততক্ষণ,
ভাল স্থানে দিল, পাত করে।
মনোমত খাদ্য পেয়ে, বার বার চেয়ে চেয়ে,
খায় দ্বিজ, আহ্লাদ অন্তরে॥
উঠিবার দেরি নাই, গোপেশ্বর বুঝি তাই,
আসিয়া দিলেক দরশন।
ময়রাকে ডাকিয়া কয়, "মোর না বিলম্ব সয়,
শীঘ্র কর, খাদ্য আয়োজন॥
ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত, মুদী খাদ্য দিল যত,
গোপেশ্বর খাইতে বসিল।
এদিকে শ্রীগুরু খেয়ে, তোফা ছাঁচি খিলি পেয়ে,
ধীরে ধীরে, চিবাতে লাগিল॥
ধূমপান আয়োজন, করে মুদী ততক্ষণ,
হুঁকা রাখে, জল ফিরাইয়া।
বেশী করে টিকা দিয়ে, ভাল করে ধরাইয়ে,
দেয় হুঁকা, কোল্কে চড়াইয়া॥
খেতে খেতে দ্বিজ কয়, "কি তোমার প্রাপ্য হয়,
হিসাব করহ ভাই দেখে॥"
মুদী বলে মহাশয়, "বার আনা প্রাপ্য হয়,"
শুনি দ্বিজ যায়, হুঁকা রেখে॥
মুদী বলে, "কোথা যাও, খেলে তার দাম দাও,"
শুনিয়া শ্রীগুরু, তারে কয়।
"ওরে বেটা বেইমান, নাহি তোর কাণ্ডজ্ঞান,
কতবার দাম দিতে হয়!॥"

দুই জনে চলে বোল, বেধে গেল গণ্ডগোল,
লোক আসি, রাস্তায় জমিল।
গোপেশ্বর তাই দেখে, আহার স্থগিত রেখে,
ডাক ছেড়ে কাঁন্দিতে লাগিল॥
এদিকে ব্রাহ্মণে ধরে, মুদী টানা টানি করে,
ভয়ানক, বাধিল রগড়।
সম্বরিতে নারি রাগ, হাত নিয়ে পেয়ে বাগ,
গালে দ্বিজ মারিল চাপড়॥
রাগেতে উঠিয়া ফুলে, মুদীর ধরিয়া চুলে,
শ্রীগুরু ভূমেতে পাড়ে তারে।
সমাগত লোকগণে, ছাড়াইয়া দুই জনে,
আদ্যোপান্ত চাহে জানিবারে।
গোপেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে, তখনে রোদন করে,
যত লোক, তার দিকে চায়।
বলে, "তুমি কি কারণে, কাঁন্দিছ আপন মনে?"
গোপেশ্বর, কহিল সবায়॥
"ও গো মহাশয়গণ, ভদ্রলোক ঐ জন,
স্বচক্ষে দেখিনু, দিল দাম।
মুদী ভয়ানক লোক, বাহিরে দেখায়ে রোক
মিছামিছি, করিছে হাঙ্গাম॥
আমি দেখিয়াছি যবে, ওঁহার মোচন হবে,
আমার ত, সাক্ষী কেহ নাই!
মোর কাছে পাবে যাহা, আমিও দিয়াছি তাহা,
রক্ষা পাব কিসে, কাঁদি তাই!!"
শুনি কয় মুদী জন, "ওগো মহাশয়গণ,
উনি দাম, দিলেন কখন?
গোপেশ্বর বলে তবে, স্বকর্ণে শুনুন সবে,
সত্য মিথ্যা, আমার বচন।"
দেখে শুনে লোকগণ, বুঝিলেক ততক্ষণ,
মুদী দোষে ঘটেছে সকলি।
মুদীরে প্রহার দিয়া, দ্বিজদ্বয় ছাড়াইয়া,
স্বকার্য্যে যাইল, সবে চলি॥

নবজীবন।

৫ম ভাগ। | পৌষ, ১২৯৫। | ৩য় সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধনপাদ।

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। ১ ॥

পদচ্ছেদঃ। তপস্, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর, প্রণিধানানি, ক্রিয়াযোগঃ।

পদার্থঃ। তপঃ শাস্ত্রান্তরোপদিষ্টং চান্দ্রায়ণব্রতাদি, স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদি—পবিত্রমন্ত্রাণাং জপঃ, মোক্ষপায়ং শাস্ত্রাণাং অধ্যয়নং বা ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরম-গুরাবর্পণং তৎফলসন্ন্যাসো বা ক্রিয়াযোগঃ যোগোপায়ী-ভূতক্রিয়া ক্রিয়া চাসৌ যোগঃ (যোগোপায়ঃ) চেতি, সমাসঃ।

অন্বয়ঃ। তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগ ইত্যুচ্যতে। উদ্দেশ্য-বিধেয়স্থলে লিঙ্গ বচনতন্ত্রতা নাস্তীতি ক্রিয়াযোগ ইত্যস্যাহুষ্টত্বং। ক্রিয়া-যোগ ইতি বহু বচনান্তঃক্বচিৎ পাঠঃ।

ভাবার্থঃ। তদেবং প্রথমপাদে সমাহিতচিত্তস্য সোপায়ং যোগ মভিধায় ব্যুত্থিতচিত্তস্যাপি কথমুপায়াভ্যাসপূর্ব্বকোযোগঃ সাধ্যতামুপযা তীতি তৎসাধনানুষ্ঠানপ্রতিপাদনার্থং ক্রিয়াযোগমাহ। তপঃ স্বাধ্যায়েতি। তপোনাম চান্দ্রায়ণাদি শরীরশোধনব্রতজাতং বিনা হি তপসা অনাদিক্লেশ

কর্ম্মবাসনয়া হেতুনা নানা অশুদ্ধি যোগ বিবোধিনী ন ভেদং (তন্নুত্বাং) আপ-দ্যতে অতস্তপসঃ সাধনমধ্যে গ্রহণং। তাবন্মাত্রমেব তপশ্চরণীয়ং ন যাবতা ধাতু বৈষম্য জায়তে ইতি বাচস্পতি মিশ্রঃ। স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানা ভ্যাঞ্চ অন্তঃ শুদ্ধির্ভবতি, তপ আদয় মিলিত্বৈব ক্রিয়াযোগ ইতি।

অনুবাদ। তপশ্চরণ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান ইহারা ক্রিয়াযোগ।

সমালোচন। সমাধির প্রথমপাদে স্বরূপ অবান্তর ভেদ সকল কথিত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয়পাদে উহার সাধন অর্থাৎ উপায় সকলের নির্দ্দেশ করা হইতেছে, যদি বল "অভ্যাস-বৈরাগাভ্যাং বা তন্নিরোধ" (১ম, পা, ১২সূ) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ত প্রথমপাদেই সমাধির উপায় বলা হইয়াছে, তবে দ্বিতীয় পাদে আর কি নূতন কথা বলা হইবে?

একথা সত্য, প্রথমপাদে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তনিরোধের কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহারা যোগ-রতের পক্ষেই উপায়, যে ব্যক্তি যোগপথে অনেকটা অগ্রসর হইয়া অনেক বিষয় সংযম করিতে শিখিয়াছে তাহার পক্ষেই অভ্যাস এবং বৈরাগ্য চিত্তনিরোধের উপায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যোগ পথে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হয় নাই, যাহার আদৌ সংযম করিবার শক্তি জন্মায় নাই, তাহার যোগসাধনের উপায় কি? অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের যে অধি-কারী হইয়াছে, তাহার অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তের নিরোধ হৌক, কিন্তু যাহার অভ্যাস এবং বৈরাগ্যে অধিকার জন্মে নাই, তাহার সেই অভ্যাস এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় কি উপায়ে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহারই বিষয় বলা হইতেছে। অধিকারী ভেদে যোগ সাধনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন। অথবা কেবল যোগ সাধনের কেন? সকল কার্য্যেরই অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধনোপায়। যাহার বর্ণজ্ঞান হয় নাই তাহার শিক্ষার নিমিত্ত গুরুমহাশয়ের আবশ্যকতা এবং যে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ, তাহার শিক্ষার নিমিত্ত কলেজের অধ্যাপক আবশ্যক। প্রথমপাদে যোগপথে আরূঢ় ব্যক্তির চিত্তনিরো-ধের কথা বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়পাদে যোগপথে আরুরুক্ষুর চিত্ত সংযমের উপায় বলা হইতেছে। গরুড় পুরাণে যোগপথে আরূঢ় এবং যোগ পথে আরুরুক্ষু এই উভয়ের চিত্ত নিরোধের উপায় অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। যথা—

"আরুরুক্ষুযতীনাঞ্চ কর্ম্মজ্ঞানে উদাহৃতে।
আরূঢ যোগযুক্তানাং জ্ঞানত্যাগৌ পরৌষতৌ॥

যোগপথে আরুরুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্ম এবং জ্ঞান এই দুইটি চিত্ত নিরোধের উপায় এবং যোগপথে আরূঢ ব্যক্তির জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ইদুটি চিত্ত নিরোধের প্রধান উপায়।

যে ব্যক্তি যোগ পথে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সে প্রথমে ক্রিয়া যোগ করিবে। ক্রিয়া যোগ বলিতে যোগ সিদ্ধির উপায় স্বরূপ কতকগুলি ক্রিয়া বা কার্য্য। যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহার নাম ক্রিয়াযোগ। সে কার্য্য গুলি কি? তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরে প্রণিধান। যেমন প্রবল বেগে ধাবমান অশ্বের গতি সহসা রুদ্ধ করা অসম্ভব এবং শ্রেয়স্কর নহে, অশ্বারোহী এবং অশ্ব এই উভয়ের জীবন নাশের কারণ হইলেও হইতে পারে, এই নিমিত্ত ক্রমশ উহার গতি রোধ করা হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিষয়ী, সর্ব্বদা সংসারের উপাদেয় বস্তুসকল ভোগ করে, এবং যাহার ইন্দ্রিয়গণ ভোগ্য বস্তু নিচয়ের মনোহারিত্ব গুণে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা সেই সকল বস্তুর দিকে পরিধাবিত, কাযেই যাহার চিত্ত বিষয়ান্বেষীবৃত্তি পরম্পরায় সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত, ক্ষণ কালের জন্য স্থির নহে এইরূপ ব্যক্তি যদি যোগ পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে প্রথমে কিরূপ কার্য্য করিবে? ইহার উত্তর ক্রিয়াযোগ। এই ক্রিয়াযোগ তিন প্রকার তপ, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বরপ্রণিধান।

উপরি উক্ত তিন প্রকার ক্রিয়াযোগের মধ্যে তপশ্চরণই প্রথম অনুষ্ঠেয়, তপশ্চরণ বলিতে চান্দ্রায়ণ আদি ব্রতের অনুষ্ঠান। ব্রত বলিতে স্নান, আহার, বিহারাদির নিয়ম অথবা সংযম পূর্ব্বক স্নান, আহার ও বিহারাদির অনুষ্ঠান। সকল প্রকার যথেচ্ছাচারিতার নিরোধের নামই ব্রত। ব্রত নানা প্রকার; একটি মাত্র ভোগ্য বস্তুর সাময়িক কদাচিত পরিত্যাগ হইতে সমুদয় ভোগ্য বস্তুর আত্যন্তিক পরিত্যাগ পর্য্যন্ত ইহার প্রসর, সপ্তাহান্তর রবিবাসরে লবণ মাত্র ত্যাগ করার নাম ব্রত এবং চৈত্রমাসের মধ্যাহ্নে কান্তারমধ্যে মধ্যাহ্ন তপ্ত বালুকায় অনাবৃত শরীরে বিনা আসনে উপবেশন করিয়া মুকভাবে বায়ু ভক্ষণ করাও ব্রত। এই সকল প্রকার ব্রতই শারীরিক এবং মানসিক

বিশুদ্ধিতাব সম্পাদক, এবং যোগ সিদ্ধির উত্তম সাধক। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি প্রবল বেগে বিষয়াভি মুখে ধাবমান ইন্দ্রিয়ের বেগ সহসা নিরোধ কবিয়া যথেচ্ছ ভোগাবস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া যোগসাধনে নিরত হইতে পারে না এবং সেরূপ ইচ্ছা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যোগ সিদ্ধিত দূরের কথা, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শবীব পাত হওয়ায় আত্মহত্যা জনিত পাপ আসিয়ও জুটিতে পাবে। এই নিমিত্ত প্রথমে তাহার ব্রতানুষ্ঠান করা উচিত। ব্রতে মধ্যেও প্রথমে অল্পায়াস সাধ্য ব্রত গুলিব অনুষ্ঠান করত পরিপক্ক হইয়া উত্তবোত্তব সাধ্যানুসারে কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান কবিবে। রবিবাবে মৎস্য ভোজন ত্যাগ হইতে আবম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় খাদ্য বস্তু ত্যাগ কবিয়া বায়ু ভক্ষণে অনাহাব-ব্রতের শেষ করিবে, প্রত্যহ ভোজনাদি ছয়টী কার্য্যে মৌনী হওত একবাবে যাবজ্জীবন মৌনী হইবে। এইরূপ অন্য বিষয়েবও ক্রম সংযম কবিবে। বাচস্পতিমিশ্র বলিযাছেন যাহাতে সহসা পীড়া হইতে পাবে এরূপ ব্রত কবিবে না।

হিন্দু শাস্ত্রে বাব তিথি বিশেষে যে আহাব বিহাবাদির নিয়ম কবা হইয়াছে তাহাব প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যমাত্রকেই যোগ শাস্ত্রেব বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া, কাবণ "যোগদ্বাবা আত্মদর্শনই হিন্দুব পবম ধর্ম্ম।"

স্বাধ্যায় বলিতে প্রণব ও পুরুষ-সূক্ত প্রভৃতি নানাবিধ পবিত্র মন্ত্রের জপ এবং মোক্ষোপযোগী শাস্ত্রের অধ্যয়ন। এই কার্য্য দ্বারা মন হইতে বিষয় সম্বন্ধীয় বৃত্তি সকল অপসৃত হয়,কাবণ মন উহাদের অনুশীলনেই আসক্ত থাকে।

তৃতীয় ঈশ্বব প্রণিধান। ঈশ্বর প্রণিধান শব্দের অর্থ আমাদের কার্য্য সকলেব ফল সেই সর্ব্বগুরু পবমেশ্বরে অর্পণ অথবা ফলপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করা। প্রথম পদেব ঈশ্বব প্রণিধানদ্বা (১ ম, স, ২৩সূ) এই সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধান এবং দ্বিতীয় পাদের এই সূত্রের ঈশ্বর প্রণিধানে একটু ভেদ আছে; সেথানে প্রণিধান শব্দের অর্থ ভক্তি বিশেষ, যাহা দ্বারা ঈশ্বর সর্ব্বময় বলিয়া চিন্তিত হন। এখানে ঈশ্বর প্রণিধান শব্দের অর্থ কার্য্যের ফল প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করা, নিষ্কাম কর্ম্মকরা। ইহাও একটি চিত্ত শুদ্ধির উপায়, ইহার দ্বার কেবল চিত্তের শুদ্ধি হয় এমন নহে, উহার সংকোচ ভাব দূর হইয়া ঔদার্য্যেবও বৃদ্ধি হয়।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ।

পদচ্ছেদঃ। সমাধি-ভাবনা-অর্থঃ, ক্লেশ-তনূকরণ-অর্থঃ।

পদার্থঃ। সমাধিঃ (উক্তলক্ষণঃ) তস্য ভাবনা চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনং, স অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য, স তথোক্তঃ ক্লেশাঃ বক্ষ্যমাণাঃ অবিদ্যাদয়ঃ (২ য়, পা, সূ ৩,) তেষাং তনূকরণং স্বকার্য্যকরণপ্রতিবন্ধঃ স এব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তথোক্তঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ে।

অন্বয়ঃ। (ক্রিয়াযোগঃ) সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ক্রিয়াযোগো হি চিত্তং তত্তৎকর্ম্মাতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিরুদ্ধবৃত্তিকং করোতি, ততঃ ক্রমেণ সত্ত্বোদ্রেকাদেকাগ্রঞ্চ করোতি। অবিদ্যাদিকঞ্চ প্রকর্ষেণায়াসেন তনূকরোতি সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিদ্বারে ত্যর্থঃ।

অনুবাদ। ক্রিয়াযোগ চিত্তকে পুনঃ পুনঃ সমাধিতে নিবেশ করে, এবং বক্ষ্যমাণ অবিদ্যাদি ক্লেশ নিচয়ের ক্লেশদায়িনী শক্তির লয় করে।

সমালোচন। ক্রিযাযোগের দুইটি শক্তি (১) চিত্তে সমাধি স্থাপনী, (২) ক্লেশের হ্রাস করণী, ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্রিয়াযোগ দ্বারা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি উৎপন্ন হয়। উহাদ্বারা সত্ত্ব গুণের প্রাবল্য হয়, তাহাতেই চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়, এবং ক্লেশের নাশ হয়।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। ৩।

পদচ্ছেদঃ। অবিদ্যা—অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।

পদার্থঃ। অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাঃ।

অনুবাদ। অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ ইহারা ক্লেশ।

সমালোচন। পরে এক একটি সূত্রদ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত এস্থলে আর উহাদের বিষয় অধিক বলা হইল না। ভাষ্যকার এই অবিদ্যাদির কয়টি গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা সত্ত্বাদি গুণের কার্য্যারম্ভ সামর্থ্যকে দৃঢ় করে, তাহাদের পরিণাম অর্থাৎ বৈষম্য উৎপাদন করে, কার্য্য কারণ স্রোতের পরিবর্দ্ধন করে এবং পরস্পর মিলিত হইয়া জাতি ও আয়ু র্ভোগাদি রূপ কর্ম্ম বিপাক প্রবর্ত্তিত করে।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারণাম্। ৪ ॥

পদচ্ছেদঃ। অবিদ্যা-ক্ষেত্রং উত্তরেষাং প্রসুপ্ত-তনু-বিচ্ছিন্ন-উদারাণাম্।

পদার্থঃ। অবিদ্যা বক্ষ্যমাণ লক্ষণা—অনাত্মন্যাত্মাভিমান ইতি যাবৎ, ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ, উত্তরেষাং পরেষাং অস্মিতাদীনাং কিম্ভূতানাং প্রত্যেকং প্রসুপ্তাদিভেদেন চতুর্বিধানাং প্রসুপ্তাশ্চ, তনবশ্চ, বিচ্ছিন্নাশ্চ উদারাশ্চ তেষাং, যদা ক্লেশাশ্চিত্তভূমৌ স্থিতাঃ প্রবোধাভাবে স্বকার্য্যং নারভন্তে তদা তে প্রসুপ্তকা ইতি কথ্যন্তে, যে স্বস্য প্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলীকৃতকার্য্যসম্পাদনশক্তয়োবাসনাবিশেষতয়া চেতঃস্ববস্থিতাঃ প্রভূতাং সামগ্রীমন্তরেণ স্বকার্য্যমারব্ধুং ন ক্ষমাঃ। তে বিচ্ছিন্নাঃ যে কেনচিদ্‌বলবতা ক্লেশেনাভিভূতশক্তয়স্তিষ্ঠন্তি, তে উদারাঃ যে প্রাপ্তসহকারিসন্নিধয়ঃ স্বং স্বং কার্য্যমভিনিবর্ত্তয়ন্তি।

অন্বয়ঃ। অবিদ্যা (প্রত্যেকং) প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদরাণাং উত্তরেষাং ক্ষেত্রং অস্তীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। অস্মিতাদয়ঃ ক্লেশাঃ খলু প্রত্যেকং প্রসুপ্তাদি ভেদেন চতুর্ব্বিধাঃ কদাচিৎ প্রসুপ্তা মনুষ্যা ইব কার্য্য-মনারভমাণাস্তিষ্ঠন্তি, কদাচিৎ স্বপ্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলীকৃতকার্য্যসম্পাদনশক্তয়ো ভবন্তি, কদাচিৎ পরেণ বলবতা ক্লেশেনাভিভূতশক্তয়স্তিষ্ঠন্তি কদাচিচ্চ প্রাধান্য বর্ত্তিনঃ। এবং প্রত্যেকং অবস্থা ভেদেন চতুর্ব্বিধানাং অস্মিতাদীনাং অবিদ্যা-ক্ষেত্রং-মূলং প্রসবভূমিরিতি যাবৎ, যদা বিপর্য্যয় জ্ঞানরূপা অবিদ্যা শিথিলী ভবতি তদা ক্লেশানাং অস্মিতাদীনাং নোদ্ভবোদৃশ্যতে অবিদ্যায়াঃ সদ্ভাবে চ তেষা মুদ্ভবোদৃশ্যতে ইতি তেষা-মবিদ্যা মূলত্বং। বস্তুতঃ অবিদ্যা ভেদা এব তে।

অনুবাদ। অবিদ্যাই অস্মিতাদি-ক্লেশের মূল। এবং অস্মিতাদি ক্লেশ প্রত্যেকে প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার এই চার প্রকার।

সমালোচন। অস্মিতা প্রভৃতি যতগুলি ক্লেশ উক্ত হইল তাহাদের সকলের মূলই অবিদ্যা, কারণ যতক্ষণ অবধি অবিদ্যা দৃষ্ট হয়, ততক্ষণই ঐ সকল ক্লেশ হয়, অবিদ্যার অদর্শন হইলে উহারাও আর দৃষ্ট হয় না। এই জন্য অবিদ্যাই উহাদের মূল। অবিদ্যার স্বরূপ পরসূত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার পর যথাক্রমে অস্মিতাদির স্বরূপ এক একটি সূত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে, একটু মাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে পাঠক সকলই জানিতে পারিবেন তথাপি এই মাত্র বলিতেছি, যে অবিদ্যা শব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান—যে বস্তু যেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপ জ্ঞান। সচরাচর মোহ বা অজ্ঞান অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। অস্মিতা বলিতে, বুদ্ধি এবং আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান বুদ্ধির কার্য্য সকলকে আপনার বলিয়া জানা। রাগ—অনুরাগ—আসক্তি, দ্বেষ—বিরক্তি। অভিনিবেশ বলিতে "আমার এই দেহ চিরস্থায়ী হৌক" এইরূপ একটা জ্ঞান বা মৃত্যুভয়। এক্ষণে দেখ এই সকল গুলিই অজ্ঞান মূলক বা মোহের খেলা, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে অবিদ্যার ভেদ বা এক একটি বিশেষ অবিদ্যা বলা যাইতে পারে।

এই অস্মিতাদি অবস্থাভেদে চার প্রকার প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন, এবং উদার। প্রসুপ্ত শব্দের যৌগিক অর্থ ঘুমন্ত, ঘুমন্ত মানুষ যেমন জীবিত থাকে অথচ মৃতের মত নিষ্ক্রিয়, সেইরূপ ঐ ক্লেশগুলি চিত্তে যখন ঘুমিয়ে থাকে অর্থাৎ 'বীজ' অবস্থায় থাকে কিন্তু উদ্বোধক কারণ না থাকায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, তখন উহাদিগকে প্রসুপ্ত বলা যাইতে পারে। যখন স্ববিরুদ্ধ ক্লেশের ভাবনা বলে উহাদের শক্তির হ্রাস হয়, তখন উহাদিগকে তনু অথবা হীন শক্তি বলা যায়। যখন আপনা হইতে প্রবল অপর কোন ক্লেশ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, তখন উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন বলা যায়। আর যখন উহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে তখন উহাদিগকে উদার বলা যায়। সকল প্রকার ক্লেশেরই এই চার প্রকার অবস্থা হয়।

ভাষ্যকার প্রসুপ্তাদি শব্দের এইরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন—"তত্র কা প্রসুপ্তিঃ? চেতসি শক্তিমাত্র প্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ"। প্রসুপ্ত বলিতে প্রসুপ্তি ভাব প্রাপ্ত, সে প্রসুপ্তি কি প্রকার? চিত্তে অস্ফুট অবস্থায় অবস্থিত অস্মিতাদির যে বীজ ভাব প্রাপ্তি, যাহা উদ্দীপক কারণ লাভ করিয়া নিজ নিজ কার্য্য জন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়। ফলাদিতে যেরূপ বীজ উৎপন্ন হয় তৎ কালে উহার কোন কার্য্য বিশেষ লক্ষিত হয় না, পরে জলাদিসেক রূপ উদ্দীপন কারণ প্রাপ্ত হইয়া উহার কার্য্য লক্ষিত হয়, সেই রূপ অস্মিতাদি চিত্তে যখন নিগূঢ় ভাবে অবস্থান করে

অথচ ভিতরে ভিতরে উহাদের কার্য্য কারিতা শক্তি থাকে, পরে কোন রূপ উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলেই উহারা আপন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় অস্মিতাদির তাদৃশ নিগূঢ় অবস্থায় অবস্থানের নাম প্রসুপ্তি। অত এব জীবন্মুক্ত যোগীদিগের চিত্তে বিলীন ভাবে অবস্থিত অস্মিতাদিকে প্রসুপ্ত বলা যায় না, কারণ ধ্যান প্রভাবে সেই সকল অস্মিতাদির বীজ ভাব এক বারে দগ্ধ হইয়া যায় কোনরূপ উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাদের উদ্বোধ হয় না, বীজ একবার দগ্ধ হইলে তাহা হতে কি আর অঙ্কুরের উদ্গম হয়? এই জন্যই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে 'ক্ষীণ ক্লেশ' এবং 'কুশল চরম দেহ' বলা হয় অর্থাৎ ক্লেশ ক্ষয় হইয়াছে এবং চরম দেহ উপস্থিত হইয়াছে; বর্ত্তমান দেহের অবসানের পর আর যাহার দেহান্তর হয় না, বর্ত্তমান দেহই তাহার শেষ দেহ।

বীজান্যগ্ন্যপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞান দগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥

যেমন অগ্নিদ্বারা বীজ দগ্ধ হইলে সে বীজ হইতে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ক্লেশ বীজ একবার দগ্ধ হইলে পর দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। অতএব জীবন্মুক্ত পুরুষের চিত্তে প্রলীন ভাবে অবস্থিত অস্মিতাদিকে প্রসুপ্ত বলা যায় না। যেহেতু তাহাদের উদ্বোধক বস্তুর সংযোগেও পুনরায় আর উদ্বোধ হয় না, কাযেই অবিদ্যা ও তাহাদের প্রসব ভূমি হইতে পারে না, যাহার প্রসবই নাই, তাহার আর প্রসব ভূমি কি? তবে বাল্যাবস্থায় মনুষ্যের চিত্তে গূঢ় ভাবে যে অস্মিতাদি থাকে তাহাদিগকেও প্রসুপ্ত বলা যায়। ভাষ্যকার তনু শব্দের ব্যখ্যা করিয়াছেন যথা "তনুত্ব মুচ্যতে যথা প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তন বোভবন্তি।" ক্লেশের প্রতিপক্ষ ক্রিয়া যোগ, তাহার ভাবনা অনুষ্ঠান, তাহাদ্বারা উপহত ক্লেশাদিগকে 'তনু' বলা যায়। ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্লেশসকল যখন হীন বল হয়, তখন তাহারা 'তনু' অর্থাৎ ক্ষীণ হয়, কাযেই তখন জ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধ করিতে সমর্থ হয় না। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত, ক্রিয়াযোগানুষ্ঠায়ী যোগীর চিত্তে অপ্রবল ভাবে অবস্থিত অস্মিতাদিকে 'তনু' বলা যায়। ইহার পর বিচ্ছিন্নের কথা বলিতেছেন—

"তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মানা পুনঃ পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃ।" উপরি উক্ত ক্লেশের মধ্যে কোন একটি ক্লেশ অপর একটি আপনা হইতে প্রবল ক্লেশদ্বারা অথবা স্বীয় উদ্বোধক বিষয়ের অত্যন্ত অভাব বশত কিছুকালের জন্য বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার আবার যথাকালে আপনার নিজ রূপে আবির্ভূত হয়, এই জন্য উহাদিগকে "বিচ্ছিন্ন" বলা হয়। যেমন যখন চিত্তে অনুরাগ প্রবল হয়, তখন উহাতে ক্রোধ দৃষ্ট হয় না, সেই ক্রোধকে বিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে, এইরূপ অপর ক্লেশের বিষয়ও জানিবে। এবং এক বস্তুর উপর কাহারও অনুরাগ দেখিয়া অপর বস্তুতে যে তাহার অনুরাগ নাই, একথা বলা যাইতে পারে না, যেমন কোন পুরুষকে একটি স্ত্রীতে অনুরক্ত দেখিয়া অপর স্ত্রীর উপর তাহাকে বিরক্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ পরে অন্য স্ত্রীতে তাহার পূর্ব্ববৎ অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে; দ্বিতীয়-পক্ষ-বিবাহ-কারীরা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই রূপেও ক্লেশদিগকে বিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, ঐ রূপ অসহায় ক্লেশ সকল প্রসুপ্ত বলা যায় না কেন? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন প্রসুপ্ত ক্লেশ বহুকাল অন্তরে এমন কি দুই তিন জন্মের অন্তরেও প্রকট হয়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ক্লেশ অতি অল্পকাল মাত্র অপ্রকট অবস্থায় থাকে। এক্ষণে 'উদার'। ভাষ্যকার বলেন যে "বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ"; প্রবল ভাবে অবস্থিত ক্লেশকে উদার বলা যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ক্লেশের নাম উদার। অপ্রবল ভাবে অবস্থিত ক্লেশ তনু এবং প্রবল ভাবে অবস্থিত ক্লেশ উদার। তনু ও উদারের মধ্যে এই ভেদ। ফল কথা ক্লেশ সকল একই রূপ, তবে একই মনুষ্য যেমন অবস্থা ভেদে বালক যুবা এবং বৃদ্ধ রূপে কথিত হয়, সেই এরূপই ক্লেশ অবস্থা ভেদে প্রসুপ্ত, তনু বিচ্ছিন্ন ও উদার রূপে কথিত হয়।

পরিশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন "ক্লেশা অবিদ্যা ভেদাঃ, কস্মাৎ সর্ব্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে যদবিদ্যয়া বস্তা কার্য্যতে তদেবানু শরীরেতে ক্লেশা, বিপর্য্যাস প্রত্যয় কালে উপলভ্যন্তে ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যা মনুক্ষীয়ন্ত ইতি।"

ক্লেশ সকল অবিদ্যারই ভেদ, কারণ সকল প্রকার ক্লেশে অবিদ্যার প্রাবল্য লক্ষিত হয় এবং অবিদ্যা যাহা করে, ক্লেশ তাহারই অনুসরণ করে।

মিথ্যাজ্ঞান কালেই ক্লেশের উদ্ভব এবং অবিদ্যার ক্ষয়ে ক্লেশের ক্ষয় লক্ষিত হয়।

ক্লেশ নিচয়ের মধ্যে অবিদ্যার প্রধানত্ব হেতুক প্রথমেই তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম খ্যাতিরবিদ্যা। ৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। অনিত্য-অশুচি-দুঃখ-অনাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখ-আত্ম-খ্যাতিঃ অবিদ্যা।

পদার্থান্বয়ৌ। স্পষ্টৌ

ভাবার্থঃ। অতস্মিংস্তদ্বুং প্রতিভাষঃ ইতি

অবিদ্যায়াঃ সামান্যলক্ষণং। তস্যা এব বিশেষপ্রতিপাদনং অনিত্যাদি চতুষ্টয়ে ক্রমেণ নিত্যাদিবুদ্ধিরবিদ্যেত্যর্থঃ। অনিত্যেষু ঘটাদিষু নিত্যাভিমান অবিদ্যেত্যুচ্যতে, এবং অশুচিষু কায়াদিষু শুচিত্বাভিমান, দুঃখেষুচ বিষয়েষুচ সুখাভিমানঃ, অনাত্মনি শরীরে আত্মত্বাভিমানঃ। এতে না পুণ্যে পুণ্য ভ্রমো-নর্থে চার্থভ্রমো ব্যাখ্যাতঃ।

অনুবাদ। অনিত্যে নিত্যত্ববুদ্ধি, অপবিত্রে পবিত্রতাবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং যাহা আত্মা নয় তাহাতে আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা।

সমালোচন। যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেইরূপ জ্ঞান করার নাম অবিদ্যা ইহা অবিদ্যার সামান্য লক্ষণ ইহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য সূত্রকার কতক গুলি দৃষ্টান্ত সম্বলিত সূত্র করিলেন, যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেইরূপ জ্ঞান করার নাম অবিদ্যা যেমন অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া জানা, ইত্যাদি। এই রূপ না বলিয়া একবারেই অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া জানা ইত্যাদিরূপে সূত্র আরম্ভ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহারই অনুবাদ নীচে প্রদর্শিত হইল।

"অনিত্য অর্থাৎ কার্য্য মাত্রকে নিত্য বলিয়া বিবেচনা করা—এই পৃথিবী নিত্য, ঐ চন্দ্র ও নক্ষত্র মালায় পরিশোভিত আকাশ নিত্য, দেবতা সকল অমর এইরূপ জ্ঞানকে অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি বলা হয়। অশুচি অর্থাৎ এই ঘৃণার উদ্দীপক শরীরে যে পবিত্রতা বুদ্ধি, শরীরে অশুচিত্ব অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যথা—

স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিঃস্যন্দান্নিধনাদাপি।
কায়মাধেয় শৌচত্বাৎপণ্ডিতা অশুচি বিদুঃ॥

শরীরের স্থান—মলমূত্র পূর্ণ মাতৃগর্ভ, বীজ—পিতার রেত, উপষ্টম্ভ—পুরুষাদি সম্বন্ধ, নিঃস্যন্দ—অনবরত ঘর্ম্ম ও অপর মলাদির নির্গম এবং বিনাশ থাকায় পণ্ডিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা শরীরকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই শরীরকে যে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান,—যেমন কোন যুবতীকে দেখিয়া 'আহা এই কন্যা চন্দ্রমার ন্যায় কমনীয়, ইহার শরীর যেন চন্দ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে', এইরূপ চিন্তা করাই অশুচিরে শুচি বলিয়া জানা। দুঃখে সুখ—সংসারের যাবৎ বস্তুই দুঃখ ইহা পরে বলা হইবে, তাহাতে সুখ জ্ঞান যেমন অভিলষিত বস্তু লাভে কৃত কৃতার্থতা বোধ করা ইত্যাদি। সেইরূপ আত্মভিন্ন শরীর, মন এবং বাহ্যোপকরণে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান তাহাও অবিদ্যা। ইহাই সমুদয় ক্লেশের মূল।

গরুড়পুরাণেও অবিদ্যার এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

অনাত্ম ন্যাত্মবিজ্ঞান সমতঃ সংস্বরূপতা।
সুখাভাবে তথা সোথ্যং মায়া বিদ্যাবিনাশিনী॥

আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান, যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব কল্পনা এবং যাহাতে সুখ-নাই তাহাতে সুখবোধের নাম মায়া ইহা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের বিনাশিনী। অবিদ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী ভ্রমজ্ঞান। এই ভ্রমজ্ঞানের কারণ বলিয়া সত্ত্ব, রজ, ও তমোগুণের কারণ প্রকৃতিকেও অবিদ্যা বলা হয়।

এক্ষণে অবিদ্যার ভেদ বা কার্য্য অস্মিতাদির ক্রমশ নিরূপণ করিতেছেন।

দৃগদর্শনশক্ত্যো রেকাত্মতেকস্মিতা॥ ৬।

পদচ্ছেদঃ। দৃক্-দর্শন-শক্ত্যোঃ, এক-আত্মতা, ইব, অস্মিতা।

পদার্থঃ। দৃক্ শক্তিঃ-পশ্যতীতি (জ্ঞানবান্ ভবতীতি) দৃক্ দ্রষ্টা পুরুষঃ, দৃশ্যতেনেয়েতি দর্শনশক্তিরজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ সাত্ত্বিক, পরিণামো। অন্তঃকরণ রূপবুদ্ধিরিতি যাবৎ, তয়োরেকাতন্মা ইব একতাভিমান ইব অস্মিতা অহঙ্কারঃ।

অন্বয়ঃ। কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। অস্মিতা নামাহংকারঃ 'অহং' ইত্যাকারজ্ঞানং। সাচাস্মিতা ভ্রমাত্মকৈব। চৈতন্যরূপস্য জড়রূপয়া প্রকৃত্যা সহ সংযোগেন প্রকৃতৌ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, সা চান্তঃকরণমিতিকথ্যতে দর্শনম পিতস্যা নাম যতঃ ইন্দ্রিয়-দ্বারা স্বপ্রতিবিম্বিতং হি বস্তু পুরুষং দর্শয়তি। সা স্বয়ং জডপ্রকৃতি সম্ভবাং জডরূপৈব। জড়াজড়ত্বেন ভোগ্য ভোক্তৃত্বেনচাত্যন্ত ভিন্নরূপয়ো বুদ্ধিপুরু-ষয়ো র্যত্রকতাভিমান ইব একস্বরূপতা পত্তিরিব অত্যন্তমেকাববোধঃ সা অস্মিতা অহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। অনেনৈব বোধেন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরহিতাপি প্রকৃতিঃ কর্ত্র্যহং ভোক্ত্র্যহমিত্যভিমন্যতে পুরুষঃ স্বভাবতানির্গুণোঽপি গুণবান্ অহমিত্যভিমন্যতে। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। বুদ্ধি এবং চৈতন্যের (আত্মার) সম্পূর্ণ অভিন্ন রূপে প্রতীতির নাম অস্মিতা।

সমালোচন। অস্মিতা শব্দের অর্থ অহংকার বা অহংবুদ্ধি,—আমি, আমার ইত্যাদি, রূপ জ্ঞান। এরূপ জ্ঞান ভ্রম মাত্র কারণ; প্রকৃত 'আমি' বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কাযেই উহা অবিদ্যার ভেদ। এবং 'আমি' এই জ্ঞান হইতেই মনুষ্য অসংখ্য ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত উহাকেও ক্লেশ বলা হয়। 'আমি' জ্ঞান কি? তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। যোগাচার্য্যদিগের মতে আত্মা বা পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, উহা নির্গুণ এবং নির্লিপ্ত। সত্ত্ব রজস্তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি ইহা জড় এবং গুণের আধার। চৈতন্যরূপ পুরুষের সহিত জড়রূপা প্রকৃতির সংযোগ হইলে ঐ প্রকৃতিতে বুদ্ধি নামে একটি পরিণাম হয়, উহাকে মহৎ এবং অন্তঃকরণও বলা হয়। উহা আর কিছুই নহে পুরুষের জ্ঞানের দ্বার মাত্র। পুরুষকে সমুদয় বস্তুদর্শন করায় বলিয়া উহার নাম দর্শন। উহা স্বয়ং জড়স্বরূপ। সেই বুদ্ধি এবং চৈতন্য পরস্পর বিভিন্নরূপ হইলেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাবশত পরস্পর যেন সম্পূর্ণ রূপে একতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এইরূপ একটা জ্ঞান হয়; চৈতন্য বিবেচনা করে আমিই বুদ্ধি এবং বুদ্ধি বিবেচনা না করে, আমিই চৈতন্য; এই অভেদ ভ্রমের নামই অস্মিতা বা 'আমি' জ্ঞান। এই আমি জ্ঞানই সংসা-রের মূল

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ।

পদচ্ছেদঃ। সুখ—অনুশয়ী রাগঃ।

পদার্থঃ। সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী রাগঃ গর্দ্ধঃতৃষ্ণারূপঃ রাগসংজ্ঞকঃ ক্লেশশ্চ।

অন্বয়ঃ। সুখানুশয়ী যো রাগ স রাগ ইত্যুচ্যতে রাগশব্দোঽত্রাশ্লিষ্টঃ।

ভাবার্থঃ। সুখজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ সুখে তৎ-সাধনে বা যোগর্দ্ধঃ উৎকটাভিলাষঃ স রাগইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। সুখপ্রাপ্তির আশার নাম রাগ।

সমালোচন। রাগ বলিতে বিষয়ে প্রেম, কোন বিষয়ে কখন সুখ অনুভব করিয়া সেই সুখ স্মরণ কারীর সর্ব্বদা তাদৃশ সুখলাভের আশায় বিষয়ে যে আশক্তি তাহার নাম রাগ। ইহা যে ক্লেশকর তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। এই নিমিত্ত এবিষয় আমাদের অধিক বক্তব্য কিছুই নাই।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ।

পদচ্ছেদঃ। দুঃখ-অনুশয়ী, দ্বেষঃ।

পদার্থঃ। দুঃখংনাশপ্রতিকূলতয়া বেদনীয়ং তদনুশেতে ইতি দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ মন্যুঃ দ্বেষসংজ্ঞকঃ ক্লেশশ্চ।

অন্বয়ঃ। দুঃখানুশয়ীদ্বেষঃ, দ্বেষইত্যুচ্যতে অত্রাপি পূর্ব্ববৎশ্লেষঃ।

ভাবার্থঃ। দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ দুঃখে তৎসাধনে বা যোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ ক্রোধঃ স দ্বেষলক্ষণঃ ক্লেশইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। দুঃখের উপর বিরক্তি বা ঘৃণার নাম দ্বেষ।

সমালোচন। কোন বিষয় দুঃখ অনুভব করিয়া সেই দুঃখ স্মরণকারীর বা দুঃখ প্রদ বস্তুমাত্রের উপর যে উৎকট বিরক্তি জন্মায়, সেই বিরক্তির নাম দ্বেষ। এবিষয়ও আমরা আর অধিক বক্তব্য দেখি না। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে আমাদের সুখজ্ঞান বা দুঃখজ্ঞান এই উভয়ই অবিদ্যা মূলক; কারণ অবিদ্যা জন্য সংস্কার বশেই আমাদের সুখ দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে।

পদচ্ছেদঃ। স্বরসবাহী, বিদুষঃ অপি তথা রূঢ়ঃ অভিনিবেশঃ।

পদার্থঃ। স্বরসেন সংস্কারমাত্রেণ বহতীতি স্বরস বাহী, বিদুষঃ তত্ত্বদর্শিনঃ অপি তথা তেন প্রকারেণ রূঢ়ঃ প্রসিদ্ধঃ অভিনিবেশঃ অভিনিবেশাখ্যঃ ক্লেশঃ।

অন্বয়ঃ। বিদুষোঽপি স্বরসবাহীতথারূঢ়ঃ অভিনিবেশঃ।

ভাবার্থঃ। যথা অবিবদ্ধনস্য তথা বিদুষোঽপি স্ববসবাহী সংস্কাবমাত্রো-পস্থিতঃ যঃ প্রসিদ্ধো মবণাদি ভয়রূপঃ ক্লেশোঽস্তি সঃ অভিনিবেশ ইত্যুচ্যতে তথারূঢ় ইত্যত্র ভোজরাজ স্তন্বনুবন্ধ ইতি পঠতি। তদর্থস্তু শবীববিষয়াদিভি র্মমবিয়োগামভূদি ত্যন্বহং শবীবানুবন্ধরূপঃ যোভযাযঃ ক্লেশোঽস্তি সোঽভিনি-বেশঃ। অন্য সমানং।

অনুবাদ। পণ্ডিত অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিদিগেবও সংস্কার বশত যে মবণাদিব ভয় হয়, তাহাব নাম অভিনিবেশ।

সমালোচন। এই সংসাবে কি বিদ্বান কি অবিদ্বান্ সকলকেই সর্ব্বদা "আমার যেন মৃত্যু হয় না আমি যেন চিবজীবী হই" এইরূপে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা কবিতে দেখা যায়। মৃত্যু কি, তাহা সুখকব বা দুঃখকব সেপর্য্যন্ত অনুভব হয় নাই অথচ মৃত্যু না হোক এই প্রার্থনা সকলেই কবিতেছে। যিনি তত্ত্বদর্শী সংসার কেবল দুঃখময় বলিয়া বুঝিযাছেন এবং লোক বুঝাইতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারও প্রার্থনা কোটিকল্পান্ত জীবিত থাকি, সংসাবে মহা-প্রলয় হোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেবও বিলয় হোক, আমি জীবিত থাকি। অতি গণ্ডমূর্খেরও এবিষয়ে ঐ একই কথা। অতি বড় বৃদ্ধ চক্ষু নাই, কর্ণ, নাই, দন্ত নাই, জ্ঞান নাই, শবীর অবশ, ভোজন, পান, শৌচ সকলই পরাধীন, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে গুরু শোকের আঘাতে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কিন্তু তাহারও প্রার্থনা, যেন মৃত্যু না হয়। ফলত কুষ্ঠে হাত পা খসিয়া গিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় নিদ্রানাই, কিন্তু—উঁ হুঁ তাঁহার শত্রুর হোক্, উহা অপেক্ষা যদি কিছু দুঃখ থাকে, তাহা হয় হোক্, কিন্তু বাপ্ রে !! মৃত্যু যেন না হয়।' চৈত্র মাসের নব তপ্তবালুকার উপর শয়ন করিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কবিতেছে, কিন্তু তাহাকে মৃত্যুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত বেগে মারিতে যাইবে। অথবা কেবল মনুষ্য কেন ? প্রাণিমাত্রেরই এই দশা। বিষ্ঠার হ্রদের কীটকেও আপনার প্রাণরক্ষার্থ চেষ্টমান দেখা যায় ; সদ্যোজাত

শিশুতেও লক্ষিত হয়। ইহাতেই বোধ হইতেছে পূর্ব্বজন্মেই অনুভূত মৃত্যুযন্ত্রণায সংস্কার ইহজন্মেও লোকের চিত্তে জাগরুক থাকে, তাহাতেই ঐ রূপ মৃত্যু ভয়ের আবির্ভাব হয়। এইরূপ আপামর সাধারণে আবির্ভূত মৃত্যু ভয়ের নাম অভিনিবেশ। এই নিবেশ যে ক্লেশ কর, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে।

মূর্খ উপন্যাস।

ষোড়শ অধ্যায়।

রজনী দ্বিপ্রহর, লোকালয় নিস্তব্ধ, ভয়ঙ্করী নিশা যেমন জীবকুল গ্রাস করিয়া নির্ভয়ে শয়ন করিয়াছে। ঝিল্লিরবে সেই গভীর রজনীকে আরো গভীর করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামবাসির গৃহ অন্ধকার-ময়,—তৈলাধরের তৈল দগ্ধ হইয়া প্রদীপ নির্ব্বান হইয়াছে। কেবল একটী দ্বিতল গৃহের নিভৃত কক্ষে একটী উজ্জ্বল আলোক।

সুন্দর পর্য্যঙ্ক, সুন্দর ও সুকোমল শয্যা গৃহের শোভা করিয়াছে। এক সুন্দর-সুন্দরী সেই মনোহর পর্য্যঙ্ক ও তুষার শুভ্র-কার্পাস কোমল শয্যার শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। উভয়ে শুইয়া কি বসিয়া বসিয়া কি শুইয়া আছেন কে বলিবে? উপবেশন কিম্বা শয়ন হইতে যদি কোন মোহকর ও সুখকর বিশ্রাম-বিধান সম্ভবে, তবে তাঁহারা সেই ভাবেই রহিয়াছেন। শ্যামল তমালে কুসুমিত লতা বেড়িয়া রহিয়াছেন, আবার বসন্তানীল স্পর্শে কখন দুলিতেছে, কখন স্খলিত হইতেছে, ফুল নড়িতেছে। মধুবর্ষণ হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিবার—দেখাইবার নহে। সময়ে দেখিবার দেখাইবার ও বটে। হা বিধাতঃ! কেন সুখ, দুঃখের এবং দুঃখ, সুখের, আবরণে গঠন করিয়াছিলে? কেনইবা উপন্যাস রচনার জন্য সমাজ সজ্জিত করিয়াছিলে—আর কেনই বা পশু সমাজে ও মানবে পৃথক করিয়াছিলে!

বায়রণ কোথা তুমি, আমি কি তোমারই মতে চলিব—এই—সীতা সাবিত্রীব জন্ম-ক্ষেত্রে বলিব "প্রকৃতি ভ্রষ্টা, কেবল কল্পনাই সতী ?"—তবে কি প্রতাপ তবে কি সূর্য্যমুখী—প্রকৃতিতে অপ্রাকৃতিক হইত কি কবির কেবলই কল্পনায়ই উহারা মানব সীমার অতীত।

বর্ণিত সুন্দর সুন্দরী দেবতুলিকার প্রতাপ ও সূর্য্যমুখী নহে। উহারা মানব উহারা দিবায় দেবতা নিশায় পিশাচ উহারা গৃহাণিতচন্দ্র উহাদের একপৃষ্ঠ স্বর্গ অপর পৃষ্ঠ নরক। সুন্দর, আমাদের সেই পরিচিত কৈলাশ বাবু সুন্দরী বিশুবাবুর পত্নি স্যামা সুন্দরী।

অনেক কথার পরে শ্যামা হাসিয়া বলিলেন "কি বিবাহ করিবে ?"

"না।"

"কেন ?"

"বাল্য বিবাহ উচিত নয়।"

"যুবতী কোথায় পাইবে ?"

"বিধবা বিবাহ করিব।"

"বিধবা মেয়ে কে দিবে ?"

"মেয়ে কেন লোকে বিধবা মাও দিয়া থাকে।"

"তারা কি মানুষ ?"

"তারা ধার্ম্মিক লোক"

"বুঝি তোমার ও আমার মত ধার্ম্মিক।"

শ্যামাসুন্দরীর ব্যাঙ্গোক্তি শুনিয়া কৈলাস চমকিয়া উঠিলেন—আত্মগ্লানি হইল হৃদয়ে আঘাত লাগিল কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ঘোর নিদ্রাবেশে ডাকিলে লোকে চমকিয়া উঠিয়া বসে আবর ঢুলু ঢুলু নয়নে অবস শরীরে পড়িয়া যায় কৈলাসের তাহাই হইল। শ্যামার ব্যাঙ্গোক্তি যে হৃদয়ে বিষ বর্ষণ করিল শ্যামার মধুর হাসি আবার সেই হৃদয়েই মধু বর্ষণ করিল। মত্ত মানব ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না। শ্যামা সুন্দরী হাসিয়া আবার বলিলেন—

"আমার জন্য কি বিবাহ করিবে না ?"

"তোমারই জন্য"

"আমি বিধবা হইলে আমায় বিবাহ করিবে ?"

আবার কৈলাস চমকিয়া উঠিলেন—বিশু বাবুর স্নেহ পূর্ণ বদন মনে পড়িল, শ্যামার বদনে পৈশাচিক ভাতি দেখিলেন—আতঙ্ক হইল; হৃদয়ে আবার তক্ষক দংশন করিল। শ্যামা তাঁহাকে স্তব্ধীভূত দেখিয়া হাসিয়া তাঁহার কপোলে নাসাগ্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন—

"তুমি বিবাহ না করিলে অখ্যাতি বটিবে।"

"কার অখ্যাতি ?"

"আমার, তোমারও বটে।"

কৈলাসের ভয় হইল—পাপের ভয় নহে, অখ্যাতির নামে ভয় হইল—কিছু কাল শ্যামার মুখপানে চাহিয়া ধীরে বলিলেন—

"বিবাহ করিব।"

"করিবে ?"

'করিব।"

"যাকে বলি, তাকেই করিবে ?"

"করিব।"

"বয়েস ৭ বৎসর কিন্তু ?"

"বালিকা বিবাহ করিব ?"

"দোষ কি ?"

'আমি মরিলে অল্প বয়সে বিধবা হইবে।"

"তোমার কি ক্ষতি হইবে ?"

"ভ্রূণ হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করিব কি ?"

"যাঁহারা ১৬।১৭।১৮।২০ বৎসরের কন্যা বিবাহ না দিয়া ঘরে রাখেন, তাঁহারা কি ভ্রূণহত্যার সংখ্যা হ্রাস করিয়া থাকেন ?"

কৈলাসের কোমলতা এখনও একবারে অপনীত হয় নাই—কিছু কাল অবাক হইয়া ভাবিলেন পরে বলিলেন "তোমার এত বুদ্ধি তবে কেন এরূপ হইলে ?"

"তুমি হইলে কেন ?"

"তুমি করিয়াছ"

"আমি ?"

"তুমিই।"

"তবে কি তোমার কিছুই দোষ নাই?"—

কৈলাস অস্বীকার করিতে পারিলেন না। যৌবন ও রূপ-পিপাসা ধীরে ধীরে কৈলাসের হৃদয়ে প্রবেশ করে,—শ্যামার আগ্রহ ও ভালবাসায় সে পিপাসা ভয়ঙ্কর হয়। সে যাতনা তুষানল, তথাপি কৈলাস সহিতে থাকেন—সহিতে কি পারা যায়? অজ্ঞান হন। কে কোমল করে তুলিয়া—তাঁহাকে স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, তিনি জাগিয়া দেখেন—শ্যামা—জগৎময় শ্যামা। সুতরাং কি রূপে কহিবেন "তাহার দোষ নাই"? তাঁহার চক্ষে জল আসিল—অযথা প্রণয়ের এই প্রথম অশ্রু তাঁহার নয়নে বহিল 'বলিলেন—

"আমারই সকল দোষ।"

কৈলাসের এ কোমল কথায় শ্যামার কঠিন হৃদয় গলিল—চতুরা শ্যামা বুঝিতে পারিলেন, কৈলাস তাঁহা হইতে যত দূরে ছিল, এখনও তাহাই আছে। তিনি হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ের শিশু গলা টিপিয়া বধ করিতে পারেন—কৈলাস একটা মশক মারিয়া জীব-হত্যার ভয়ে কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়। তাই কৈলাসের চিবুক ধরিয়া স্নেহভরে বলিলেন—

"তোমার নয়, আমারই।"

কৈলাস কিছু বলিলেন না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; শ্যামা আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমি সকল পাপের বোঝা বহিব, তুমি আমারই। তোমাকে ছাড়িব না, যদি ছাড়, মরিব। আমার যত ঐশ্বর্য্য, যত টাকা যত কড়ি, সকলই তোমার। অখ্যাতি সুখ্যাতি—দেশে। বিদেশে তার ভয় কি? অথবা অর্থ বলে দেশেও অখ্যাতির ও বিপদের মুখ বাঁধিতে পারা যায়। আমি তোমার ও আমার পথের সকল কাঁটা ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলিব, ভয় কি?"

কৈলাস আবার মোহান্ধ হইলেন, আবার শ্যামার বিষম রূপরাশি আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক বিকার-গ্রস্ত করিয়া তুলিল। তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন—"নরহত্যা—ভ্রাতৃহত্যা—গুরুহত্যা যদি তোমার মূল্য হয়, আমি তথাপি তোমায় কিনিব—শ্যামা তুমি আমারই।"

শ্মশান-ক্ষেত্রে গলিত শব দেখিয়া শৃগাল গৃধিনী যেরূপ আনন্দ ধ্বনি করিয়া থাকে, শ্যামা সুন্দরী কৈলাসের ভয়ঙ্কর প্রেমপ্রতিজ্ঞা শুনিয়া সেই রূপ অট্ট হাসি হাসিলেন—গভীর রজনীতে সেই হাসি তৃতীয় ব্যক্তি শুনিয়া শিহরিল। তৃতীয় ব্যক্তি সেই স্কুল-মাষ্টার।

সপ্তদশ অধ্যায়।

কৈলাস বাবু স্কুলমাষ্টারকে দশটাকা মূল্যের লোক মনে করিয়া দশটাকা ওজনের আলাপ করিতে বলিয়া ছিলেন—স্কুলমাষ্টারও তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাহা শুনিয়া কৈলাস বাবুর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। স্কুলমাষ্টার কৈলাস বাবুর কাণে কাণে বলিয়া ছিলেন "নরহত্যা—ভ্রাতৃহত্যা—গুরুহত্যা।"

* * * * *

বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে নাই। মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছেন, "লোভে পাপ, পাপে বিপদ" বিশ্বনাথের মহা বিপদ উপস্থিত। যে প্রজা আগে চারি আনা কর দিত বিশুবাবু ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তাহার কাছে; এর টাকা আদায় করিতে ছিলেন। ইহার উপর নায়েব তহশিলদারের পূজা, আয় কর ও পথ কর; তাহার উপর স্কুল শ্রাদ্ধ পুষ্করিণী খনন, বাইনাচ যাত্রা, গান দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতির চাঁদা—সুতরাং প্রজারা একেবারে অশক্ত হইয়া পড়িল—অশক্ত হইলে ঘটী বাটী ঘর বাড়ী বিক্রয় ও কয়েদ অনাহার ও কৃষি কার্য্যে ব্যাঘাত—এ সকল কতদিন সহ্য হয়? তথাপি নিরীহ প্রজা সহিতে ছিল।

যে স্কুলমাষ্টারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম মাধব সান্যাল, বয়স ৪০, তথাপি দেখিতে অনেক অল্প বয়স বলিয়া বোধ হয়। লেখা পড়ায় অতি পণ্ডিত, স্বভাব উদাসীনের মত। সুখ দুঃখ, ভয় লোভ বা অহঙ্কার শূন্য। ঠিক এই কারণে, কি অন্য কোন কারণে, বিদেশে দশটাকায় মূল্যবান জীবন গত করিতেছেন, সম্প্রতি বলিতে পারি না। যাহাই হউক

মাধব একদিন স্কুলে বসিয়া একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অরুণ" "বিমল" "কিরণ" প্রভৃতি স্কুলে আসে না কেন? বালক বলিল "অরুণের বাপ মরিয়াছে।"

"কি হয়ে ছিল?"

"জ্বর ও রক্তউঠে।"

"কদিনকার জ্বরে?"

"মশাই ঠিক জ্বর নয়, খাজনা দিতে পারে নাই বলে জমীদারের লোকে ধোরে নে যায়, নে গিয়ে বড় মারপিট্ করে, মার খেয়ে অজ্ঞান হয়—সেই অজ্ঞান অবস্থায়ই জমীদারের লোকে বাড়ী ফেলে রেখে যায়—পর দিন রক্ত উঠে ও ধনুষ্টঙ্কার হইয়ে মারা যায়।"

মাধব কিছু না বলিয়া কিছু কাল চিন্তা করিলেন—পরে বলিলেন—

"বিমল ও কিরণ এসে নাই কেন?"

"বিমলের বাপকে কয়েদ করেছে।"

"তাতে বিমলের কি?"

"সে পিতলের ঘড়া ও লেপ বিক্রী করে তার বাপকে খালাস করতে গেছে।"

মাধবের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল—মুখ বিকৃত করিয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন "কিরণ।"

"আজ্ঞে তাদের একটী ভাল গোরু ছিল—সেইটি নাযের মশাই জোর করে নিয়ে গেছেন, তাই ছোট খোকা দুধ পায় না, কিরণ দুধের চেষ্টায় থাকে, পড়া তৈয়ার করিতে পারে না, স্কুলেও আসে না।"

এই কথা শুনিয়া মাধব ধীরে ধীরে আপন বাসায় আসিলেন—বাক্স খুলিয়া টাকা লইলেন—সেই দিনই বেতনের দশ টাকা পাইযাছিলেন, দশটাই লইলেন, নিজের প্রয়োজন ভুলিয়া গেলেন, স্কুলে আসিয়া সেই বালকটির হাতে সেই দশটী টাকা গোপনে দিয়া বলিলেন,"অরুণের মাতাকে ৫৲ বিমলের পিতাকে, ২৷৷৹ আর কিরণকে ২৷৷৹ টাকা দিবে, কে দিয়াছে বলিও না—আমার নাম করিও না।"

আজকাল—এরূপ কাজ যে করে, তাহাকে স্বার্থপর জগতের অনেক হীন ও নীচাশয় কীট ফুল (fool) অর্থাৎ নির্ব্বোধ বলিয়া টিটকারি দেয়।

মাধব নির্ব্বোধ কি সুবোধের কাজ করে, বলিতে পারি না—তবে একথা বলিতে পারি, তিনি এরূপ কাজ সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

সভ্য সমাজ অনেক সময় অকৃতজ্ঞ, কেন না তাঁহারা তর্কের পাণ্ডিত্য বলে অকৃতজ্ঞতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শক্তি রাখেন। কিন্তু নিরক্ষর সমাজ কদাপি অকৃতজ্ঞ নহে। মাধবের নিকট অনেকে কৃতজ্ঞ। মাধবকে অনেকেই গৃহ দেবতার মত ভালবাসে। বিশেষত মাধবের সেই অযাচিত দানের পর হইতে কত দুঃখী প্রজা আসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া দুঃখের কথা তাঁহার কাছে কয়—মাধবের ক্ষুদ্রসাধ্য; ক্রন্দন শুনিয়া আপনি কাঁদেন—এভাবে কিছু দিন গেলে, তিনি একদিন বলিলেন—

"ভাই সকল,—ভাবিয়াছিলাম বিশু বাবুকে বলিয়া তোমাদের উপকার করিব—কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা—তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—সুতরাং তোমরা এখন সোজা পথে যাও—সকলে দল বাঁধিয়া খাজানা বন্ধ কর—জমীদারের লোক আসিলে মারিয়া তাড়াইয়া দেও—সকলে একত্র হইয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ কর। জমীদার জোর জুলুম ছাড়িয়া মোকদ্দামা করিবে—তোমরাও করিবে। আমার চিঠি লইয়া "ক—বাবুর" কাছে যাও তিনি তোমাদের দলপতি হইবেন—আমার কাছে আর আসিও না—তাঁহারই পরামর্শে চলিও।"

* * * * *

প্রজারা নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা জিতিল—প্রজার চক্ষু ফুটিল এখন তাহারা প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহী। এই মোকদ্দমায় বিশুবাবু কলিকাতা গিয়াছেন। তিনি বাড়ীতে থাকিলে হয়ত রাম চণ্ডালের জামাই তাঁহার দ্বারবান কর্ত্তৃক ধৃত হইত না। কেন না, এখন হইতে প্রজামাত্রকেই তিনি বড় ভয় করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বংশীধর লগুড়াঘাতে পতিত হইলে, কৈলাস বাবু ভয়ে তাড়া তাড়ি বাড়ী যাইয়া দুইজন দ্বারবান তথায় পাঠাইয়া দেন। তাহারা যথা স্থানে আসিয়া রামার জামাতাকে দেখিতে পায়। তাহারা বিচারক নহে, লোক

ধরিতে আসিয়াছে—বংশীধরকে কে মারিয়াছে, তাহাদের অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই সুতরাং যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে।

এ কাজটা যে রামার জামই কর্ত্তৃক হইয়াছে, তাহা সহজেই কৈলাস বাবু বিশ্বাস করিলেন। কৈলাস বাবু কেন, আমরা হইলে আমরাও বিশ্বাস করিতাম সুতরাং কৈলাস বাবু তাহাকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভয় দেখাইলেন, অবশেষে মার পিট পর্য্যন্ত করিলেন—তথাপি সে কিছু বুঝিতে পারিল না বা দোষ স্বীকার করিল না।

এসময় মাধব আসিয়া একটু ক্রোধ স্বরে বলিলেন—" Unhealthy sons their sires' disease reveal."

কৈলাস বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি বল্লে? যত বড় মুখ ততবড় কথা!"

মাধব হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন "Boy spare the spur, and tightly grasp the reins."

কৈলাস অধিকতর রাগিয়া বলিলেন "দেখ মাষ্টার! বড় পাগলামী করো না?"

"পাগলামী কে করে?"

"তুমি"

"আমি, না তুমি।"

কৈলাস এবার ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন—হস্তস্থিত ছড়ি তুলিয়া বলিলেন "দেখেচ।"

মাধব একপদ সরিয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে মধুরে বলিলেন " *Whosoever is out of patience, is out of possession of his soul.*"

কৈলাস মাধবের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন—দেখিলেন, মাধব গম্ভীর—প্রশান্ত, রাগ কিম্বা উত্তেজনার কোন চিহ্ন তাঁহার শরীরে নাই—তাঁহার চক্ষু হাসিতেছে, ভ্রূ সরল, বদনে মধুর হাসি—যেন কিছু লজ্জা পাইয়া বলিলেন—"কটু কহিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না।"

মাধব সেই ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—যেন কোন বিরাট পুরুষ অতিক্ষুদ্র—দুর্ব্বল—ও রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্রাটের ভাষায় বলিতেছে,—বলিলেন "ইহাকে ছাড়িয়া দাও—এ নির্দ্দোষী।"

কৈলাস বলিলেন "এ নির্দ্দোষী নয়—ছাড়িয়া দিব না।"

মাধব বলিলেন "আমি বলিলাম, এ নির্দ্দোষী ছাড়িয়া দাও।"

"এ বংশী চক্রবর্ত্তীকে অপমান করেছে।"

"মারিয়াছে বল ?"

"মারিয়াছে।"

"ও মারে নাই।"

"তবে কে মেরেছে ?"

"আমি"

কৈলাস বিশ্বাস করিলেন না—বৈঠক খানায় চলিয়া গেলেন—যাইবার বেলা দ্বারবানকে বলিলেন "পাঁড়ে এস্কো ছোড় মৎ—ডেহুড়িমে লে যাও।"

মাধব দেখিলেন, কৈলাসের সহিত বাদানুবাদ বৃথা হইল—সুতরাং তিনিও চলিয়া গেলেন।—যাইবার বেলা কৈলাস শুনিতে পান এই ভাবে বলিলেন—
" Philippis iterum me videovis "*

* * * * *

* * * * *

দিন গেল রজনী আসিল—আবার গভীর রজনীতে গ্রাম ডুবিল। আবার সেই দ্বিতল হর্ম্ম্য কক্ষে আলোক স্ফুরিত হইল—দুই খানি হাসি মুখ আবার পৃথিবী, বিশ্বাস ও নীতিকে বঞ্চনা করিতে লাগিল।

কৈলাস বলিলেন—"আমার ছুটি ফুরাইয়াছে—আর থাকিতে পারি না।" শ্যামা দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"আর পড়িয়া প্রয়োজন কি ? এ সকলই তোমার ; চাকরিত করিতে দিব না—কোথা যাবে ?" কৈলাস ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন "তোমার কথায় আমার ভয় হয়।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভয় নয়, আমায় ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না বল", কৈলাস বলিলেন—"তা নয়—বুঝিতে পার না, পরন্তু দাদা বাড়ী আসিবেন—যদি জানিতে পারেন, প্রমাদ ঘটিবে—ভাবিয়া দেখ"। শ্যামা রোষ-কষায়িত লোচনে বলিলেন "যদি সে ভয় ছিল, আমায় মজাইলে কেন ?"

---

* আবার ফিলিপিতে আমার দেখা পাইবে।

"তোমার প্রাণে কি ভয় নাই?"

"ভয় থাকিলে, একাজ করিব কেন?

"দাদা জানিতে পেলে?"

এবারে শ্যামা বিছানার নীচে হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ধার ছুরি বাহির করিয়া দেখাইলেন। কৈলাস ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কহিলেন—

"আত্মহত্যা—স্বামীহত্যা !!—নর হত্যা !!! ভয়ঙ্কর পাপ।"

শ্যামা ছুরিখানি যথা স্থানে রাখিয়া বলিল "অসতীদের কাছে নয়।"

কৈলাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি বল, আমি বুঝিতে পারি না।"

"বুঝিতে পার না—তবে শুন, যে অসতী হইতে পারে, সে সব করিতে পারে—স্বামী না মরিলে অসতীর শান্তি নাই—নিদ্রা নাই—সুখ নাই।

"স্বামীর অপরাধ?"

"স্বামী বলিয়া।"

এই সময়ে দুম্-দুম্ শব্দ ও ভয়ানক একটা কোলাহল হইল। কৈলাস ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং যাইবার কালে আপন গৃহ হইতে একটা পিস্তল লইলেন, একজন ভৃত্য তাঁহাকে বলিল "বাবু—পালান, ডাকাত পড়িয়াছে।" কৈলাস সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন——দেখিতে পাইলেন ; সদর দরজায় কত গুলি লোক সবলে আঘাত করিতেছে ; আর পাঁচজন দ্বার রক্ষক "হাতি-য়ার-বন্দ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হিম্মৎসে রহো—ডরো মৎ"—এই সময় দরজার অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল—এক যোগে বিশ পঁচিশ জন বীভৎস-কায় মুখ-সক্ত লোক ভিতরে প্রবেশ করিল ; দেখিয়া "হানিবল্" পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল—কৈলাসও তাহাই করিতেন, কিন্তু ভয়ে দেহ পদ আড়ষ্ট, পরিলেন না। ডাকাতেরা এ ঘরে ও ঘরে কি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভুতবলে কৈলাসের দুই হস্ত দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া—বাম হস্তে কৈলাসের ভূপতিত পিস্তল লইয়া বজ্রগম্ভীর নাদে বলিল "যমালয়ে পাঠাই?" কে মৃদু শব্দে কহিল "আগে নারী বধ কর, পরে ব্রহ্মহত্যা করিও।" দলপতি সম্ভ্রম সহকারে সরিয়া দাঁড়াইল—কৈলাস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—"শ্যামা সুন্দরী।"

শ্যামাসুন্দরী কৈলাসের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন; দলপতি শ্যামাসুন্দরীর কাণের কাছে মুখ দিয়া কহিল "যাও শ্যামা, আজ প্রতিহিংসার দিন নহে।" শ্যামা পরিচিত স্বর শুনিয়া ক্রোধভরে ফিরিয়া চাহিলেন, এবং ক্রোধভরে বলিলেন, "এখনই পলাও।"

দলপতি নীরব; দল লইয়া চলিয়া গেল।

রজনী প্রভাতে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিছুই নষ্ট কিম্বা লুণ্ঠিত হয় নাই, কেবল রামার জামাতা নাই।

মৈথিল সাহিত্য—উষাহরণ নাটক।

মিথিলায় মুদ্রাযন্ত্র বিরল। মহারাজা দ্বারভাঙ্গার এক প্রেস আছে, তাহাতে রাজ ষ্টেটের ফারম-ফর্দ্দ ছাপা হয় (১)। কয়েক বৎসর অতীত হইল জনৈক বাঙ্গালী বাবু দ্বারভাঙ্গায় এক ছাপাখানা স্থাপন করেন। ইহা দাখিলা দস্তক ছাপিয়া কোনও রূপে নিজের অস্তিত্ব বহন করে। সম্প্রতি নাগরী অক্ষরে উপরি উক্ত ৩৫ পৃষ্ঠা পরিমিত মৈথিল নাটক এই ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মৈথিল পুস্তক মিথিলায় আর কখনও ছাপা হইয়াছিল কিনা, এবং কত কাল ছাপা হয় নাই, আমরা জানি না। আধুনিক মৈথিল রচনা পুস্তকাকারে, মুদ্রিত অক্ষরে, আমরা আর কখনও দেখি নাই, প্রথম এই দেখিলাম। ইহা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা প্রেসে মুদ্রিত; জনৈক বাঙ্গালী যুবক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

---

(১) এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর, শুনিয়াছি যে "রাজ দ্বারভাঙ্গা প্রেস" হইতে মৈথিল অনুবাদ সহ বিদ্যাপতি ঠাকুরের "পুরুষ পরীক্ষা" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

সিবিলিয়ান সাহেব মিষ্টার গ্রিআরসন্ প্রত্ন-তত্ত্ব আলোচনায় অবকাশ অতিবাহিত করেন। সাহেব বাহাদুর মধুবাণী মহকুমায় প্রবাস কালে মৈথিল ভাষার প্রতি দৃষ্টি চালাইয়াছিলেন এবং মৈথিলদিগের কথোপ-কথনের 'কায়দা' কথঞ্চিৎ বিশ্লেষ করিয়া উক্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হইতে পারে, সে চেষ্টা দুর্ব্বল, অপ্রচুর এবং বিপথ-গত। কিন্তু চেষ্টা, বটে। কখনও যদি মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ হয়,—হইবে কিনা জানি না,—সে ব্যাকরণ সঙ্কলনের প্রথম পথ-প্রদর্শক,—সুপথই হউক আর বিপথই হউক,—অবশ্যই বলিতে হইবে উক্ত সিবিলিয়ান সাহেবকে। আর যদি কখনও মৈথিল ব্যাকরণ না হয়, তাহা হইলেও উক্ত ভাষার প্রথম এবং শেষ ব্যাকরণ-কার মিষ্টার গ্রিআরসন।

অনেক ঘটনার মধ্যে উপরি উক্ত দুই ঘটনা, অন্তত আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত মৈথিলিদের পক্ষে বড় গৌরবের কথা নয়। মৈথিল ভাষা উপাদেয়। কিন্তু একান্ত উন্নতি সাপেক্ষ। সে উন্নতি সাধনার্থে উপযুক্ত ব্যক্তির উদ্যোগ আবশ্যক। আক্ষেপ যে, মাতৃ ভাষার প্রতি মৈথিলদিগের অত্যন্ত অবহেলা।

'উষাহরণ' নাটকের রচয়িতা জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম হর্ষনাথ ঝা; সুখের বিষয়, ইনি মৈথিল। নহিলে লজ্জা রাখিবার স্থানই থাকিত না।

'উষাহরণ নাটকের' ন্যায় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বা অন্য কোনও উন্নত সাহিত্য প্রসবিনী ভাষায় প্রকাশিত হইলে আদৌ উল্লেখ যোগ্য হইত না। তবে নাকি মৈথিল ভাষায় পুস্তক অতি বিরল, আর ইহাই নাকি আধুনিক মৈথিল ভাষায় মুদ্রিত অপেক্ষাকৃত আদি পুস্তক, আর ইহা হইতে নাকি মৈথিল ভাষার পুস্তক লিখিত ও মুদ্রিত হইলেও হইতে পারে; তাই এ পুস্তকের এ উল্লেখ। আর উল্লেখ এই জন্য যে, বিদ্যাপতির পর হইতে মৈথিল কৃত মিথিলার সঙ্গীত আমাদের বাঙ্গালী মহলে অনেকেই না শুনিয়া থাকিবেন; যদিও কেহ কেহ শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্পই হইবে। অতএব বিদ্যাপতির সুদূর পরবর্ত্তী এই উষা হরণের এক আধ গীতি পাঠককে শুনাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

কেবল গানই শুনাইয়া দেওয়া যাইতেছে, আর কিছুই কিন্তু নয়। উষা হরণে গান গুলিই মাত্র মৈথিল ভাষায় বাঁধা ; নাটকের কথোপকথন গদ্যাংশ সংস্কৃত। ইহাও এক বড় তামাসা। যাহা হউক মৈথিল গদ্যের আস্বাদ আমরা আপাত সাহিত্যামোদীদিগকে দিতে পারিতেছি না, এজন্য যথেষ্ট দুঃখিত।

মৈথিল ভাষায় রচিত গ্রন্থের গদ্যাংশ সংস্কৃত হইল কেন? পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ? অথবা মৈথিল গদ্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার উপযুক্ত নয় ভাবিয়া নাটককার তৎপ্রতি অবজ্ঞা করিয়াছেন? অবজ্ঞা কি আশঙ্কা—মৈথিল গদ্য ব্যবহার সম্বন্ধে?

মৈথিলিদের মধ্যে অনেকে কথোপকথনে ও লিখনে, তাঁহাদের মাতৃ-ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ব্যবহার করেন। কি জন্য জানি না। বোধ করি সৎশিক্ষা ও সভ্যতার প্রকাশার্থে সে টা করিয়া থাকেন। 'লেখাপড়ায়' বিষয় ব্যাপারে,—সরকারী ও বেসরকারী সেরেস্তায় মিথিলা প্রদেশে মৈথিল ভাষার চলন একেবারেই নাই। শুনিয়াছি, শুনিতে পাই, "সাদি বিহা" প্রভৃতি শুভকর্ম্মের ও শ্রাদ্ধাদির চিঠি পত্র নাকি মৈথিল ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। নহিলে আর সকল কাজেই উর্দ্দু। মৈথিলিরা আপনাদের মধ্যে কথা বার্ত্তায় মাতৃভাষা বলেন বটে, কিন্তু উর্দ্দু বলিতে না জানা—অশিক্ষার লক্ষণ। বলা আবশ্যক, মিথিলায় ইংরেজির চলন আজিও তেমন হয় নাই, হয়ে কেবল উঠিতেছে।

তা. সমালোচ্য নাটকে উর্দ্দু ব্যবহৃত না হইয়া যে সংস্কৃত হইয়াছে, ইহা কিন্তু সৌভাগ্য। পরন্তু উষা অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণ, নারদ প্রভৃতি নাটকে উল্লিখিত দৈত্য দানবী ও দেবতাগণ মাড়ুয়া-মকাই ও অন্ন ভোজী মানব-মানবী-মুখ-নিঃসৃত মৈথিল ভাষায় কথা কহিবেন, ইহাই বা কেমন কথা! আর তেমন কথা বলিতেই বা কে সাহস করে? নারদ 'প্রণমামি'র পরিবর্ত্তে "মূঢ় লগইছি" কহিবেন, অথবা উষা "হা হতোস্মি"র বদলে "হাইরে বাপ" বলিয়া বিলাপ করিবেন, এরূপ প্রস্তাব করিতে মিথিলায় কেন, মর্ত্ত লোকের মধ্যে কে সাহসী? কেহই সাহসী নয়,—বোধ করি সেই জন্যই আমাদের নাটক-কার সাহসী হয়েন নাই। গদ্যচ্ছন্দে স্বদেশীয় ভাষা সকলের সামনে বাহির করাটা, তিনি অসঙ্গতই ভাবিয়া থাকিবেন।

গানে যাহা চলে, গদ্যে তাহা চলে না। মৈথিলিতে গানের ভাষা প্রস্তুত পরিপক্ক; গদ্যের ভাষা আদপে গঠিত হয় নাই। উক্ত ভাষায় গান বাঁধা বাহাদুরি নয়। সে কালের সেই "বাঁধিগৎ" আছে, যেমন তেমন করে যুড়ে দিলেই গান। গদ্য গঠিত হয় নাই, কাযেই তাহা গঠিতে সমধিক শক্তি প্রয়োজন, ততোধিক সাহস প্রয়োজন। মৈথিল গদ্য লেখা আপাতত অসম্ভব না হইলেও তাহা লিখিতে ও লিখিয়া ছাপাইতে লোকে সাহস করে না। তার পর ছাপিবার খরচ দেয় কে,—ছাপিলে খরিদই বা করে কে? আমাদের উল্লিখিত পুস্তিকা শুনিয়াছি, এক কাপিও বাজারে বিক্রীত হয় নাই,—কতক গুলি কাপি বিতরিত হইয়াছে মাত্র। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কৃপায় প্রকাশককে পুস্তক মুদ্রনের ব্যয় ভার বহন করিতে হয় নাই। এবিষয় মহারাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর না হইলে, প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন।

উষা হরণের ইতিহাস সকলেই জানে,—অন্তত জানিবারই কথা। এখন কার নাটক নাটিকা পড়িয়া সেটা জানা, কিছু আর ভাল দেখায় না। তা ভালই না হয় দেখাইল। এখনকার নাটক নাটিকা উদ্ভটাদি পড়িয়াই প্রাচীন কাহিনী জান, শিখ. কিন্তু সে জন্য সমালোচককে পীড়াপীড়ি কেন? কিন্তু এ বোধটা এখনকার বাজারে বড় একটা আছে বলে বোধ হয় না। কতকগুলি লোকের বিবেচনায় পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন আখ্যান শিক্ষণীয় আধুনিক উদ্ভটাদিতে,—তাহাও আবার সেই উদ্ভটাদির সমালোচকের মুখে,—সংবাদ পত্রের মারফতে। বলিহারি বিবেচনা! এই ত বলি বুদ্ধি। সমালোচক যদি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের এবং শত সহস্র পুস্তকে লিখিত পুরাতন কাহিনী আদ্যোপান্ত অক্ষরে অক্ষরে খুলে না বলিল, তবে আর নিস্তার নাই, পাঠক প্রবর ক্রোধে অস্থির। পাণ্ডিত্যের ও পুরুষার্থের প্রচুর লক্ষণ এই ত বটে। তা হউক, উষাহরণের ইতিবৃত্ত আপাতত আওড়াইতে পারিতেছি না।

আলোচ্য অঙ্গুষ্ঠ পরিমের এই নাটক এক আধটী নয়, পাঁচ-পাঁচটী অঙ্কে পরিশোভিত। নাটককার আর যাহা করুন, না করুন, অলঙ্কার-কারের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি নিজেই একথা আমাদিগকে বলিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়াও দিয়াছেন।

পাঁচ অঙ্ক, গান ২০।২৫টী এ নাটকে আছে, সংস্কৃত শ্লোক দুই চারিটী আছে, হিন্দি 'দোহাও' আছেন। "টকত্ব বা 'নাটকত্বের' কোন পরিচয় দিয়া উঠিতে পারিব না। অনেক স্থানে একই ভাব—একই কথা—গীতে, 'গীতার্থে, শ্লোকে এবং 'শ্লোকার্থ' দোহায় প্রকাশ। ইহাতেও শুনিলাম আলঙ্কারিকের আজ্ঞা আছে। মোটের উপর ভাবটা বোধ করিলাম এই যে, গীত শ্লোক এবং দোহা তিনই বাঁধিতে ও বানাইতে গ্রন্থকর্ত্তা সুপারগ।

"অপিচ" ও "অথবা" চিহ্নিত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ সংযোগে একই ভাব প্রকাশক গীতের পৌনঃপুনিক উক্তি। এই কারণেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এত গীতাধিক্য; কিন্তু গীতাধিক্য ইহাতে হইবারও কথা; কেননা যাত্রা ওয়ালা কর্তৃক অভিনীত হইবার জন্যই ইহার এবং এতদনুরূপ পুস্তিকার বা পালার প্রথমসৃষ্টি।

প্রথম অঙ্কের আরম্ভে এই গীত ;—

রাগ ইমন।

জয় জয় কুমতি-বিনাশিনি দেবি, সব অভিমত পুর, তুয় পদ সেবি।
তনুরুচি নিন্দিত কুন্দক ভাস, আনন রুচি শশি বিম্ব উদাস॥
আসন ধবল কমল, শশিভাল, শ্বেত বসন লস নয়ন বিশাল॥
বীণা দণ্ড কলস ধরু হাথ, জপমালা বরপুস্তক সাথ॥
হর্ষ নাথ কবি মনদয় ভান, ভগবতি করিয় অভয় বরদান॥

এই 'গীতার্থে' সংস্কৃত এক শ্লোকেও আছে। শ্লোক সুমিষ্ট শব্দ সমন্বিত। কিন্তু তা শুনাইবার সময় আমাদের নাই। স্থানও নাই। তার পর "নান্দ্যন্তে সূত্রধার।" সূত্রধারের সূত্র সবই সংস্কৃত। অতএব আমাদের শ্রোতা সে বিষয়ে মার্জ্জনা করিবেন। তৎপরে নটীর প্রবেশ,—

রাগ বসন্ত।

মদন নরেশ বিজয় মনকাজ, লয় পরিজন অনুগত ঋতুরাজ॥
শোভিত অলি ততি মরকত মাল, কেশর মণিময় ছত্র বিশাল॥
মারুত কম্পিত মাধবি পুঞ্জ, নাচত রসময় ভবন নিকুঞ্জ॥
অলিকুল গুঞ্জিত গানবিলাস, চম্পক কিংশুক দীপক ভাস॥

কোকিল কলরব নৃপতি নিদেশ, চলত সমীরণ দণ্ড উদেশ ॥
নিরখি সুরত বিঘটন অপরাধ, করত কোপ তহ মানক বাধ ॥
রসময় হর্ষনাথ কবি ভান, নৃপ লছমীশ্বর সিংহ রস জান ॥

নৃপ লছমীশ্বর সিংহ দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুর, কে, সি, ই, আই।

"ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যাং সহিতা উষা।"

রাগ কল্যাণ।

তড়িত বিনিন্দক সুন্দর বেশ, গজ-গামিনি কামিনি পরবেশ ॥
অলক কলিত আনন অভিরাম, জনি ঘন বলিত বিমল হিমধাম ॥
অধর ললিত, নাসা অতি শোভ, কীর বৈশল জনু বিম্বকো লোভ ॥
নিরখি যুগল কুচ পঙ্কজ কাঁতি, চলতি রোমাবলি মধুকর পাঁতি ॥
অবিরল নুপুর কিঙ্কিনি রাব, মদন বিজয় জনু সামগ গাব ॥
রসময় হর্ষনাথ কবি গাব, নৃপ লক্ষ্মীশ্বর সিং বুঝু ভাব ॥

উষাস্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া, সখীকে বলিতেছেন ;—

হে সখি হে সখি করহ উপাই,
বিরহ বেদন সখি সহলো ন যাই।
সকল পুরুষ রূপ মন অবধারী,
লয় পট, ত্রিভুবন লিখহ বিচারী।

ইত্যাদি।

অনিরুদ্ধ উষার উদ্দেশে,—

রাগ দেশ।

সে মোর প্রাণ পিয়ারি, সুকুমারী। কখন মিলতি বরনারী ॥
স্বপন দরশ মোহি ভেলা, বিহদেলা। কয়োন হরণ কর লেলা ॥
লোচন বিষময় বাণে, নহি আনে। যে মোর হরল পরাণে ॥
কি করব হমপরকারে, সনসারে। তনি বিনু লাগু অন্ধারে ॥
হর্ষনাথ কবি ভানে, পরমাণে। মিথিলা পতি রস জানে ॥

বাণাসুরকে দেখুন ;—

বাণ নৃপতি যব দেল পরবেশ, কাঁপথি ধরণী কচ্ছপ শেষ।
সহস্র বাহু গিরি সদৃশ শরীর, নয়ন নিরখি কেয়ো বহয়ন থীর॥
মদ্যপান কর লোচন লাল, কাল সদৃশ তনু বদন করাল॥

*　　*　　*

নায়ক নায়িকার রস-বিলাসের নমুনাও লউন,

চলতি শয়ন গৃহ সুন্দরী (সজনি) নীল বসন তনু সাজি।
কনক লতা জনি বৈসল (সজনি) অবিরল মধুকর বাজি॥
স্ফটিক বিন্দু অরু সিন্দুর (সজনি) বিন্দু বিরাজিত ভাল।
হেলি পঙ্কজ রবি শশি (সজনি) উদিত ভেল এক কাল॥

*　　*　　*

চললি কেলিগৃহ সুন্দরী রে, সখি করগহি খেলা॥
প্রথম সমাগম মন পুনি রে, তনু পুলকিত ভেলা॥
লোলিত কোরু মুখ পঙ্কজ রে, ছবি দেত বিশেষ॥
জনি পুরণ শারদ শশি রে, দামিনি পরিবেশ॥
চিকুর বিরচি কসি বান্ধল রে, বিষধর পরচারে।

*　　*　　*　　*

তারপর ক্রমে ক্রমে,—

বিরহ দগধ মোর তনু অনুমানী।
বচন সুধারস সিচহ সেয়ানী॥
বসন দূর কর, আনন চন্দা।
নয়ন চকোর মোর করু সানন্দা॥
কর জোড়ি বিনতি করিয় হম তোহী।
এক বেরি নয়ন নিহারিয় মোহী॥
অধর অমিয় রস করু পরগাসে।
করিয় কৃতারথ অনুগত দাসে॥ ইত্যাদি।

একটা 'শ্যামা বিষয়ের' এক আধ চরণ শুনুন ;—

জয় জয় মহিষ বিনাশিনী ভগবতি সিংহ-গমনী জগদম্বে।

ত্রিভুবন তারিণী বিপদ নিবারিণী সকল ভুবন অবলম্বে॥
ত্রিদশ তপোধন দনুজ মনুজগণ চিকুর নিকুর অভিরামে।
তুয় পদ চিন্তন বিমুখ সতত মন কি হুহ হোয়েত পরিণামে॥ ইত্যাদি।

গান কয়েকটার নমুনা দেখিয়া, মৈথিল ভাষা বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ অনুরূপ বলিয়া বোধ হইবে। বস্তুত বিশুদ্ধ মৈথিল ভাষা বঙ্গভাষারই অনুরূপ, কারণ উক্ত উভয় ভাষারই শব্দ সমূহ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মূলক এবং তৎ তৎ ভাষা হইতে সংগৃহীত। বড়ই আক্ষেপ, অপরিসীম লজ্জা যে, সুললিত মিষ্ট মৈথিল, নিজের বিশুদ্ধ ভাব হারাইয়া, ইতর শ্রেণীর উর্দ্দুর সহিত মিশিয়া একটা শ্রুতি-কটু সঙ্কর জাতীয় কুভাষায় পরিণত হইতেছে। কিন্তু নাটক সমালোচনই আমরা করিতেছিলাম। নাটকে নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ, প্রেম, স্বপ্ন, সোহাগ, বিরহ, বিলাস সবই আছে। বসন্তের বিকার কোকিলের ঝঙ্কার, অনঙ্গের অত্যাচার, বিষয়ক মামুলী গীত আছে।

উষা অনিরুদ্ধের প্রেমে এপুস্তকে অনঙ্গের অত্যার অবিচার ব্যতীত অবশ্য আর কিছুই নাই। সে দোষ কিন্তু "কবি হর্ষনাথের" নয়, আমাদের স্বজাতীয় সুকুমার সাহিত্যে, সচরাচর যে রূপ দেখা যায়, তাহাতে নায়ক নায়িকার প্রেমে অনুরাগে প্রায়ই কেমন একটা অকথনীয় পাশব লালসা বিদ্যমান,—কেবল বিদ্যমান নয়,—তাহারই বাড়াবাড়ি। প্রেমের অধিনায়ক অনঙ্গ, প্রতিপালক অনঙ্গ, পরিচালক তাহার পঞ্চশর। প্রণয়ের আরম্ভ এবং শেষ, আদ্য-মধ্য-অন্ত সর্ব্বত্রই যেন কেবল শারীরিক সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধের সাংঘাতিক প্রাধান্য, অত্যন্ত অনাবৃত পরিচালনা। কথাটা আমাদের গৌরবের নয় কিন্তু সত্য। সত্য কথা সাহস করিয়া কিন্তু বলাও ভার। কারণ, আধ্যাত্মিকতা আজকাল বড়ই সস্তা। ময়রার মঞ্চে, মুদির দোকানেও সে দ্রব্য পাওয়া যায়, পশুরি দরে বিক্রয় হয়। সৌভাগ্যের চিহ্ন সন্দেহ কি? একদিন মধ্যাহ্ন কালে কোন মহাত্মা অনঙ্গের অঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রলেপ লেপিয়া ঢোল ধ্বনিতে হয় ত শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী তোল পাড় করিতে পারেন। এমন অবস্থায় অনঙ্গের উদ্দেশে আর অধিক অসদ্ভাব ব্যঞ্জক আলোচনা ভাল নয়।

আমাদের আলোচ্য কবির আর যে দোষই থাকুক, তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়। সে সম্বন্ধে তাঁহাকে একটী কথাও বলিবার যো নাই।

আমাদের বাঙ্গলায় আজকাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধের মন্ত্রেও ইংরাজির যে একটা আধিভৌতিক আঘ্রাণ পাওয়া যায়, উষাহরণে তাহার লেশও নাই। এখনকার দিনে ইহা একটা খুব দুষ্প্রাপ্য দর্শন। হর্ষনাথের পুস্তিকায়, য়ুরোপীয় বা ইংরেজি, ভাবের গন্ধ স্পর্শ নাই।

সমালোচনী পত্রিকা।

আধুনিক কালের সমালোচনার সহিত, সমালোচনী পত্রিকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাময়িক পত্রের আবির্ভাব কালাবধি সমালোচন-সাহিত্যের যথেষ্ট সৃষ্টি হইতেছে, এবং সাময়িক পত্রের বহু বিস্তৃতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, উক্ত সাহিত্য সমূহ প্রকাশ লাভ করিতেছে। এ কালের সর্ব্ব প্রধান-সাহিত্য যন্ত্র—সম্বাদ ও সাময়িকপত্র। সাময়িক পত্রে সর্ব্বশাস্ত্রের সংহিতা লিখিত ও প্রকাশিত হয়। পরন্তু, এই সাময়িক সাহিত্যে যাহা কিছু, এবং যত কিছু, সৃষ্ট বা উৎপাদিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার প্রায় তিন ভাগ সমালোচনা, আর এই সমালোচনাই এখানকার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। উচ্চ, মধ্য, নিম্ন, যে শ্রেণীরই সমালোচনা হউক, প্রথমত, সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। এইরূপ অধিকাংশ সমালোচনা অবশ্য সময়ের সঙ্গে সাময়িক পত্রেই লীন হইয়া যায়। উহাদের মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ সারগর্ভ ও সময় নির্ব্বিশেষে সাহিত্যের শোভা সম্পাদনে সমর্থ, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া, চিরস্থায়ী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায়ও এবম্বিধ পুস্তক আজ কাল দুই চারি খানি করিয়া, প্রকাশিত হইতেছে। তবে সে সকল পুস্তকের সমস্তই যে, সাহিত্য গণনায় স্থায়িত্ব লাভ করিবার যোগ্য, তাহা না হইতে পারে। ফল কথা এই যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই যে, রচনা স্থায়ী হয়, এমন মনে করাই মহা ভ্রম। যাহাতে স্থায়িত্বের পরিপক্ক সজীব বীজ থাকে, তাহাই কেবল স্থায়ী হইতে পারে। নতুবা পুস্তকের শত সংস্করণেও অসার ভাবকে চিরজীবী করিতে পারে না।

মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টি হওয়ার পরেও অনেক দিন যাবৎ লেখক ও পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। তৎকালে অক্ষম অদূরদর্শী লোকে গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, তাহার দোষ অন্যকে বড় একটা প্রদর্শন করিয়া দিতে হইত না। তাহা অবিলম্বে নিজের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতায় নিজে নিজেই পতিত হইত। অপাঠ্য অযোগ্য পুস্তক কদাচিৎ মুদ্রিত হইত এবং মুদ্রিত হইলেও সমালোচক কর্ত্তৃক তাহার দোষ ঘোষিত হওয়ার আবশ্যক হইত না। তাহা পাঠকের অভাবেই বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইত। কেননা তখন পাঠকের সংখ্যা অল্প হইলেও সাধারণত পাঠকদিগের পাণ্ডিত্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ছিল। কিন্তু যখন সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃতির ও মুদ্রাযন্ত্রের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও লেখকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন অবস্থা দাঁড়াইল, আর এক রকম। সে অবস্থা কি রূপ অভিজ্ঞকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। আমাদের এই অদ্যকার বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি একটু আলোচনা করিলে সে অবস্থার অনুভূতি জন্মিতে পারে। সাধারণ্যে যে শিক্ষা * সচরাচর বিস্তৃতি লাভ করে, তাহা স্বভাবতই তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। তাহা স্বভাবতই খুব হাল্কা পাতলা তরল, স্বভাবতই তাহার প্রসর অল্প। সুতরাং তদ্দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা সংকীর্ণ, অত্যন্ত সীমা বদ্ধ। সে শিক্ষা, সে জ্ঞান, প্রকৃষ্ট না হউক, তদ্দ্বারা পঠন প্রবৃত্তি জন্মে, সে প্রবৃত্তি স্থল বিশেষে বিলক্ষণ প্রবলও হয়। সাধারণ শিক্ষায় সাধারণ্যে অধ্যয়নে রুচি জন্মে, কিন্তু শিক্ষার অপ্রসার প্রযুক্ত সুরুচির বিকাশ হয় না। এক দিকে এই রূপ, অপর দিকে পঠন-ক্ষম লোক ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে লেখক সংখ্যা স্বভাবতই বাড়িয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে বিস্তর অনুপযুক্ত লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দেন। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যেই দেখুন না, কিছুকাল হইতে লেখক ও গ্রন্থকারের সংখ্যা কতটা অধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ অধিক সংখ্যক অপেক্ষাকৃত অযোগ্য লোক! ফল, উপরি উক্ত অবস্থায় সাহিত্য সম্ভ্রম লাভের জন্য বিস্তর উমেদার উপস্থিত হয়েন। নাটক, নবেল, উপন্যাস, ইতিহাস কাব্য, উপাখ্যান, গদ্য, পদ্য

---

* শিক্ষা মানে এস্থলে অল্প লেখা পড়ার জ্ঞানটাই বুঝিতে হইবে।

বিপ্লব উৎপাদিত এবং মুদ্রা যন্ত্রের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত মুদ্রিতও হয়। অনেক অনুপযুক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রতিপত্তিও করে। কারণ এই যে, মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষার পরিপক্কতা অভাবে সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণাগুণ বিচারে সমর্থ হয়েন না। অনেক সময়েই অসারতা এবং ইতরতা-প্রবণ সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়েন। এই রূপে যখন গ্রন্থকারগণ স্বস্ব গ্রন্থ হস্তে দলে দলে সাহিত্য-সম্ভ্রমের প্রয়াসী, যখন সমাজের নিম্নতর স্তরও পুস্তকে পরিপ্লাবিত, তখন এমন তর এক শক্তি বা শাসনের স্বভাবতই প্রয়োজন হইয়া উঠে, যদ্দ্বারা সাহিত্য সংসারে সুবিচার সুরুচি এবং শান্তি সংরক্ষিত হইতে পারে। এই শক্তি বা শাসন যাহাই বল না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে সপ্রকাশ হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থান করিতে পারে। আমাদিগের সময়ে ঐ শক্তি বা শাসন সমালোচক কর্ত্তৃক সাময়িক পত্র সহযোগে নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছে। পাঠক ও লেখকের সংখ্যা বাহুল্যে সাহিত্যের যে অবস্থার বিষয় উপরে উল্লেখ করা হইল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ইউরোপে সাময়িক পত্রের ও সমালোচকের আবির্ভাব হয়। বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিলে, আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যেও ঠিক ঐ অবস্থায় প্রথম সমালোচনী পত্রিকার সৃষ্টি হইয়া সাধারণে সুরুচি সঞ্চার করে, সাহিত্যের রচনা ও রুচি মার্জ্জিত করে, সাধারণ পাঠককে সুবিচারের পথ দেখাইয়া দেয়, এবং সৌন্দর্য্য সম্ভোগের প্রকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কার করে। পরন্তু উহা ভিন্ন প্রকৃতির এবং নানা প্রকার মূর্ত্তির রচনার বিচারে বসিয়া সমালোচনাকে নানা রূপ নূতন পরিচ্ছদে সুশোভিত করে।

সমালোচনী পত্রিকা ক্রমে ক্রমে যে রূপ আকারে বর্ত্তমান ভাবে পরিণত হইয়াছে, সে রূপ আকারে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাহিত্যের সচ্ছল অবস্থাতেই সম্ভবে। উপযুক্ত গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে না জন্মিলে এবং সমালোচনা মার্জ্জিত ও মনোজ্ঞ না হইলে, সমালোচনী পত্রিকা সজীব থাকিয়া সাহিত্যানুরাগীর আন্তরিক আদর আকর্ষণ করিতে পারে না। সাময়িক সাহিত্য-পত্র রুচি ও সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের দিনপঞ্জিকা স্বরূপ। এই পঞ্জিকার পর্য্যালোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর অবকাশ কালের অনেকটা ব্যয়িত হইয়া থাকে, কিন্তু অনুপযুক্ত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যের ন্যায় সমালোচনী

পত্রিকার সংখ্যাধিক্যও বিষম বিরক্তি-কর। সাময়িক পত্রের সংখ্যাধিক্য জনিত বিরক্তি ইউরোপেও আছে, অজ্ঞ, অপরিপক্ক, অজাত শ্মশ্রু নাবালগগণ সমালোচনার সং গড়ে। তদ্দ্বারা সাহিত্য মতের সারবত্তা নষ্ট হইয়া সাহিত্যের শক্তিময় প্রাঙ্গনে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ও ইতরতা সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়।

সাহিত্যের সচ্ছল অবস্থা ব্যতীত সমালোচনী পত্রিকা পূর্ণ মাত্রায় চলে না। বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কাল হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ পুস্তক প্রকাশিত হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যের এখনও তাদৃশ সচ্ছল অবস্থা নহে—ইহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষার অসচ্ছল অবস্থা অথবা পূর্ণ সচ্ছল অবস্থা নহে অতএব বাঙ্গালায় সমালোচনা-ময় সাহিত্য পত্রের আশানুরূপ উন্নতি অদ্যাপি হয় নাই। এ কথা সত্য। সত্য বটে কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, সম্যক্ রূপে সত্য নহে। কেন না উপরোক্ত এক দিকের কথার সহিত অপর দিকের এক কথাও বলিতে হয়, বিলক্ষণ ক্ষোভের সহিতই বলিতে হয়, যে আমাদের সাহিত্য ও সমালোচন পত্রের উপস্থিত অবস্থায় যতটুকু উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, তাহাও হয় নাই, তাহাও হইতেছে না। বাঙ্গালা ভাষায় ভালই হউক, মন্দই হউক, পুস্তকের সচ্ছলতা যে এক বিন্দুও হইয়াছে, সে পরিমাণেও সমালোচনী পত্রিকার উন্নতি হয় নাই; উহার অধিকার ও পসার বৃদ্ধি হয় নাই; উহার স্বর সমুন্নত ও মার্জ্জিত হয় নাই। অধিক কি, আমাদের ভাষায় উচ্চ মধ্য নিম্ন যে শ্রেণীরই হউক, সাময়িকই হউক, অসাময়িকই হউক, সমালোচন পত্র প্রকৃত প্রস্তাবে একটিও নাই। এতদন্তর পত্র একটিও নাই যাহা হইতে (১) বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিদিন যাহা কিছু অল্প বিস্তর উৎপাদিত ও প্রচারিত হইতেছে, তাহার শ্রবণ-যোগ্য সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। (২) যাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট নব প্রকাশিত পুস্তক মাত্রেরই সমালোচনা বা উল্লেখ থাকে। (৩) যাহাতে পুরাতনের গবেষণার সহিত নূতনের আলোচনা করিয়া সাহিত্যের সকল দিকের সব কথার আন্দোলন হয়। এরূপ পত্র একটিও নাই (৪) যাহা রীতিমত ও নিয়মিত রূপে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া সাধারণের সাহিত্যমত ও রুচি সংগঠিত করিয়া দেয়। পরন্তু উচ্চ অঙ্গের, সুদীর্ঘ, সুরুচি মার্জ্জিত, বিদ্যাবত্তা গাম্ভীর্য্য সমন্বিত,

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রতি নিয়ত প্রকাশিত হয়, এরূপ উন্নত শ্রেণীর সাময়িক পত্র আমাদের নাই। মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তর হইয়াছে, বৎসরে বৎসরে হইতেছে এবং যাইতেছে, কিন্তু রীতিমত সমালোচন পত্র একটিও আমাদের এখন নাই, হইতেছেও না। উৎকৃষ্ট পুস্তক আমাদের সাহিত্যে অবশ্য আজ কাল অতি অল্পই উৎপাদিত ও প্রকাশিত হয়, যাহাও এক আধ খানি হয়, সমগ্র সাময়িক পত্রের স্তূপ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, বড় জোর বিজ্ঞাপন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সাময়িক পত্রের এ অবস্থা, একান্ত অসন্তোষ-কর, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবে কি উপকরণে আমাদের সাময়িক পত্র গুলি গঠিত ? আমাদের সাময়িক পত্র সমূহে বিবিধ বিষয় নানা উপকরণ থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল তাহাতে চলিত সাহিত্যের রীতিমত আলোচনা উল্লেখ থাকে না এবং পুরাতন ও পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের সমালোচনা গবেষণাও থাকে না। সাহিত্য এবং পুস্তকাদির যে যৎসামান্য ও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আলোচনা "কালে ভদ্রে" অমাদের পত্র পত্রিকা সমূহে দেখা যায়, তাহা সম্পাদকদিগের যদৃচ্ছা গৃহীত, "খাম খেয়াল" উৎপাদিত ; অতএব সুশৃঙ্খলা সমন্বিত নয় এবং তৎকার্য্য তাঁহাদের সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালনের পরিচায়কও নয়। তাহার প্রতি অক্ষরে যেন অনিচ্ছা, অবসাদ, তাচ্ছীল্য, আলস্য, ঔদাস্য এবং পরিশ্রম-কাতরতা মূর্ত্তিমান ; তাহা যেন এক প্রকার উপরোধ রক্ষা, হউক-ক্ষতি-নাই গোছের কাজ, রোগীর ঔষধ-সেবন-বৎ অমনোজ্ঞ ব্যাপার ; সংক্ষেপত তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর, আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যকতার একান্ত অনুপযোগী। আমাদের পত্র পরিচালকগণ সকলেই যে, এ বিষয়ে অক্ষম, তাহা নহেন, তাঁহারা অক্ষম অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমহীন এবং আলস্য পরতন্ত্র। যাহা অত্যন্ত অনায়াসে, বিনা অর্থে ও বিনা পরিশ্রম বিন্দু ব্যয়ে লিখিত ও সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা পাইলে আর আমাদের সম্পাদকগণ অন্য দিকে অগ্রসর হয়েন না ; কাজেই সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্র আমাদের বিস্তর হইয়াছে, কেন না চুটকী রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে ও চলিত সংবাদ সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না ; ইংরেজ সম্পাদকগণ সমস্তই গুছাইয়া দিতেছেন, একবার চক্ষু মেলিয়া বাঙ্গালা

অক্ষরে তুলিয়া লইলেই হইল। ইহা দেখিয়া মনে হয়, যদি ইংরাজী সংবাদ পত্র না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সংবাদ পত্র চালাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। সম্পাদকীয় শিল্পের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা অদ্যাপি উত্তমরূপে আমরা শিক্ষা করিতে পারিয়াছি, বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সাময়িক পত্র সমূহে হৃদয়-গ্রাহী উপাদেয় পাঠ্য বিষয় অনেক সময়ে থাকে; থাকে না বলিলে, মিথ্যা কথা হয়। কিন্তু মাসিক পত্রাদি চালান হইয়াছে, যেন নেহাত "অজগব ভিক্ষা"—হয়ত হইল, না হয় না হইল, গোছের ব্যবসা। পাঠক সাধারণের ইহাতে আর তাদৃশ উৎসাহ আজকাল দেখা যায় না, সম্পাদক ও পরিচালকগণের উৎসাহও যে কারণে হউক অত্যন্ত মন্দীভূত। সক করিয়া হউক, ইচ্ছায় বা উপরোধে হউক, যদৃচ্ছা গৃহীত কোন বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ পাঠাইয়া দিল, সম্পাদক ছাপাইলেন, না দিল, নিজে যা হয় একটা কিছু লিখিয়া পত্রের পৃষ্ঠা পুরাইয়া দিলেন! যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন, তাহা যে অপাঠ্য অনর্থক তাহা বলিতেছি না, বলিতেছি এই যে, সেই সকল প্রবন্ধ প্রকটন বিষয়ে কোন একটা পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত প্রায়ই থাকে না। এবং তদ্বিষয়ে পাঠক সাধারণের সাময়িক রুচি প্রকৃতি এবং প্রবন্ধ সমূহের বিষয় বৈচিত্র্য এবং তাৎকালিক যোগ্যতা বা অযোগ্যতা,—অনেক সময়ে আদৌ অনুশীলন করা হয় না। পরন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পাঠক ও গ্রাহকগণের অবহেলা অমনোযোগে, চুটকী-প্রিয়তায় ও অধ্যয়ন প্রবৃত্তির অভাবে এবং অদ্যকার "উপহার" রোগের প্রাদুর্ভাবে এবং সংখ্যাতীত সংবাদপত্র সাময়িক পত্রের অযথা আবির্ভাবে, সারবান্ সাময়িক পত্রের অবস্থা প্রায়ই স্বচ্ছল, হইয়া উঠে না; কাজেই এই সকলের সম্পাদকগণ ক্রমে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। ফলত বাঙ্গালী পাঠক সাধারণ প্রকৃত প্রস্তাবে পঠন-শীল হইয়াছেন কিনা, এবং বিস্তৃত বঙ্গভূমি, সারবান্ সৎ সাহিত্য গ্রহণে আপাতত উপযুক্ত কি না, এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ বিদ্যমান্। কিন্তু আমরা সাহিত্য ও পুস্তকাদি সমালোচনার কথাই বলিতে ছিলাম, তাহা বলাই আমাদের আদি লক্ষ্য, অতিরিক্ত যাহা বলিতেছি, সে কেবল আনুষঙ্গিক মাত্র। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশ

হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই অপকৃষ্ট পুস্তক, অপকৃষ্ট পুস্তকের উল্লেখ আলোচনায় ফল কি? ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই যে, অপকৃষ্ট পুস্তক অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই, তাহাদের উল্লেখ আলোচনার অধিকতর প্রয়োজন। উৎকৃষ্টের উল্লেখ আলোচনার দ্বারা, অপকৃষ্টের অপকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিতে পারিলেই, অপকৃষ্টের দ্বারা অপকারের সম্ভাবনা অল্প থাকে, সমাজের ও সাহিত্যের ইষ্টতা সাধিত হয়। এই ইষ্ট সাধন জন্যই য়ুরোপে সমালোচনা-ময় সাময়িক সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল।

সাময়িক পত্রের বর্ত্তমান অবস্থার উল্লেখ করিতে গিয়া আমরা বিস্তর বাহুল্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। অতঃপর, আমাদের সাময়িক পত্রের পূর্ব্ব কথা, কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। কেন না সেই কথাই এ প্রবন্ধে অধিকতর উপযোগী, কিন্তু সে অতি অল্পই কথা। বঙ্গদর্শনের সময় হইতেই আমাদের মধ্যে সাময়িক সমালোচন-সাহিত্য পত্রের প্রথম প্রাদুর্ভাব। ইহার পূর্ব্বেও সাময়িক পত্রের আবির্ভাব অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বতন্ত্র পথে, এবং স্বতন্ত্র প্রণালীতে। তদ্দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা সর্ব্বথা বিশিষ্টরূপে উপকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখন বাঙ্গালা গদ্যের অত্যন্ত শৈশব অবস্থা, সে অবস্থার সাময়িক পত্রের দ্বারা সাহিত্যাদি যতটা সাধনীয়, তাহা বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রিকাদি দ্বারা যথেষ্ট সাধিত হইয়াছিল। ১২৫০ সালে, তত্ত্ববোধিনী, এবং ১২৫৮ সালে, বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এবং বিবিধার্থ সংগ্রহ পরে রহস্য সন্দর্ভে পরিণত হয়। তত্ত্ববোধিনীর আবির্ভাব কাল হইতে, বাঙ্গালা গদ্যে রুচি ও নির্ম্মলতা প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করে। তত্ত্ববোধিনীর নিকট কেবল তত্ত্ববিদ্যা নয়, বাঙ্গালা ভাষার লেখক পাঠক, বাঙ্গালী মাত্রেই চির ঋণী। তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আধুনিক সময়ের লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী বিষয়ে অধিক কথা বলা বাহুল্য। তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বেও কিন্তু মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৩৮ সালে নিম্ন লিখিত কয়েক খানি প্রকাশিত হইয়া অতি অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল (১) শাস্ত্র প্রকাশ, (২) বিজ্ঞান সেবধি, (৩) জ্ঞান সিন্ধু-তরঙ্গ (৪) জ্ঞানোদয়, (৫) পশ্বাবলী। ১২২২ সাল হইতে বঙ্গে

সাময়িক পত্র প্রকাশের সূত্র পাত। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কৃত "বাঙ্গালা গেজেট" বাঙ্গালার প্রথম সম্বাদপত্র বলিয়া কথিত হয়। ১২২৪ সাল পাদ্রী মার্সমান্ "সমাচার দর্পণ" প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা গদ্যের অত্যন্ত অপূর্ণ অবস্থায়, আমাদের সাময়িক পত্রিকাদির রচনা পারিপাট্য ও বিষয় বৈচিত্র্য সন্তোষ-কর ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রায় এক শতাব্দী বয়স্ক বাঙ্গালা সাহিত্যের যে মূর্ত্তি আজ আমরা দেখিতেছি, তাহা আমাদের সাময়িক পত্রের প্রথম অবস্থায় ছিল না, থাকা সম্ভবও নহে। এখন যাহা শরীর-বিশিষ্ট, সজীব, তখন তাহা ভ্রূণমাত্র বিদ্যমান ছিল। গুপ্ত কবির, গদ্য রচনাতেও বর্ত্তমান ভাষার ভ্রূণমাত্র আমারা দেখিতে পাই। অক্ষয় কুমার এবং ঈশ্বর চন্দ্রের রচনায়, ভ্রূণের ভিন্ন মূর্ত্তি আমরা দেখিতে আরম্ভ করি। যে উদ্যোগ এবং চেষ্টা ১২৩৭ সাল হইতে ১২৪৯ সাল পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক পত্রের উত্থানে পতনে আয়োজনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যাহা জগদ্বন্ধু পত্রিকার, বেঙ্গল স্পেক্টটরে, "জ্ঞানাঙ্কনে" বিদ্যাদর্শনে, ফুটে ফুটে ফুটিতেছিল না, যাহার স্ফূটন শক্তি স্বভাবের অলক্ষ্য নিয়মে শতবার পরীক্ষিত হইতেছিল, পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা সেই উদ্যোগ ও চেষ্টাতে দৃষ্টি-গোচর ফলোপদায়ক কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল, —"তত্ত্ববোধিনীতে।" সমাজের বিবিধ ব্যভিচারের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী হিন্দুর অদ্বিতীয় 'এক মেব দ্বিতীয়' ধর্ম্ম মস্তকে করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। স্বভাবতই আমাদের ভাল মন্দ সকল কথা জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের জন্যই উঠে; তত্ত্ববোধিনীতে তাহাই হইতে লাগিল। ধর্ম্ম মস্তকে করিয়া তত্ত্ববোধিনী বহুবিষয়ের অবতারণা করিলেন, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" তত্ত্ববোধনীর সহয়ার্থ যোগ দিলেন। উভয়ে মিলিয়া ইউরোপের অনেক তত্ত্ব—সংবাদে অনুবাদে—আমাদের মধ্যে আনিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার জ্ঞান স্পৃহা (অবশ্য আধুনিক মতে) বলবতী করিলেন। বাঙ্গালীর জন্য শিক্ষা সোপান প্রস্তুত করিলেন। সেই সোপান সাহায্যে বাঙ্গালী পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়াছে, প্রাচ্যজ্ঞান অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিতেছে। —তত্ত্ব-বোধিনীর তত্ত্ব-প্রকাশে ভাষার সুগঠন হইতে লাগিল, রচনা এবং বিবেচনা প্রণালী স্ফূরিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও আমাদের মধ্যে প্রকৃত

প্রস্তাবে সমালোচন সাহিত্য পত্রের প্রকাশ হয় নাই। তাহা হইল,—১২৭৯ সালে, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবে। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন মূর্ত্তি। উহা অনুবাদও নহে, সম্বাদও নহে। উহা সমালোচনা; এক কথায় উহা বাঙ্গালার এডিনবরা-রিবিউ। বাঙ্গালার সাহিত্যের সেবক ও ছাত্র মাত্রেরই প্রথম কয়েক বৎসরের বঙ্গদর্শনগুলি, অধ্যয়ন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বঙ্গদর্শনের পিঠে পিঠে আর্য্য দর্শন, বান্ধব, ভারতী প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে সাহিত্য সমালোচনী পত্রিকার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও পুনর্ব্বিকাশের বিচার বিবেচনার সময় এখনও হয় নাই। উপরি উক্ত উচ্চশ্রেণীর পত্র গুলির অনুকরণে অনেক অনুপযুক্ত অনভিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক বঙ্গ বিরঙ্গের পত্র পত্রিকার ভূরি প্রকাশ অদ্যাবধি হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার আনুসঙ্গিক অনিষ্ট ও বিরক্তিকারিতারও অভাব নাই। আমাদের এখনকার সাময়িক পত্র সমূহের অভাবের বিষয় আমরা ইত্যগ্রেই আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের উচ্চঅঙ্গের পত্র কখানিতে, অভাব থাকিলেও সদ্ভাব ও সদ্‌গুণের কথা বিস্তর আছে। সে কথার, সমালোচনা করা, সময়োপযোগী নয়।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বিলাতি সংবাদপত্রের ইতিহাস।

সংবাদপত্র বর্ত্তমান সভ্য সমাজের পাশ্চাত্য সভ্যতার একটী প্রধান উপকরণ। সাহিত্য সমাজনীতি এবং রাজনীতি এই তিনেরই সহিত সংবাদ পত্রের গুরুতর সম্পর্ক। সংবাদপত্র আমাদের দেশের জিনিস নয়, আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে এই সংবাদ পত্রের ব্যবহার শিখিয়াছি, আর সংবাদপত্রের যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে উন্নতি করিতে হয়, তাহা

ইংরাজেরাই ভালরূপ জানেন। প্রায় এক শত বর্ষের কাছা কাছি হইল আমরা ইংরাজদিগের দেখিয়া ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিখিয়া, আপনাদিগের দেশে আপনাদিগের ভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেছি, আমাদিগের দেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যাও বড় কম নহে, কিন্তু হইলে কি হয়, দেশীয় সংবাদপত্রের উন্নতি এত মন্থর গতি, এত মৃদু, যে সহসা সে উন্নতি প্রায়ই লক্ষিত হয় না। কলিকাতার দুই চারি খানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, এবং মফস্বলের এক আধ খানি সংবাদপত্র ব্যতীত আর সকল গুলিরই অবস্থা যে অতীব শোচনীয়, তাহা সেই সকল পত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে সংবাদপত্রের চলন হইলেও কেন যে তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই, তাহার অনেক স্পষ্ট কারণও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বেশ বোধ হয় সংবাদপত্র চালানটা এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে একটা সখের জিনিশের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছে, আর সখের হইলেই সেটা বেগারের হইয়া পড়ে, সুতরাং দেশীয় সংবাদপত্র এ পর্য্যন্ত বেগার বেগারেই চলিয়া আসিতেছে। আবার দেশীয় সংবাদপত্রের এরূপ বেগারের দলে পড়িবারও একটা কারণ আছে। দেশীয় পত্রের সম্পাদকেরা প্রায়ই একটা না একটা কাজে নিযুক্ত; আপনার ষোল আনা সময় টুকু তিনি আপন পত্রিকার জন্য ব্যয় করিতে পারেন না, আর করিবারও বোধ হয় অবকাশ নাই, কারণ তাহা হইলে তাঁহার দিন চলে না,—দেশীয় সংবাদপত্রের আয় অতি সামান্য।

দ্বিতীয়, অধিকাংশ দেশীয় সংবাদপত্রেরই সম্পাদক এবং লেখক প্রায় এক ব্যক্তি; কাজেই লেখার কিছু বৈচিত্র চলে না, কেন না এক জনের কলম হইতেই যে প্রতি সপ্তাহে ভাল লেখা বহির হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প; অথচ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সময়ে কাগজ বাহির করিতে হইবে। এরূপ ব্যবসায়ে, যাহা হউক কতকগুলা পাঠ্য হউক, অপাঠ্য হউক, প্রয়োজনীয় হউক, অপ্রয়োজনীয় হউক বিষয় দিয়া কাজ চালাইতে হয়। সম্পাদক বা লেখক নিজে দেখিবার, শুনিবার, সংগ্রহ করিবার, শিখিবার ও জানিবার অবকাশ না পাইলে,ও প্রতিনিয়ত তাঁহার হস্তে লিখিবার ভার থাকিলে, তিনি

যত বড় লেখকই হউন না কেন, অনর্গল তাঁহার নিকট হইতে ভাল লেখা পাইবার প্রত্যাশা কখন করা যাইতে পারে না।

তৃতীয়, আমাদের দেশীয় সংবাদ পত্র এদিকে যেমন সখের বা বেগারের জিনিস হইয়া আছে, ওদিকে সংবাদ পত্রের জীবনও সেইরূপ গ্রাহক বর্গের অনুগ্রহের উপর বরাবর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় এমন সংবাদ পত্র নাই যাহার ঠিক নিয়মিত সময়ে মূল্য আদায় হয়, আবার অনেক গ্রাহকের নিকট তিন বৎসরেও মূল্য আদায় হয় না। তাহার উপর দেশীয় পত্রের গ্রাহক সংখ্যা অতি সামান্য। বর্ত্তমানে দশ হাজারের অধিক কোন পত্রিকারই কাট্‌তি নাই। আয় না থাকিলে ব্যয় করিবে কোথা হইতে? অর্থব্যয় ও যত্ন পরিশ্রম ব্যতীত কোন জিনিষেরই বা উন্নতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই তিনটি ব্যতীত আর একটি কারণ আছে, আমাদের বিবেচনায় এইটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। দেশীয় সংবাদ পত্রের নিজস্ব—নিজের সামগ্রী—বড় কম। দুই এক খানি ব্যতীত আর সকল কাগজই, হয় ইংরাজীর বাদানুবাদ, নয়, এলো মেলো বাজে কথায় পূর্ণ। এজন্য ইংরাজি দৈনিক পত্র কয়েক খানি পড়িলে, প্রায় আর দেশীয় সংবাদ পত্র পড়িতে ইচ্ছা করে না। আবার মফস্বলের অনেক কাগজ ইংরাজী কাগজের মুখ দেখিতে পায় না, সে সকল কেবল দেশীয় পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইয়া বাহির হয়, এরূপ অবস্থায় কি আর কোন পত্রের উন্নতি হইয়া থাকে? না, এই চর্ব্বিত চর্ব্বণ লইয়া গ্রাহকগণের আর মূল্য দিতে ইচ্ছা করে? এই সঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল, কেহ যেন মনে না করেন, যে ইংরাজী হইতে ভাল প্রবন্ধ বা প্রয়োজনীয় সংবাদাদি গ্রহণের আমরা নিন্দা করিতেছি; এজন্য নিন্দা করিবার কোন কারণ নাই, বিশেষত এরূপ পরস্পর সঙ্কলন ব্যতীত কখন সংবাদ পত্র চলিতে পারে না। আমাদের বলার উদ্দেশ্য যে দেশীয় কোন সংবাদ পত্রেরই এরূপ একটা যত্ন বা উৎসাহ নাই, যাহাতে সেই পত্রের মান সম্ভ্রম ও গৌরব বাড়িতে পারে। ইংরাজের কিন্তু এই চেষ্টাটি বিলক্ষণ আছে, সুতরাং তাহাদের সংবাদ পত্রের দিন দিন আদর ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমত ব্যয় না করিলে কখন আয় হয় না।

ইংরাজ একখানি কাগজ বাহির করিয়াই প্রথমে লেথক ও সংবাদ দাতার এরূপ বন্দোবস্ত করেন, যে তাঁহাকে ভাল লেখা, টাট্‌কা ও সঠিক সংবাদের জন্য পর-মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। সুতরাং গ্রাহকগণের নিকটও মূল্যের জন্য সর্ব্বদা হায় হায় করিতে হয় না, গ্রাহকগণ আপনা আপনিই মূল্য দিয়া সম্পাদককে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমরা আর কিছু না বলিয়া ইংলণ্ডে শত বর্ষের মধ্যে সংবাদ পত্রের কতদূর উন্নতি হইযাছে, তথাকার সংবাদ পত্রের অধিকারীরা নিজ নিজ পত্রিকায় উন্নতির জন্য কত দূর যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কি প্রণালীতে তাঁহারা সংবাদ পত্র চালাইয়া থাকেন, ও এই সকল কারণে তথা-কার সংবাদ পত্রের কিরূপ আদর ও গৌরব, গ্রাহক সংখ্যা কত অধিক ও তাহার মূল্যই বা কিরূপ আদায় হইয়া থাকে, এই সকল বিষযে কিছু বলিব। এই সকল বিষয তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত আমরা ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্র টাইমস ও অপরাপর কয়েক খানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রকে লইয়া ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের ইতিহাসের একবার আলোচনা করিব। ইংলণ্ডের কৌশলে সংবাদপত্রের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানুষের যেরূপ রাজা মানুষ, সেইরূপ সংবাদপত্রের রাজা সংবাদপত্র। ধন, মান, গৌরব, ক্ষমতা ও বলে একমাত্র টাইস পত্র এই সম্মান লাভের অধিকারী। ইউরোপ, আমেরিকায় আর কোন সংবাদপত্রের ভাগ্যে এত সম্মান লাভ হয না; একাধারে আর কোন পত্রিকার এতগুলি গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওযা যায় না। তাহার উপর টাইমস পত্রিকা সংবাদপত্রের আদর্শ স্বরূপ, অথচ প্রতিযোগীতার আকর। ইংলণ্ডে এক্ষণে যে সকল প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র চলিতেছে, সে সকলই টাইমসের পরে প্রচারিত, ইহার দেখাদেখি সে সকল পত্রিকার সৃষ্টি, অথচ টাইমসের সহিত সে সকলের প্রতিনিয়ত টক্করা টক্করি চলিতেছে, সকলেরই ইহাপেক্ষা উন্নতি করিতে, ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা। এজন্য আমরা প্রধানত টাইমসের ইতিহাস ও সেই সঙ্গে অপরাপর পত্রিকার কথা বলিব। পাঠক দেখিবেন সংবাদপত্রের রীতিমত ব্যবসায় করিতে হইলে কি প্রকার উদ্যোগী হইতে ও কতদূর

পরিশ্রম করিতে হয়, এবং করিতে পারিলে তাহাতে কিরূপ লাভবান হওয়া যায়। টাইমস প্রভৃতি বিলাতের সংবাদ পত্রের ইতিহাসে ঐ কথার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি টাইমস পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, বিলাতে, শুধু বিলাতে কেন, ইউরোপে এবং আমেরিকায় একখানি ব্যতীত এতাদৃশ প্রাচীন পত্রিকা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মর্ণিংপোষ্ট টাইমস্ অপেক্ষা বয়সে প্রাচীন, ১৭৭২ সালের এই পত্রিকা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু টাইমস পত্রিকা জন্মাবধি যেরূপ সতেজ ভাবে চলিযা আসিতেছে, মর্ণিং-পোষ্টের ভাগ্যে ইহা ঘটে নাই, ইহার পূর্ব্বের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

মর্ণিংপোষ্ট এবং টাইমস ব্যতীত বিলাতের প্রথম শ্রেণীর সংবাদ পত্রের মধ্যে মর্ণিং আড্‌বর্টাইজারের বয়স চুবানব্বই, ডেলিনিউ তেতাল্লিশ, ডেলি টেলিগ্রাফ এবং ডেলি ক্রনিকল চৌত্রিশ, ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকা বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ, বত্রিশের অধিক নয়। এই খানে বলিয়া রাখা উচিত আমরা কেবল দৈনিক পত্রের বিষয় বলিতেছি।

টাইমসের নাম পরিবর্ত্তন।

জন্মকালে জন্মদাতা কর্ত্তৃক ডেলি ইউনিবারশাল রেজিষ্টার নাম রাখা হয়. সমস্ত বাল্য কাল (ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) ইহার এই নামে কাটিয়া যায়। পরে ১৭৮৮ সালে ইহার জন্মদাতা জন ওয়ালটর সাহেব ডেলি ইউনিবরসাল রেজিষ্টার নামের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সর্ব্বজন পরিচিত টাইমস নাম প্রদান করেন। এই সঙ্গে ইহার আকার এবং মুদ্রণ প্রণালীরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়।

পূর্ব্বে সংবাদ পত্র কিরূপ ধরণে প্রকাশিত হইত।

আমাদের বাঙ্গালা সংবাদ পত্র যেমন পূর্ব্বে কেবল পদ্য, বাজেকথা ও দুই একটা অযোগ্য গোছের সংবাদ দিয়া বাহির করা হইত, বিলাতেও পূর্ব্বে ঠিক এইরূপ ধরণে সংবাদ পত্র সকল বাহির হইত। তখনকার পত্রিকায় দুই চারিটা সত্য মিথ্যা মিশ্রিত সংবাদ, কতক গল্প, কতক বাজে ও অশ্লীল পদ্য, এবং গোটা কতক বিজ্ঞাপন বাহির হইত। এখনকার সম্পাদ-

কীয় স্তম্ভ—আর্টিকেল, লিডার, প্যারা প্রভৃতির—সহিত তখন কার পত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। টাইমস হইতে বিলাতের পত্রিকার লিখন প্রণালী, স্তম্ভ প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তবে এই সকলের পরিবর্ত্তে প্রেরিত পত্র তখন সম্পাদকীয়ের স্থানে বসিত। কিন্তু এই সকল প্রেরিত পত্রের লেখাও যে উচ্চদরের হইত, তাহা বলা যায় না। জুনিয়স্ প্রভৃতি দুই চারি জনের ব্যতীত আর সকল প্রেরিতই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল। ইউনিবর্শাল্ রেজিষ্টারে (টাইমসে) যে সকল প্রেরিত বাহির হইত. তাহারও এই দশা ছিল।

টাইমসের জন্মদাতা।

জন ওয়াল্টর এই পত্রিকা বাহির করেন। ইহাঁর পিতা কয়লার ব্যবসা করিতেন। ওয়াল্টর সতের বৎসরে পিতৃহীন হইয়া এই ব্যবসা চালাইয়া পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে প্রচুর ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। ১৭৭৬ সালে লইডের মেম্বর হইয়া পার্লিমেণ্টে প্রবেশ করেন। এই সময় ইনসিয়োরের (insure) ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হইয়া উঠেন কিন্তু এই সময় ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক কয়েক খানি জাহাজ নষ্ট হওয়ায়, ইঁহাকে আট কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই সকল জাহাজ ইহাঁর নিকট ইনসিয়োর করা ছিল। ওয়াল্টর এই ক্ষতি গবর্ণমেণ্ট হইতে পূরণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

১৭৮৪ সালে, ওয়াল্টর, প্রিণ্টিং হাউস স্কোয়ারে ডেলি ইউনিবরসাল রেজিষ্টার বাহির করিবার বন্দোবস্ত করেন। যে বাটিতে এই পত্রিকার প্রচারারম্ভ হয়, ইহার এক শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তথা হইতে জন বিল কর্ত্তৃক লণ্ডন গেজেট বাহির হইত। এক্ষণে যে স্থানে টাইমস অফিস রহিয়াছে, পূর্ব্বে তথায় রোমান কাথলিকদিগের এক মঠ ছিল।

ওয়াল্টার এই পত্রিকা বাহির করিয়া ইহার উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি কার্য্যে নূতন ব্রতী হওয়ায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহাকে প্রথম প্রথম অনেক ঠকিতে ও সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। ওয়াল্টর অধ্যবসায় এবং যত্ন সহকারে ক্রমে সকল বাধা বিপত্তি কাটাইয়া ধীরে ধীরে নিজ পত্রিকার উন্নতি করিতে লাগিলেন। এই সময় একজন

যুক্ত অক্ষরে (logotype) পত্রিকা ছাপা হইত; ওয়াল্টর হেনরী জনসন নামক একজন মুদ্রাকরের সহিত মিলিত হইয়া এই প্রকার সংযুক্ত অক্ষরের সৃষ্টি করেন। ১৭৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি এই প্রকার সংযুক্ত অক্ষরে ছাপা হইয়া চারি পৃষ্ঠা পরিমিত একখণ্ড কাগজে ডেলি ইউনিভার্সাল রেজিষ্টার প্রথম বাহির হয়। তৎকালে ইহার মূল্য আড়াই পেনি—অপর দৈনিক পত্রিকা হইতে আধ পেনি কম—করা হইয়াছিল। কয় বৎসর গেল এই নামে, তাহার পর ১৭৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহা বর্ত্তমান নামে চলিতে আরম্ভ হয়। সে সময় রেজিষ্টার নামে বিলাতে আরো কয়েক খানি (Annual Register, Court and City Register) পত্রিকা বাহির হইত, নামের ঐক্য থাকায় অনেক সময় লোককে ভ্রমে পড়িতে হইত বলিয়া ওয়াল্টর সাহেব ১৭৯৮ সালে ইউনিবরশাল রেজিষ্টার নামের পরিবর্ত্তে টাইমস্ নাম প্রদান করেন। নাম পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার অপর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, আড়াই পেনি মূল্যের স্থলে তিন পেনি মূল্য করা হয় মাত্র। কিন্তু এই কয় বৎসরে পত্রিকার বিশেষ কিছু উন্নতি লক্ষিত হয় নাই, অধিক কি অনেকের নিকট ইহার নামও অশ্রুত ছিল, পরবর্ত্তী আরও কয়েক বৎসর এই ভাবে কাটিয়া যায়। কিন্তু পত্রিকার অবস্থা এই প্রকার হইলেও সম্পাদক ও প্রকাশক ওয়াল্টর সাহেবকে প্রায়ই ইহাকে লইয়া বিপদে জড়াইয়া পড়িতে হইত। আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। ১৭৮৬ সালে লর্ডলোবোরো, তাঁহার নামে গ্লানি প্রচারার্থ, ওয়াল্টরের নামে মান হানির এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহাতে দেড়শত পাউণ্ড অর্থ দণ্ড হয়। ১৭৮৯ সালে ইয়র্ক, গ্লষ্টার, কমবারল্যাণ্ড এই তিন স্থানের তিন জন ডিউক ইহাঁর নামে আর এক মান হানির নালিস উপস্থিত করেন। ইহাতেও ওয়াল্টরকে পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থ দণ্ড, একবৎসর কারাবাস ও চেয়ারিং ক্রস্ নামক প্রকাশ্য স্থানে এক ঘণ্টা কাল পিলুড়িতে থাকিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কারা মুক্তির পর সাত বৎসর কাল যাহাতে এরূপ কোন কাজ না করেন, তজ্জন্য প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করিতে হয়। এই কারাদণ্ডের মধ্যেই ইহাঁর বিরুদ্ধ আরো দুইটি গুরুতর মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, ও তজ্জন্য ১৭৯০ সালের ৩রা জানুয়ারি পুনরায় এক বৎসর কারাবাস এবং দুইশত পাউণ্ড

অর্থ দণ্ডের আদেশ হয়। যাহা হউক দ্বিতীয় বার কারা দণ্ডের ছয় মাস কাল অবশিষ্ট থাকিতে, যুবরাজ প্রিন্স অবওয়েলসের অনুগ্রহে ওয়াণ্টরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ কাগজ বাহির করিয়া ছয় বৎসরের মধ্যে দুইবার দুই বৎসর কারা দণ্ড এবং চারিশত পাউণ্ড অর্থদণ্ড হওয়ায় ওয়াণ্টর হতাশ হইয়া পড়িলেন, এদিকে কাগজে ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিতে হইতেছিল। এই সকল কারণে তিনি টাইমসের প্রচার বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু একবারে তাহা না করিয়া নিজে সম্পাদকীয় ভার লইয়া নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কার্য্যাধ্যক্ষের ভার প্রদান করিলেন। ইহাতে পত্রিকার কিঞ্চিৎ উন্নতি হওয়ায় ১৮০৩ সালে পুত্রের হস্তে সম্পাদকীয় ভারও প্রদান করিলেন। এইরূপ পিতা পুত্র উভয়ের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে ক্রমাগত কয়েক বৎসর ক্ষতির পর টাইমসের উন্নতি আরম্ভ হইল। টাইমসের নাম ক্রমে বিলাতের জন সমাজে প্রচার হইতে আরম্ভ হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বিলাতে সংবাদ পত্রের অবস্থা।

এই সময় বিলাতের সকল সংবাদ পত্রেরই অবস্থা প্রায় একরূপ। লেখার তুলনায় পত্রিকা গুলির অল্পই ইতর বিশেষ বুঝা যাইত। ক্ষমতা এবং গ্রাহক সংখ্যাও কোন পত্রিকারই সন্তোষ জনক ছিল না। চারি সহস্রের অধিক কোন পত্রিকারই কাট্‌তি ছিল না, কেবল কোল্‌রিজ যে সময় মর্ণিংপোষ্টে লিখিতে আরম্ভ করেন সেই সময় কিছুদিন তাঁহার লেখার গুণে মর্ণিংপোষ্টের সাত হাজার করিয়া কাট্‌তি হইতে আরম্ভ ছিল। নতুবা মর্ণিংপোষ্টের সাড়ে তিন শতের অধিক গ্রাহক ছিল না। এই আশাতিরিক্ত প্রচার দেখিয়া সে সময় মর্ণিংপোষ্টের অধ্যক্ষদিগের এবং সাধারণের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা ছিল না। মর্ণিং ক্রনিকল্, মর্ণিংপোষ্ট, মর্ণিং হেরল্ড এবং মর্ণিং আডবর টাজাইর এই চারি খানি মাত্র তখন একটু ভাল কাগজ ছিল।

এক্ষণে যেরূপ পত্রিকাতে সকল প্রকারেরই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তখন এই বিজ্ঞাপন প্রকাশেরও একটু বৈচিত্র ছিল। তখন বিলাতের বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞাপন বাহির হইত। মর্ণিংপোষ্টে কেবল গাড়ি ঘোড়ার, পবলিক লেজারে জাহাজ সম্পর্কীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের, মর্ণিংহেরাল্ডে এবং টাইমসে নিলাম সম্বন্ধীয় এবং মর্ণিং ক্রণিকলে

পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন বাহির হইত। এই প্রকার বিজ্ঞাপনের জন্যও তখনকার পত্রিকার কাট্‌তি অনেক কম ছিল, কারণ যাহারা বিজ্ঞাপন দেখিবার জন্য কাগজ কিনিত, তাহারা যে কাগজে যে প্রকারের বিজ্ঞাপন বাহির হইত, কেবল মাত্র সেই একখানি কাগজ গ্রহণ করিত। দ্বিতীয় জন ওয়াল্টর (প্রথম জন ওয়াল্টরের পুত্র) এই জন্য যাহাতে তাঁহার কাগজে সকল শ্রেণীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়া গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় বাহির করিলেন।

সংবাদদাতার সৃষ্টি।

পূর্ব্বে সংবাদ দাতার চলন ছিল না, কোন পত্রিকারই এখনকার ন্যায় তখন সংবাদদাতা ছিল না, টাইমসের অধ্যক্ষ প্রথমে এই পদের সৃষ্টি করেন। বিদেশের সংবাদ লাভের নিমিত্ত দ্বিতীয় জন ওয়াল্টর হেনরী ক্রাস্‌ ররিনসন নামক একজন বিলাতের বিখ্যাত সুচতুর বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী লোককে প্রথমে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করেন। ইঁহার সহিত ফ্রান্স জর্ম্মনি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অনেক বড় বড় লোকের আলাপ পরিচয় থাকায় তিনি এই কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত চালাইতে লাগিলেন।

১৮১২ সালের ১৬ই নবেম্বর টাইমসের জন্মদাতা ওয়াল্টরের মৃত্যু হয়, তিনি নিজ পত্রিকার সামান্য উন্নতি দেখিয়া পরলোক গমন করেন। এখন হইতে দ্বিতীয় ওয়াল্টরের উপর ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার পড়িল।

প্রতিযোগিতায় অপরাপর পত্রিকার অবনতি।

যে সময় টাইমস প্রথম জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় বিলাতে মর্ণিংহেরাল্ড, মর্ণিংক্রণিকল্‌, মর্ণিংষ্টার, রেপ্রিজেণ্টেটিব, মিরর, কনষ্টিটিউসনাল, ডে অ্যাণ্ড আওয়ার এবং মর্ণিং আডবরটাইজার প্রভৃতি অনেকগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা বাহির হইত। টাইমস সে সময় এবং তাহার অনেক পরেও ইহাদিগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে পঞ্চদশ বৎসর বয়ক্রমে উপনীত হইয়াও ইহার গ্রাহক সংখ্যা সহস্রের অধিক হয় নাই, অপরাপর সকল পত্রিকারই সে সময় ইহা অপেক্ষা অধিক কাট্‌তি ছিল। দ্বিতীয় জন ওয়াল্টর কেবল যে এই কাট্‌তি সংখ্যার বৃদ্ধি করেন, তাহা নহে, ইহাঁর যত্ন ও চেষ্টায় ক্রমে টাইমসের এত দূর উন্নতি হইতে লাগিল যে অপরাপর কাগজের গ্রাহকেরা সেই সকল পত্রিকা পরিত্যাগ করিয়া ইহা

গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া ক্রমে মর্ণিংক্রনিকল্, মর্ণিংহেরাল্ড, মর্ণিংষ্টার, মিরর, কনষ্টিটিউসনাল, ডে আণ্ড আওয়ার পত্রিকাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হাতে ছাপিয়া গ্রাহকদিগকে কাগজ বিতরণ করা অসম্ভব হওয়ায়, কলে ছাপিবার জন্য দ্বিতীয় ওয়াল্টর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ছাপাখানায় কিরূপে প্রথমে বাষ্পীয় যন্ত্র প্রচলন হইল সে সকল কথা বলিতে গেলে অকারণ প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এজন্য আমরা আর তাহা বলিব না। ১৮১৪ সালের ২৯ নবেম্বর টাইমস পত্রিকা প্রথম ষ্টীমপ্রেসে (কলে) ছাপা হইয়া বাহির হয়।

টাইমসের যশোবিস্তার।

১৮৪০ সাল টাইমসের ইতিহাসের একটি উল্লেখ যোগ্য বৎসর। ঐ বৎসর মে মাসে ইহার পারিসের সংবাদদাতা ওবিলী কতকগুলি প্রতারক কর্ত্তৃক বিদেশী ব্যাঙ্কওয়ালাদিগকে প্রায় এক কোটি টাকা ঠকাইবার এক ষড়যন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সম্পাদককে লিখিয়া পাঠান। পত্র প্রেরক এই বিবরণ সাধারণকে জ্ঞাত করিয়া সতর্ক করিবার জন্য সম্পাদককে লিখিয়া পাঠান। সম্পাদক তাহা প্রচার করিয়া ব্যাঙ্কওয়ালাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। ইহার জন্য ষড়যন্ত্রকারী প্রতারকদিগের মধ্যে এলেন জর্জ্জ ব্যুগল্ নামক একজন টাইমসের নামে মানহানির এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বিস্তর অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়া টাইমসের পক্ষীয় উকীল সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ করেন ও টাইমসের জয়লাভ হয়। এই উপলক্ষে বিলাতের ব্যবসাদার ও অপরাপর সকল শ্রেণীর লোক মিলিয়া টাইমসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ লর্ডমেয়রকে সভাপতি করিয়া ম্যানসন্ হাউশে এক সভা আহ্বান করেন। বিলাতের লোকেরা সকল কাজেই হাতে কলমে, আমাদের দেশের মত কেবল ফাকা কথায় গলাবাজি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। টাইমসের প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কথিত মোকদ্দমার খরচা তুলিয়া দিবার নিমিত্ত সকলে দশ গিনি করিয়া, সাতাশ হাজার টাকা তুলিয়া ইহার সম্পাদককে প্রদান করা হয়; কিন্তু সম্পাদক এই টাকা গ্রহণে অস্বীকার করিলে, ইহা হইতে টাইমসের নামে দুইটি ছাত্র বৃত্তি এবং রয়াল এক্সচেঞ্জহলে এবং টাইমস্ আফিসে দুই খানি ট্যাবলেটে এই ঘটনা মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

১৮৪৭সালে দ্বিতীয় জন ওয়াল্টবের মৃত্যু হয়। ইহাঁব যত্নে টাইমসেব নাম, গৌবব ও আয় বৃদ্ধি হয়। ইনি নিজে বর্কশায়ব এবং নটিংহাম হইতে পার্লিমেণ্টেব সভ্য নিযুক্ত হন। বর্ক এবং উইল্টসায়বে জমিদাবী, প্রিণ্টিং হাউস স্কোয়াবে টাইমস্ আফিসেব নিজব বাটি, টাইমসেব প্রচুব ষ্টক্ এবং নয় লক্ষ টাকাব স্বকৃত সম্পত্তি সঞ্চয় কবিয়া যান।

দ্বিতীয ওয়াল্টবের পুত্র তৃতীয় ওয়াল্টব এক্ষণে টাইমসেব স্বত্বাধিকাবী। ইহাঁর আমলে টাইমসেব ও টাইমসেব প্রতিযোগিতায ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় সংবাদপত্রেব যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দ্বিতীয় ওয়াল্টব যে ষ্টীম প্রেসে টাইমস ছাপিবাব বন্দোবস্ত কবিয়া যান। তাহাতে ঘণ্টায হাজাব হইতে এগার শতেব অধিক কাগজ ছাপিতে পাবা যাইত না। ১৮৫১ সালেব বিলাতেব প্রদর্শনীতে এই প্রেসেব যথেষ্ট সুখ্যাতি ও ইহাব আবিষ্কাবকেব বুদ্ধি শক্তিব ভূয়সী প্রশংসা কবা হয়। কিন্তু তৃতীয় ওয়াল্টব ইহাপেক্ষা সুচাক রূপে ও দ্রুতগতিতে ছাপিবাব জন্য ইহাপেক্ষা উন্নত প্রণালীব মুদ্রা যন্ত্রের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দেখিবাব কাবণও ছিল। এই সময় টাইমসেব গ্রাহক সংখ্যা এক অধিক বৃদ্ধি হয়, যে আব ঘণ্টায় এগাব শত করিয়া ছাপিয়া নিয়মিত সময়ে গ্রাহকদিগকে পত্রিকা যোগান দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। এই সমন ইয়র্কে হো নামক একজন ইঞ্জিনীয়ব এক প্রকাব নূতন ধবণেব ষ্টীম প্রেস আবিষ্কাব কবেন; তৃতীয় ওয়াল্টব এই নূতন ধবণেব দুইটি প্রেস নিউ-ইয়র্ক হইতে আনাইয়া দেলাগানা নামক একজন ইটালিয়ন শিল্পী দ্বাবা ষ্টিবিওটাইপ প্লেটে ছাপিবার নূতন বন্দোবস্ত কবিলেন। ইহাতে ঘণ্টায় এগার শতের স্থানে বাব হাজাব কবিয়া কাগজ ছাপা হইতে লাগিল এবং ইহাব দ্বাবা একদিকে যেরূপ দ্রুতগতিতে অল্প সময় মধ্যে ছাপিবাব সুযোগ হইল, ষ্টিরিও কবায় সেই রূপ ব্যয়েবও বিস্তব লাঘব হইল।

কিন্তু এক্ষণে টাইমস ইহাপেক্ষাও উন্নত প্রণালীব প্রেসে ছাপা হইতেছে। টাইমসের অধিকারী তৃতীয় ওযাল্টবের যত্নে ও সাহায্যে জন কেমিয়ন ম্যাকডোনাল্ড ইহাব সৃষ্টি কবেন, ওয়াল্টবেব যত্নে এবং অর্থে ইহাব আবিষ্কাব হয় বলিয়া, ইহাকে ওয়াল্টর প্রেস বলা হইয়া থাকে। এই প্রেসে প্রতি ঘণ্টায পনব হাজাব কবিয়া কাগজ ছাপা হয়। এক্ষণে প্রতিরাত্রে টাইমস

আফিসে দশ টন করিয়া কাগজ ছাপা হয়। এই সমস্ত কাগজ যদি লম্বা করিয়া রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে একশত ষাট মাইল পথ ইহার দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়।

টাইমসের এই ওয়াল্টর প্রেস আজ কাল ইউরোপ এবং আমেরিকার সকল বড় বড় সংবাদপত্রের আফিসে চলন হইয়াছে, এই প্রেস বিক্রয় দ্বারাও অনেক লাভ হয়। নিজ টাইমস আফিসে এই প্রেস দশটি আছে, প্রতি রাত্রি ইহার আটটিতে একলক্ষ বিশ হাজার টাইমস পত্রিকা এক ঘণ্টার মধ্যে ছাপা হইয়া বাহির হয়। এই প্রেসের বিশেষ গুণ এই যে,ইহাতে পত্রিকা ছাপা হইয়া একবারে ভাঁজিয়া বাহির হয়, নতুবা এই লক্ষাধিক কাগজ এত অল্প সময় মধ্যে ভাঁজিতে বোধ হয় পাঁচ হাজার লোকের প্রয়োজন হইত। টাইমস ব্যতীত ডেলিনিউস আটটি, নিউইয়র্ক টাইমস চারিটি, স্কট্‌ম্যান তিনটি, গ্লাসগো নিউস দুইটি, বিয়েনার Neve freie presse দুইটি, Missouri Republican একটি এবং Magdeburge Zeitung একটি—এই প্রেস রাখিয়া ছাপার কার্য্য চালাইয়া থাকে। এই প্রেসের একদিকে যেরূপ ছাপিবার অনেক সুবিধা, সেইরূপ অপর দিকে ইহার মূল্যও বড় অধিক নয়। ইহার এক একটি ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে টাইমস আফিস হইতে পাওয়া যায়।

টাইমসের আর এক সুবিধা এই যে ইহা যেরূপ কলে ছাপা, কলে ভাঁজা হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহার কম্পোজ এবং ডিষ্ট্রিবিউটও কলে হইয়া থাকে। টাইমস ব্যতীত পৃথিবী মধ্যে আর কোন কাগজের এ সুবিধা টুকু নাই। এই সুবিধা থাকায় ইহার যেরূপ ব্যয়ের সাশ্রয় হইয়া থাকে, সেই রূপ কার্য্যও দ্রুত ও সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল কারণে ইহার ব্যয় ত কিছু লাঘব হইলেও লেখকদিগের পারিশ্রমিক,সংবাদ দাতার বেতন ও টেলিগ্রাফাদিতে বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে। পারিস এবং বিয়েনায় টাইমসের নিজের টেলিগ্রাফের তার আছে; এই টেলিগ্রাফ বসাইতে ইহার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। যদি ছাপার কার্য্যে ব্যয় কম না হইত, তাহা হইলে ইহার এই সকল ব্যয় ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইত, ও তাহা হইলে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের এতদূর উন্নতিও হইত না।

এবং লোকেও এক পেনি দুই পেনি মূল্যে উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্র পাঠে জগতের বিভিন্ন স্থানের সংবাদাদি অবগত হইবার সুবিধা পাইত না।

টাইমস পত্রিকা এক মাত্র যত্নে ও অধ্যবসায়ে গুণে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় ষ্টাণ্ডার্ড, ডেলি টেলিগ্রাফ, ডেলিনিউস, মর্ণিং পোষ্ট এবং আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরাল্ড প্রভৃতি কতিপয় পত্রিকা ইহার তুল্য এবং কেহ কেহ ইহাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাই বলি রীতিমত সংবাদপত্রের ব্যব-সায় চালাইতে হইলে আমাদিগকে বিলাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

বিলাতী সংবাদ পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিতে গেলে এখনও অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় আমরা আর দুই একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আর টাইমস বিলাতের যেরূপ প্রাচীন মুখপত্র সংবাদ পত্র, তাহাতে একা ইহার ইতিহাসেই পাঠকগণ সমস্ত সংবাদ পত্রের অবস্থা ও বিষয় এক প্রকার জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

আমাদের দেশের এবং বিলাতের সংবাদ পত্রে সকল বিষয়েই আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের দেশের সকল পত্রই মোটা মুটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় লইয়া নাড়ানাড়ি করিয়া থাকে। বিশেষ দলাদলি ভাব কোন পত্রে দেখা যায় না। বিলাত বড় বড় রাজনৈতিকের দেশ, তথায় একটা দলের আশ্রয় না হইলে কাগজের বিশেষ উন্নতি হয় না, এই জন্য তথাকার সকল পত্রিকাই একটা না একটা দলে মিশিয়া থাকে। এই জন্য এখনকার প্রধান প্রধান সকল পত্র এক একটা দল ভুক্ত হইয়াছে। এই হিসাবে মর্ণিং-পোষ্ট—খাটি কনসরবেটিবদিগের,—ষ্টাণ্ডার্ড, মৃদু কনসরবেটিবদিগের, ডেলি নিউস এবং ডেলিক্রনিকল লিবারেল দিগের দলস্থ হইয়া ও পক্ষসমর্থন করিয়া বাহির হইয়া থাকে। ডেলিটেলিগ্রাফ—রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক বিষয় লইয়া যাঁহারা ব্যাপৃত তাঁহাদের উপযোগী হইয়া বাহির হয়। টাইমস অপেক্ষা ডেলিটেলিগ্রাফের বিলাতে আজকাল অধিক কাটতি হইয়া থাকে।

রাজনৈতিক পত্রিকা মধ্যে টাইমস্ সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, ইহাতে সঠিক সংবাদ বাহির হওয়ায় ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য কম (এক পেনি)

হওয়ায়, টাইমসের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহার উপর আবার ইহার গ্রাহক সংখ্যা লণ্ডন ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বড় অধিক; ইহার প্রত্যেক খান প্রায় কুড়ি জন লোক পাঠ করিয়া থাকে। বিলাতে সংবাদপত্র পাঠ করাইবার জন্য এক প্রকার এজেণ্ট আছে; ইহারা প্রতি সপ্তাহে অতি সামান্য মূল্য লইয়া একঘণ্টা, দুই ঘণ্টা বা ততোধিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সংবাদপত্র লোককে পড়িতে দিয়া থাকে, এক জনের পড়া হইলে তাহার নিকট হইতে আর এক-জনকে প্রদান করে। এই রূপ লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে থাকে, ও এই-রূপে ইহারা এক এক খানি কাগজ পাঁচ দশ জন লোককে পড়াইয়া আবার তাহা ডাক যোগে মফস্বলের গ্রাহকের নিকট পাঠাইয়া দেয়; মফস্বলের গ্রাহকেরাও তাহা পাঠ করিয়া এজেণ্টকে নিয়মিত সময়ে ফিরাইয়া দেয়, তখন সেই পত্রিকা বিদেশের গ্রাহকদের নিকটে পাঠান হয়। বিলাতে এই রূপে অল্পব্যয়ে সংবাদপত্র পড়িবার বিশেষ সুবিধা আছে, তথাকার ভাল ভাল সকল পত্রিকারই এইরূপ এজেণ্ট নিযুক্ত আছে।

আইবি লতা।

আইবি লতা!

কত স্নেহ মমতায়, হৃদয় ছাইয়া যায়

রাখে না একটু ফাক——একটু ব্যথা!

মনে করে দেয় তার স্নেহ মমতা!

আইবি লতা!

স্বর্গীয় সরল প্রাণে, শুধু ভালবাসা জানে

ফুল ফুটে হাসি নাই, দেমাকে কথা!

মনে করে দেয় তার স্নেহ মমতা!

আইবি লতা!

পোড়া মাটী নাহি বাছে, বেয়ে উঠে মরা গাছে,

এমন উদার প্রাণ দেখেছ কোথা?

শ্যামরূপে মাখা যেন কত মমতা।

আইবি লতা!

অলি না ছুলিয়া যায়, ফুলে মধু নাই খায়,
পবিত্র সরল শুদ্ধ দেবতা যথা!
মনে করে দেয় তার স্নেহ মমতা!

আইবি লতা।

নাহি জানে অভিমান, সতত প্রসন্ন প্রাণ,
না আছে বিষন্ন ভাব, নাহি ছলতা!
ভুলিতে পারি না সেই পুরাণো কথা।

আইবি লতা।

সাদা সিদে সোজা সাজ, সাদা সিদে বোঝা কায,
বসন্তে বিলাস নাই, শীতে জড়তা।
মনে পড়ে কবে তারে দেখেছি কোথা!

আইবি লতা!

যখনি দেখিতে পাই, ভাবে ভোর সর্ব্বদাই
বয়ান ভুলিয়া গেছে বলিতে কথা,
নয়ানে গলিয়া পড়ে স্নেহ মমতা!

আইবি লতা।

বুকে ঢেকে বুকে থেকে, চমকে, স্বপন দেখে,
তরাসে শিহরে উঠে—হরিণী যথা!
কোথা সেই দেব পুর, কোথা দেবতা!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

পিরীতি প্রসাদ।

বনান্তরালে, পরণ কুটীরে,
নিরজন নিভৃত নিবাস.;
সায়াহ্নকালে— সুজন সুধীর
পিরীতি প্রফুল্ল হরিদাস।

আকুল অলিকুল, কোকিল কুহুরত
সরস বসন্ত সমাগম ;
সুরসিক নাগর, শিঙ্গার শোভিত,
পরকাশত রূপ-বিক্রম।
নাচত রঙ্গে, যমুনা তরঙ্গে
তপনক কনয়া কিরণ ;
রূপ-বিমোহিত, নিরখত ভকত
প্রেম সে চন্দ্রবদন।
মঞ্জুল কুঞ্জে, বিহঙ্গ গায়ত
নাচত ময়ূর ময়ূরী ;
বাজত রুনু ঝুনু ধীর সমীরে
ঝুরত প্রেম মাধুরী !
ফুটন্ত পদ্মে মধুপ মাতোয়ারা
চন্দ্রমা বাথে অমৃত ;
প্রেম পয়োধি পরে সন্তরে বৈষ্ণব
গোপী সে গাওল গীত।
বাহত প্রেমতরী সো শ্যামসুন্দর,
গোপিনী করু হরি পার ;
কহত ব্রজবধূ "ব্রজেন্দ্র নন্দন !
"কোন পারাবার এ তুঁহার ?
"প্রেম পরিশ্রমে, উপজল সাগর,
"সব রাধারাণী নীরধার !
"রয়ত রয়ত তুয়ালাগি মাধব !
"প্যারী সে বনি পারাবার।
এক বিন্দু তাহে নাহি দিলে আপনে
কৈছনে ভেস তুঁহার ;
কৌতুকে কহে হরি "যৌতুক দিলা সখি
পিরীতি প্রসাদে নীরধার। শ্রীকানাইলাল মিত্র।

পাঠ্য-বিভ্রাট।

বিলাতে ফর্টনাইটলী রিবিউ নামে এক খানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র আছে। সম্প্রতি ঐ পত্রে গ্রন্থকারদিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে গ্রন্থকারেরা যেরূপ পরিশ্রম করেন, সেরূপ ফল প্রাপ্ত হন না। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর তুলনায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহারা দিবারাত্রি গভীর চিন্তা ও অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া জগতের সম্মুখে যে মহামূল্য রত্ন স্থাপিত করেন, আত্মম্ভরি জগৎ সে রত্নের যথোচিত সমাদর করিতে অগ্রসর হয় না। তাঁহাদের গভীর নিশীথ চিন্তার কোন রূপ মূল্য নাই, গভীর গবেষণার কোন রূপ পারিতোষিক নাই এবং গভীর পরিশ্রমেরও কোনরূপ প্রতিদান নাই। তাঁহারা দরিদ্র ভাবে পরিশ্রম করিতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং দরিদ্র ভাবে পরিশ্রম করিয়াই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন। জগৎ তাঁহাদের পরিশ্রমের গুণে জ্ঞানপূর্ণ হইলেও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যত্নপর হয় না। সংসারে গ্রন্থকারদিগের অবস্থা এই রূপে শোচনীয় হয়। গ্রন্থকারগণ সংসারের অকৃতজ্ঞ লোকের নিকট এই রূপে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হন।

আমরা ফর্টনাইটলী রিবিউর প্রবন্ধ লেখকের কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। যাঁহারা সাহিত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আমাদের দেশে তাঁহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্ব লোক পূজিত কবি এক সময়ে কাতর ভাবে বলিয়া ছিলেন, "তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে।" বৎসরের পর বৎসরের পরিবর্ত্তনে গ্রন্থকারগণের ঐ রূপ নিদারুণ দুঃখ, ঐ রূপ দারুণ মর্ম্ম বেদনার অবসান হয় নাই। বাঙ্গলা আজ কাল সভ্য ও জ্ঞানাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হয় নাই। বাঙ্গালীর জ্ঞান কেবল আত্মোদর পোষণে ও আত্ম সমৃদ্ধির পরিবর্দ্ধনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, আমরা সাহিত্যমাত্র-জীবী উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থকারদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল কথা বলিতেছি। যাঁহারা নিরক্ষর হইয়াও মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে আপনাদিগকে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহেন।

আমাদের দেশে সাহিত্য-জীবীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প, যে এক আধ জন আছেন, তাঁহাদেরও সমুচিত সমাদর দেখা যায় না। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাঠক নাই, অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের নিকট কেবল বাজে নাটক ও নবেলেরই আদর। এই সকল কারণে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সৃষ্টি হইতেছে না। এখন স্কুলপাঠ্য পুস্তকেই কিছু অর্থাগম হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বিচার কৌশলে, অথবা চক্রান্তে, এপথও উচ্চশ্রেণীর লেখক দিগের পক্ষে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসরই পাঠ্য পুস্তক লইয়া আন্দোলন হইয়া থাকে। কিন্তু এপর্য্যন্ত আন্দোলনের কোন সুফল দেখা গেল না। জলৌকা আশানুরূপ রক্তশোষণ করিয়াই গাত্র চ্যুত হয়, কিন্তু শিক্ষা বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তাদিগের গ্রন্থ সকল এপর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের তালিকা হইতে স্খলিত হইল না। অপরের গ্রন্থ সকল তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের নিকট ঐসকলের আদর দেখা যায় না ইহার উপর উপরোধ অনুরোধ ও তোষামোদের প্রাধান্য আছে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থকারদিগেরই জয় হইয়া থাকে। এখন সীতার বনবাসের আদর নাই, উহার স্থলে রামচরিত, রামবনবাস ও রামের জন্মাভিষেকেরই জয় ঘোষণা হইতেছে। মৌলিক গ্রন্থের স্থলে সংগ্রহের সমাদর দেখা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক গ্রন্থকার বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য নাই, লিপি-ক্ষমতা নাই, ইঁহারা অপরের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইয়া আপনাদের নামে প্রচারিত করিতেছেন, এবং উপরোধ তোষামোদ এবং আত্মীয়তার বলে সেই গ্রন্থ চালাইয়া উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থকারদিগকে আপনাদের অপূর্ব্ব রঙ্গাভিনয়ে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছেন। পশ্চিম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ ও পূর্ব্ব-এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর গ্রন্থের আদর দেখা যায়। কিন্তু কেবল ইহাই সাহিত্য ক্ষেত্রের শোচনীয় সর্ব্বনাশ নহে। স্কুলের সব ইন্স-

পেক্টর, ইন্সপেক্টর, কেরাণী প্রভৃতিও সামান্য সামান্য স্কুল বহি প্রচার করিয়া আপনাদের কৌশলে ও তোষামোদের বলে বিলক্ষণ পসার বৃদ্ধি করিতেছেন। কোন এক বিভাগের ইন্সপেক্টরের হেড কেরাণী গ্রন্থকার হইয়া যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু অথবা কালীপ্রসন্ন ঘোষের সে পরিমিত সৌভাগ্য সম্পত্তি লাভ হয় নাই।

সৈয়দ ভ্রাতৃ দ্বয় সম্রাট ফেরোকসেরর, রতনচাঁদ যেমন সেই ভ্রাতৃ দ্বয়ের, নিজাম যেমন কাইকোবাদের, ইনিও এক সময় সেইরূপ ইন্স পেক্টরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। কিন্তু কোন সময়েই ইঁহার ক্ষমতা বা আধিপত্যের কোনরূপ ব্যত্যয় দেখা যায় না। কোন সময় ইঁহার কৌশল জাল কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন হয় নাই এবং কোন সময় ইঁহার অসাধারণ প্রভুশক্তিও প্রতিহত হইয়া উঠে নাই। ইঁহার তাদৃশ অভিজ্ঞতা, লিপিক্ষমতা বা পাণ্ডিত্য না থাকিলেও, ইনি নানা কৌশলে আপনাকে গ্রন্থকার বলিয়া জন সমাজে পরিচিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ইঁহার গ্রন্থে কোনরূপ অসাধারণ গুণ নাই, কোনরূপ পাণ্ডিত্যের সমাবেশ নাই। পাঠশালার এক জন সামান্য গুরুমহাশয় অপেক্ষা ইনি আপনার গ্রন্থে অধিকতর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। এরূপ হইলেও ইনি আপনার গ্রন্থ দ্বারা যেরূপ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, একজন ভবভূতি বা একজন কালিদাস, একজন কবিকঙ্কণ বা একজন ভারতচন্দ্রের অদৃষ্টে সেই সৌভাগ্য সম্পত্তির সহস্র ভাগের একাংশ ঘটিয়া উঠে নাই। আবার যিনি উপাসনায় ইঁহার মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, ইঁহার ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া স্তুতি নীতিতে ইঁহাকে সত্বগুণে মহীয়ান করিয়া তুলিয়া রাখেন, তিনিও লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টির অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। মধ্যে মধ্যে ইন্সপেক্টরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইঁহার বশীকরণের মোহিনী শক্তির কখনো বিলয় দেখা যায় না। ইঁহার সেই চটি চটি বই এখনো সুপুত্রের ন্যায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইঁহার উত্তর কাল সুখাবহ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ নানা কারণে এখন সাহিত্য জীবীদিগের সাতিশয় দুর্দশা ঘটিয়াছে। ইন্সপেক্টর পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন জন্য যে কমিটি সংগঠিত করেন, তাহা দ্বারাও

সুফল লাভ হয় না। এবার পূর্ব্ববঙ্গে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন জন্য এইরূপ কমিটি হইয়াছিল। রাজসাহী বিভাগেও এইরূপ একটি কমিটি আছে। কিন্তু ইহার কোন কমিটির কার্য্যই আশানুরূপ সন্তোষকর হয় নাই। ঢাকার কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি শিক্ষিত লোক ছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিচার ক্ষমতা দুইটি পৃথক জিনিস। আজ কাল তোতা পাখী হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরব লাভ হইতে পারে, কিন্তু তোতা-পাখীর পদানুসরণ করিলে বিচার ক্ষমতা জন্মে না। ঢাকার কমিটিতে এম এ, উপাধি গ্রস্ত সদস্যের সংখ্যাই অধিক ছিল, বলা বাহুল্য ইহাঁরা কেহই বিচাব ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইহাঁরা ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর জন্য যে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য সমাজে নগণ্য গ্রন্থের মধ্যেই রহিয়াছে। দুই খানি পদ্যই অসার, রচনা-নৈপুণ্য-শূন্য, লালিত্য বিবর্জ্জিত। নির্ব্বাচকগণ মৌলিকগ্রন্থের আদর করিতে যাইয়া কোমল-মতি বালকদিগের মুণ্ড নিপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য থাকিতে পাবে, কিন্তু তোষামোদ বা উপরোধের বিপত্তি-পূর্ণ তরঙ্গাঘাতে সে পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা বোধ হয়, মজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

রাজসাহী বিভাগের কমিটীর কার্য্যও এইরূপ নিন্দনীয়। কতিপয় স্কুল মাষ্টার লইয়া সে কামটি সংগঠিত; তাঁহারা সাহিত্য সংসারের কতদুব সংবাদ রাখেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহাঁদের কার্য্য দেখিয়া সাহিত্য বিচারে ইঁহাদিগকে বড় অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা সদ্‌গ্রন্থ বাদ দিয়া একজন অনক্ষর লোকের একখানি অপকৃষ্ট সংগ্রহ ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে সাহিত্য বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ভাল ভাল ইতিহাস থাকিতে ন্যায়রত্নের ইতিহাসের ন্যায় এক খানি অপকৃষ্ট ইতিহাস মনো-নীত হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, ইহাঁরা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া একজনের এক খানি বই দুই তিন শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব বঙ্গ বিভাগের পাঠ্যের তালিকাতেও এইরূপ অনুগ্রহের ছড়া ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের অনুগ্রহ যদি উদারতায় পরিচালিত হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। সার্ব্বজনীন অনুগ্রহ সর্ব্বজনের প্রীতিপ্রদ হইয়া ইহাঁদের বুদ্ধি বিচনার প্রশংসা-বাদ

করিত। ইহাঁরা কিন্তু সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়া আপনাদের বিচার শক্তি কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং অনুদারতার আবর্ত্তে পড়িয়া সাধারণের নিন্দার পাত্র হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী ও পশ্চিম বিভাগের পাঠ্যের তালিকাও দোষ শূন্য নহে। এই দুই বিভাগেও অপকৃষ্ট সাহিত্য ও অপকৃষ্ট সংগ্রহের আদর দেখা যায়। পশ্চিম বিভাগে আজও পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস ও প্রাচীন পুরাবৃত্তসার সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। প্রেসিডেন্সীতে রামের রাজ্যাভিষেক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসকে টিটকারি দিতেছে। পুস্তক নির্ব্বাচকগণ ছাত্রদের সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই, যত পারিয়াছেন, তাহাদের মাথায় পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। একে তাহাদের অভিভাবকগণ আপনারাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহার উপর ইন্‌পেক্টরদিগের কুপোষ্যগণের উদর পরিপূর্ণ করিতে ইহাঁরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা লাইব্রেরীর বার্ষিক রিপোর্টে প্রতি বৎসরই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি উচ্চ, শ্রেণীর গ্রন্থের প্রচার হয় না। কেন হয় না, সে সম্বন্ধে কেহই আজ পর্য্যন্ত বিচার বিতর্ক করেন না। দেশে যে পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য জীবীর অভাব পরিপূরণ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উৎপত্তি হইবে না। ইন্‌স্পেক্টরেরা কেবল স্কুল বহি লিখিয়া আপনাদের আয়বৃদ্ধি করিতেই তৎপর। ভূদেব বাবু পুষ্পাঞ্জলি ও পারিবারিক প্রবন্ধ প্রচার করিয়া সাহিত্য সমাজের বরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত আর কেহই তাঁহার পদানুসরণ করেন নাই। ব্রহ্ম মোহন বাবুর অগাধ গণিত বিদ্যা কেবল একখানি স্কুল পাঠ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাধিকা বাবু কেবল স্কুল পাঠ্য স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভূবিদ্যাতে আপনার বিদ্যা-বিচক্ষণতা সমাপ্ত করিয়াছেন! স্কুল পাঠ্য ভূগোল ও মানিসক গণনাতেই দীন বাবুর ব্যবহারিক শিল্প জ্ঞানের পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহাঁরা অর্থের আশায় পুস্তক লিখিয়া চালাইতেছেন, এবং আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াই আপনাদিগকে সিদ্ধার্থ মনে করিতেছেন, ইঁহাদের দ্বারা সাহিত্য সংসারের উন্নতির আশা নাই; ইহার উপর ইঁহাদের কুপোষ্য ছায়াপোকার ন্যায় রাশি রাশি স্কুল বহি

প্রসব করিয়া ইঁহাদের অনুগ্রহেই অর্থ শোষণ করিতেছেন। ইহাঁরা স্বদেশ হইতে যে পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, সে পরিমাণে স্বদেশের উপকার করিতে পারিতেছেন না। ইহাঁরা স্বদেশীয়দিগকে এমন কিছুই প্রদান করেন নাই, যাহা লইয়া তাঁহাদের দেশ সভ্য সমাজের সমক্ষে গৌরব করিতে পারেন। ইঁহারা আত্ম সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতেই তৎপর, স্বদেশ হিতৈষেতা, পরোপ কারিতা ও স্বদেশের সাহিত্যানুরাগ ইহাঁদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় নাই।

যাঁহারা সাহিত্য-জীবী, বিবিধ গ্রন্থদ্বারা সাহিত্য সমাজের অভাব মোচন তৎপর, তাঁহাদের স্কুলপাঠ্য পুস্তক থাকিলে অগ্রে ঐ সকল পুস্তক চালাইয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ হইলে তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইবে। উদরান্নের জন্য বিব্রত থাকিলে কেহই কোন বিষয়ে কিছু করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং অগ্রে উদরান্নের সংস্থান আবশ্যক। স্কুল পাঠ্য গ্রন্থের দ্বারা ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হইলে, সাহিত্যজীবীগণ অনায়াসে উচ্চতর গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতে পারেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর যদি এই ভাবে সাহিত্য-জীবী দিগের অভাব মোচন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতিবৎসর সরকারী রিপোর্টে উচ্চতর সাহিত্যের অভাব জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতে হয় না। কেবল ইন্সপেক্টরদিগের হস্তে পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার থাকা উচিত নহে। যিনি লেখক, তিনিই পরিচালক হইবেন, ইহা কোন কথা; আর ইন্সপেক্টর বা তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ যে সকল পুস্তক লিখেন, তৎসমুদায়ও ডিরেক্টরের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন স্কুলে প্রচলন করা বিধেয় নহে। ডিরেক্টর ও শিক্ষাবিভাগের সহিত সংস্রব শূন্য বিচক্ষণ লোকেদের দ্বারা স্বাধীনভাবে পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত হওয়া উচিত। যাঁহারা সাহিত্য সমাজের প্রকৃত হিতৈষী তাঁহাদের এ বিষয়ে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। ধীর ভাবে আন্দোলন করিলে ও ডিরেক্টরকে বুঝাইয়া দিলে, অনিষ্টের প্রতিকারের সম্ভাবনা ও সুফলের প্রত্যাশা আছে।

গ্রন্থ রহস্য।

ভাষা গুণে যাহা গ্রন্থন করা যায়, তাহারই নাম গ্রন্থ। গ্রন্থ করিতে পারিলেই গ্রন্থ-কার। গ্রন্থ কিরূপ বুঝান যাইতেছে ; কোন কবি বলিয়াছেন—মনুষ্য হাসি কান্নার মধ্যে পেণ্ডুলম্। কেহ বলিয়াছেন,—মানুষ বড় বোকা, আবার কেহ বলিয়াছেন,—মানুষ বড় পাকা। তুমি গ্রন্থন, করিলে —'মনুষ্য বোকামি ও পাকামির মধ্যে অপূর্ব্ব পেণ্ডুলম্।' নিশ্চয়ই তুমি গ্রন্থ-কার হইবার সুপন্থা পাইয়াছ।

প্রথমত, পাঠ্য অপাঠ্য ভেদে গ্রন্থ দ্বিবিধ। যাহা পাঠ করিতে হয়, তাহা পাঠ্য। যেমন বোধোদয়, নীতিবোধ প্রভৃতি। কেননা বোধোদয় নীতি-বোধ না পড়িলে স্কুল কালেজের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িবার উপায় নাই ; নিম্নশ্রেণীতে না পড়িলে উচ্চশ্রেণীতে যাওয়া যায় না, পাশ করা যায় না, পাশ না করিলে ডিগ্রী হয় না ; ডিগ্রী না হইলে, মুনসেফি মাষ্টারি মোক্তারি মজুরি মনুষ্যত্বের কিছুই হয় না। অতএব বোধোদয় ও নীতিবোধ পাঠ্য। কিন্তু কবিকঙ্কণ কাশীদাস, পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষিতীশবংশাবলি—এসকল না পড়িলে পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যত্বের হানি হয় না, অতএব ঐ সকল অপাঠ্য। সুতরাং বাঙ্গালার সমগ্র সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র—অপাঠ্য।

ফাদার লাফোঁ ও ব্রাদার প্রকার উভয়েরই গণনায় স্থির করেন, গ্রন্থ জড়পদার্থ, আমরা বিশ্বাস করি ; কেন না ইন্সপেক্টর প্রভৃতি কেহ না চালাইলে পুস্তক চলে না। *

দ্বিতীয়ত গদ্য পদ্য ভেদে গ্রন্থ আবার দ্বিবিধ, যাহাতে ভাল ভাল গদ্ আছে তাহা গদ্য। গদ্ নানা প্রকার। যথা—"দশরথ রাজার চারি পুত্র ছিল রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।" "ক্ষুধা পাইলে আহার করিতে ইচ্ছা হয়।" "অম্বজান ও জলজানে জল হয়।" "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।" যাহাতে ভাল ভাল অথচ ভুরি ভুরি গদ্ থাকে তাহাই উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ। প্রমাণ বাঙ্গলার বিজ্ঞান গ্রন্থ সমস্ত।

---

* বোধোদয়ের পুত্তলিকা তত্ত্ব দেখ।

যাহাতে ভাল ভাল পদ থাকে তাহা পদ্য; যেমন—ঘুমন্ত জোছনা, ফুটন্ত চন্দ্রিমা, জাগন্ত সূর্য্যমামা, বাসন্তী বর্ণনা। ভাল পদের 'পদে পদে মিল,' কাজেই পদ্যে প্রায়ই মিল থাকে। মিল থাকিলে, তাহার নাম মিলন পদ্য বা মিত্রাক্ষর। গরমিল হইলে, তাহার নাম বেমিল পদ্য বা শত্রুক্ষর। তখনকার লোক মিলে মিশে থাকিত, কাজেই তখন মিল পদ্য বেশী ছিল; এখন কাঁহারো সঙ্গে কাহারো মিল নাই, কাজেই শত্রুক্ষরের আদর বেশী।

কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি ভেদে গ্রন্থ আবার অনেক প্রকার হয়। কাব্যিকে ভাল কথায় কাব্য বলে। স্বরূপও নয়, বিরূপ নয়, এমন একটা উদ্ভট বা উৎকট কিছু করিতে পারিলেই তাহাকে কাব্যি বলে। যেমন 'রাম নরকে গিয়া দশরথকে প্রথমে প্রণাম করিয়া পর ক্ষণেই তাঁহার কাণ মলিয়া দিলেন', 'বসন্তের প্রভাতে শেফালিকা গন্ধ বিস্তার করিতেছে, অশ্বত্থ শোঁ শোঁ করিতেছে, এমন সময় বৃক্ষ হইতে একটি পক্ক তাল পতিত হইল! হয় ব্রহ্মসনাতন—এ কি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কুমারী যে!!!" ইত্যাদি কাব্য। ইতিহাস অর্থ—এই হাস্য। "সিরাজাদ্দৌলার আদেশে অন্ধকূপে ১২৪ জন ইংরাজ হত হন", "লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করায় মুসলমানের বঙ্গবিজয় সমাধা হইল', "গুজরাট ও গুজরাণওয়া যুদ্ধে ইংরাজ বিশেষ জয়ী হইলেন" এই সকল হাসির কথা বলিয়া ইতিহাস ব য়া গণ্য।

বিজ্ঞান—যাহাতে বিপরীত জ্ঞান হয়, হার নাম বিজ্ঞান। যেমন সহজে বোধ হয়, শৈত্য একটা পদার্থ, নহিলে তা তে হাত পা কন্ কন্ করিবে কেন? কিন্তু বিজ্ঞান শিখিলে বলিতে হইবে—না, শৈত্য টা কিছুই নয়। তেমনই বিজ্ঞান জানিলে বলিতে হইবে, যে কৃষ্ণ বর্ণ—ও টা বর্ণই নহে; ওটা কিছুই নহে।

গ্রন্থ সাধারণত জড় বটে কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষা বিভাগের শক্তি বলে, সেই জড়ে চৈতন্য হয়। সে কিরূপ শক্তি, তাহার বিচার এস্থলে সঙ্গত নহে। অতএব গ্রন্থ রহস্যের অদ্য এই পর্য্যন্ত।

রহস্য লিখিনু মাত্র রহস্য বুঝিবে,
বিরূপে বিরূপ, করি, কোপ না করিবে।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। | মাঘ, ১২৯৫। | ৫ম সংখ্যা।

ভগবতী ভারতী।

ত্রিতালী-ভৈরবী।

পুরাকালের কথা পুরাতন অতি,
স্মরিতে সকলে করি হে মিনতি। ধ্রুবং।

হিমালয় পাশে নিরালয় বাসে
একান্ত রাখি মন, পতি প্রতি
নারায়ণ রাগে আপন সোহাগে
গাহিল ভাবতী ভগবতী।

হেলায়ে পড়েছে দেহ এলায়ে পড়েছে কেশ
সারিরে পদার্থের [illegible],
পতি পদে দৃষ্টি রাখি করে সৃষ্টি
কত তাল লয় সঙ্গতি।

কাল ব্যাপিয়ে তান আলাপিয়ে
বাজায় ত্রি[illegible] ভাবতী,

হৃদয়ে বহিল ত্রিতন্ত্রী ধারা
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী ॥

ওঙ্কার নাদে গম্ভীর খাদে
ধরম করম বহে ভাগীরথী,
মধ্যম গ্রামে প্রেম রস নামে
যমুনা করিল ধীর গতি,

শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞানে উচ্চ মধুর তানে
বহিল বাণী বেগবতী।
ত্রিধারা বহিয়ে প্রয়াগে মিশিয়ে
মিলা'ল জ্ঞান ধরম ভকতি ॥

দৃষদ্বতী পারে সরস্বতী ধারে
ব্রহ্মর্ষি সবে ব্রহ্মমতি,
পরম ব্রহ্ম গানে চরম ধর্ম্ম জ্ঞানে
জগতে দেখা'ল পরম মুকতি।

(সত্য কালের কথা)

জাহ্নবী ধারে গোমুখী, হরিদ্বারে,
কঙ্খল কনোজ হস্তিনা বসতি,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগে শঙ্খ ঘণ্টা রবে
পতিত পাবনী ভাগীরথী।

(ত্রেতাযুগের কথা)

যমুনা জীবনে মধুবাবৃন্দাবনে
পূর্ণব্রহ্ম সনে হ্লাদিনী শকতি,
বেণু বংশী গানে প্রেম ভকতি তানে
যমুনা করিল উজান গতি।

(দ্বাপর যুগ কথা)

অহো কি বিভ্রাটে ভারত ললাটে
চক্র ঘুরাইল নিয়তি!
কুরুক্ষেত্র যোগে রক্ত বালু মাঝে
বিলুপ্ত হইল সরস্বতী।
শস্ত্র শাস্ত্র জ্ঞান হৈল অন্তর্ধান
বাজিল মূর্খতা ভীরুতা সংহতি;
জ্ঞান বিনা ধরম জ্ঞান বিনা প্রেম
নীরস কর্কশ অধোগতি।
সরস্বতী ধার বহে না হৃদয়ে আর
ত্রিবেণী দ্বিবেণী পরিণতি।
ছিন্ন তন্ত্রী লয়ে অশ্রু বিসর্জ্জিয়ে
ঐ শুন কাঁদে মাতা ভারতী।
পুরাতন যন্ত্রে ছিন্ন জ্ঞান তন্ত্রে
আর কি হয় রে স্বর সঙ্গতি!
ধরিতে ধর্ম্মগান ভুলে রে ভকতি তান
জ্ঞান পঞ্চম বিনে দুর্গতি।
বক্ষে বহে দ্বিধারা চক্ষে বহে দ্বিধারা
সর্ব্বাঙ্গে বহে রে স্রোতস্বতী,
আপন বিরাগে করুণার রাগে
ঝরণার মত ঝুরে ভারতী।
থাক রে সুসন্তান রাখ রে মায়ের মান
প্রেম ধর্ম্মে কর জ্ঞানের যুকতি,
সারি-দেহ যন্ত্র, যুড়ি দেহ তন্ত্র
হৃদয়ে বহাও পুন সরস্বতী।
আবার একান্তে পতি পদ প্রান্তে
বসিয়া মাতা স্থির মতি,
নারায়ণ রাগে পূর্ব্বের সোহাগে
গাহুক ভগবতী ভারতী।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ॥ ৯।

পদচ্ছেদঃ। স্ব-রস—বাহী, বিদুষঃ, অপি, তথা—রূঢ়ঃ, অভিনিবেশঃ।

পদার্থঃ। স্বরসেন, সংস্কারমাত্রেণ বহতীতি স্বরসবাহী, বিদুষঃ পণ্ডিতস্য অপি শব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থঃ, অবি-দ্বাংসং সমুচ্চিনোতি, তথা রূঢ়ঃ তথা প্রসিদ্ধঃ অভিনিবেশঃ অভিনিবেশো নাম ক্লেশঃ।

অন্বয়ঃ। বিদুষোঽপি স্বরসবাহী তথারূঢ়ঃ (ক্লেশঃ) অভিনিবেশ ইত্যু-চ্যতে ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যথা অবিদ্বজ্জনস্য তথা বিদ্বজ্জনস্যাপি স্বরসবাহিত্বহেতুনা যঃ ক্লেশঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি সঃ অভিনিবেশ ইতি কথ্যতে। অয়ং হি ক্লেশঃ ভয়াখ্য ইতি বক্ষ্যতি ভাষ্যকারঃ। তথাহি পূর্ব্বজন্মানুভূতমরণদুঃখানুভব-বাসনাবলাৎ ভয়রূপঃ সমুপজায়মানঃ শরীরবিষয়াদিহ মম বিয়োগো মাভূদি-ত্যন্বহং শরীরানুবন্ধঃ সর্ব্বস্যৈবাক্রমেব্রহ্মপর্য্যন্তং নিমিত্তং বিনা প্রবর্ত্তমানঃ যঃ ক্লেশঃ সোভিনিবেশ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। পণ্ডিতমূর্খ সাধারণ অর্থাৎ জীবমাত্রেরই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশত যে একটি স্বাভাবিক মৃত্যুভয় বা শরীরাদির বিয়োগ জন্য ভয় লক্ষিত হয়, তাহার নাম অভিনিবেশ।

সমালোচন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের চিত্তের যত কিছু পরিণাম বা কার্য্য হয় তাহাদের সকলের এক একটী সংস্কার বা ছায়া চিত্তে অঙ্কিত হইয়া থাকে। পরে কোনরূপ উদ্বোধক কারণ আদি উপস্থিত হইলে, ঐ ছায়া হইতেই আবার চিত্তের পূর্ব্ববৎ পরিণাম উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বজন্মে মৃত্যু সময়ে যে একটা অতিউৎকট যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তাহার একটি সংস্কার চিত্তে সংলগ্ন থাকে। সেই সংস্কার বশতই মধ্যে মধ্যে অপরের মৃত্যু আদি দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত মৃত্যুযন্ত্রণা উদ্বুদ্ধ হওয়াতে জীবমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক মৃত্যুভয় দৃষ্ট হয়, এই মৃত্যুভয়ের নাম অভিনিবেশ।

আমরা দেখিতে পাই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত, যিনি বহুপরিশ্রমে নানাবিধ শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়া বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন যে এক দিন না এক দিন এই মাংসপিণ্ড ভৌতিক দেহের সহিত আত্মার অবশ্যই বিয়োগ হইবে, এই শরীর ও আত্মার সংযোগ চিরস্থায়ী নয়, সেই পণ্ডিত নিজেই আবার যাহাতে মৃত্যু না হয়, সেই চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। মূর্খব্যক্তির মৃত্যু ভয় ইহা অপেক্ষা কম নয় মূর্খ বলিয়া সমাজে, গ্রামে, রাজদ্বারে এবং আত্ম-পরিবারের নিকট সর্ব্বদা ঘৃণিত, নিন্দিত, উপহসিত ও অবজ্ঞাত হইয়াও এবং নিজের মূর্খতাজন্য প্রতিক্ষণ মরণাধিক নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াও সে কখনও মৃত্যু কামনা না করিয়া, বরং ইচ্ছা করে, কিসে তাহার জীবন চিরস্থায়ী হয়, তাহার শরীর ও আত্মার যোগ কখন বিয়োগ প্রাপ্ত না হয়। রোগী—মাহারোগে আক্রান্ত, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, সর্ব্বদা যন্ত্রণা-গ্রস্ত সকল লোক কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত,—তথাপি মরিতে ইচ্ছা নাই। দুগ্ধপোষ্য বালকের জন্মের সহিতই মৃত্যু ভয় উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়। কত বলিব কীটাণু হইতে ব্রহ্মা অবধি সকলেরই মৃত্যু ভয় স্বাভাবিক। লোকে অসহ্যক্লেশ ভোগ করে, বারম্বার মৃত্যুর প্রার্থনা করিয়া যদি মৃত্যুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে, অমনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলে আপনি আমাকে বিস্মৃত হোন। এ বিষয়ে কাষ্ঠাহারকের কথা বড় নৈপুণ্যের সহিত রচিত।

এই সর্ব্বসাধারণ স্বাভাবিক মৃত্যু ভয়ের নাম অভিনিবেশ।*

• তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ।

পদচ্ছেদঃ। তে, প্রতি—প্রসব—হেয়াঃ, সূক্ষ্মাঃ।

---

* পৌষ মাসের সংখ্যায় কম্পোজিটর মহাশয় দিগের অনুগ্রহে দ্বিতীয় পাদের নবম সূত্রকে সূত্রই ভুল হইয়াছিল। ঠিক্ পুকুরচুরি! অথচ তাহার পদচ্ছেদ, ব্যাখ্যা, সমালোচনা সবই ছিল। সূত্রই মূল, সূত্র না থাকিলে ব্যাখ্যাদি সমস্তই বৃথা, আবার ব্যাখ্যাদি ব্যতীত সূত্রেরও শোভা নাই। এই জন্য আমরা এই সংখ্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাখ্যা আদির ভাষা বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সূত্রটি প্রকাশ করিলাম। ইতি প্রবন্ধলেখক।

পদার্থ। তে পঞ্চ ক্লেশাঃ, প্রতিপ্রসব—হেয়াঃ প্রতিপ্রসবেন প্রতিলোম পরিণামেন হেয়াঃ ত্যক্তব্যাঃ সূক্ষ্মাঃ বাসনারূপেণ অবস্থিতাঃ।

অন্বয়ঃ। সূক্ষ্মাঃ তে প্রতি প্রসবহেয়াঃ স্যুবিতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ক্লেশা লক্ষিতা—স্তেষাং চ হেয়ানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদার রূপতয়া চতস্রোঽবস্থা দর্শিতাঃ, কস্মাৎ পুনঃ পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা দগ্ধবীজ ভাবতয়া সূক্ষ্মা ন সূত্রকারেণ কথিতেত্যত আহ—তে সূক্ষ্মাঃ প্রতিপ্রসব হেয়া ইতি যৎকিল পুরুষ-প্রযত্ন-গোচরবস্তুরূপ দিশ্যতে, ন চ সূক্ষ্মাবস্থানং প্রযত্নগোচরঃ কিন্তু প্রতিপ্রসবেন কার্য্যস্য অস্মিতা লক্ষণকারণভাবাপত্ত্যা হাতব্যা ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ যখন অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকে ‘প্রতি প্রসব’ দ্বারা পরিত্যাগ করিবে।

সমালোচন। ক্লেশ কি তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন, এবং উদার এই চার প্রকার অবস্থা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই সূত্রদ্বারা তাহাদের অত্যন্ত সূক্ষ্মাবস্থা এবং তাদৃশ সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত ঐ ক্লেশ দিগের উন্মূলনের উপায় বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ সকল ও তজ্জন্য সংস্কারগুলি যখন জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভ্রষ্ট বীজের-ন্যায় হীন শক্তি হয়, তখন তাহাদিগকে ‘সূক্ষ্ম’ বলে। ঐ রূপ সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন ক্লেশ সকলের উন্মূলন আবশ্যক, কারণ যোগীদিগের সঙ্কল্প বশত যেমন দগ্ধ বীজ হইতেও অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে, সেইরূপ তাঁহাদের ইচ্ছায় সেই সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত ক্লেশ নিচয়েও কার্য্য কারিতা শক্তি হইতে পারে। অতএব তাহাদের হানি বিধেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কিরূপে সেই সূক্ষ্ম ক্লেশ সকলের উন্মূলন হয়? ইহার উত্তরে আমরা বলি পুরুষের কোন প্রযত্ন দ্বারা সে ক্লেশের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই, একমাত্র ‘প্রতি প্রসব’ দ্বারাই তাহাদের হানি হয়। প্রতি প্রসব শব্দে প্রলয় অর্থাৎ যখন চিত্তরূপ কার্য্য স্বীয় কারণ সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত হয়, তখন তাহারা চিত্তের সহিত একেবারে মিশিয়া থাকে, পুরুষের এরূপ কোন বাহ্য প্রযত্ন নাই যাহা দ্বারা চিত্ত হইতে উহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে। সুতরাং চিত্তের লয় না হইলে, আর উহাদের উন্মূলন হয় না। এই নিমিত্ত উহাদের উন্মূলনের জন্য চিত্তকে উহার নিজের

কারণ অস্মিতায় লীন করিবে। চিত্ত অস্মিতায় লীন হইলে উহার সহিতই ঐ সকল ক্লেশের হানি হইবে, আর কোন প্রকারেই উহাদের কার্য্য কারিতা-উৎপন্ন হইবে না।

ধ্যানহেয়া স্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১।

পদচ্ছেদঃ। ধ্যান-হেয়াঃ তৎ—বৃত্তয়ঃ।

পদার্থঃ। ধ্যান হেয়াঃ ধ্যানকার্য্যেণ হাতব্যা স্তদ্বৃত্তয়ঃ—তেষাং ক্লেশানাং বৃত্তয়ঃ স্থূলাবস্থাঃ।

অন্বয়ঃ। তদ্বৃত্তয়ঃ ধ্যানহেয়া স্যুঃ।

ভাবার্থঃ। বর্ত্তমানানাং ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলা অভিব্যক্তাবস্থাঃ তাঃ প্রথমং ক্রিয়াযোগেনাল্পীকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন সমাধিপ্রজ্ঞাগর্ভজেন হাতব্যাঃ প্রতিবদ্ধোৎ পত্তিকাঃ কর্ত্তব্যঃ।

অনুবাদ। ঐ সকল ক্লেশ যখন স্থূল অবস্থায় অবস্থিত হইবে, তখন উহাদিগকে ধ্যান অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা উন্মূলিত করিবে।

সমালোচন। ক্লেশ সকল যখন বীজ ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্থূল রূপে অবস্থান করে তখন পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াযোগ দ্বারা তাহাদিগকে কমাইয়া কমাইয়া ধ্যান দ্বারা উহাদিগেকে নির্মূল করিতে চেষ্টা করিবে, পরে আবার সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধবীজস্বরূপ হইলে প্রতিপ্রসব দ্বারা সেই সূক্ষ্ম ক্লেশ সমূহের পরিহার করিবে। প্রতি প্রসব শব্দের অর্থ চিত্তকে স্বীয় কারণে লীন করা; যদি ও সেই দগ্ধ বীজ ক্লেশ হইতে কোন রূপ দুঃখরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই, কিন্তু যেমন বৃক্ষাদির দগ্ধ বীজ কোন যোগীর কৃপায় অঙ্কুরিত হইতে পারে, সেই রূপ কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যোগীর ইচ্ছায় যদি সেই দগ্ধ বীজ ভাবাপন্ন ক্লেশ পুনবার অঙ্কুরিত অর্থাৎ ক্লেশের কারণ হয়, এই নিমিত্ত উহদিগকেও পরিহার করা উচিত। কিন্তু উহারা তখন অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় না, কাযেই ঢাকী শুদ্ধবিসর্জ্জনার মত উহাদের আধার চিত্তকে উহাদের সহিত স্বীয় কারণে লীন করা ভিন্ন উহাদের পরিহারের অন্য উপায় নাই। স্থূল এবং সূক্ষ্ম ক্লেশের পরিহার বিষয়ে ভাষ্যকার একটী বেশ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। "যথা চ বস্ত্রাণাং স্থূলোমলঃ পূর্ব্বং নির্ধূয়তে পশ্চাৎ

সূক্ষ্মা যত্নোপায়েন চাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষা স্থূলাঃ বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাম্ সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি।" যেমন কাপড়ের স্থূলমল অর্থাৎ উপর উপর সংলগ্ন ধূলি প্রভৃতি প্রথমেই অতি অল্প আয়াসে, বাতাসে ঝাড়িবামাত্রই অপগত হয় কিন্তু বস্ত্রের সূক্ষ্ম মল, যে সকল মল বস্ত্রের মজ্জায় মজ্জায় সংলগ্ন হয়ে একেবারে সুতায় সুতায় চিম্‌টে লাগিয়া থাকে, তাদৃশ মল ওরূপ অনায়াসে অপগত হয় না, উহাদের পরিহার করিবার নিমিত্ত যত্ন আবশ্যক করে, অনেক চেষ্টা করিতে হয়, বস্ত্রকে পাষাণ বা কাষ্ঠ ফলকে আছড়াইতে হয়, অথবা শিলাখণ্ড বা কাষ্ঠের লগুড়দ্বারা আঘাত করিতে হয় অথবা কেবল তাহাতেও হয় না, অন্য উপায়েরও আবশ্যক আছে, ক্ষারাদি সংযুক্ত জল দ্বারা ঐ বস্ত্র সিদ্ধ করাও আবশ্যক,—সেইরূপ স্থূল ক্লেশ সকল অল্প আয়াসে অর্থাৎ কেবল মাত্র ক্রিয়াযোগদ্বারাই হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন ক্লেশদিগের পরিহার অতি দুষ্কর, কারণ কেবল ধ্যান দ্বারা উহাদের পরিহার হয় না; অসংপ্রজ্ঞাত যোগদ্বারা চিত্তের বিনাশ হইলে, তবে উহাদের পরিহার হয়।

এইসূত্র হইতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদেরও যে অতি অল্প পরিমাণে অবিদ্যা থাকে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান ভিক্ষু তাহা স্বীকার করেন নাই।

কি নিমিত্ত ক্লেশ সকল পরিহর্ত্তব্য? এই আশঙ্কায় সূত্রকার পরবর্ত্তী ক্রমান্বয়ী তিনটি সূত্রদ্বারা ক্লেশ সকল যে পরম্পরাসম্বন্ধে সমুদয় দুঃখের নিদান তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ক্লেশসকল যে দুঃখোৎপাদনে সাক্ষাৎ দ্বার স্বরূপ তাহাই দেখাইতেছেন।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২।

পদচ্ছেদঃ। ক্লেশ-মূলঃ, কর্ম্মাশয়ঃ (কর্ম্ম-আশয়ঃ), দৃষ্টাদৃষ্ট (দৃষ্ট-অদৃষ্ট) জন্ম-বেদনীয়ঃ।

পদার্থঃ। আশেরতে সাংসারিকা পুরুষা অস্মিন্নিত্যাশয়ঃ কর্ম্মণামাশয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, ক্লেশমূলঃ ক্লেশা মূলং কারণং যস্য সঃ, কর্ম্মণাং শুভাশুভানাং ক্লেশা এব নিমিত্তং, দৃষ্টাঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ দৃষ্টং চ অদৃষ্টঞ্চ দৃষ্টাদৃষ্টে জন্মনী তত্র (অস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে চ) বেদনীয়ঃ অনুভবনীয়ঃ।

অন্বয়ঃ। দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ ক্লেশমূলঃ। ভোজরাজস্তু যথাস্থিত মেব সম্যক্ মন্যতে।

ভাবার্থঃ। দৃষ্টে বর্ত্তমানে জন্মনি ভোগ্যৌ, অদৃষ্টে ভবিষ্যতি বা জন্মান্তবে ভোগ্যৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ক্লেশমূলকৌ ক্লেশে সত্যেব ভবত ইত্যর্থঃ। তথাহি কানিচিৎ পুণ্যানি কর্ম্মাণি দেবতাবাধনাদীনি তীব্র সংবেগেনৈব কৃতানি ইহৈব জন্মনি ফলং জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং প্রযচ্ছন্তি, যথা নন্দীশ্বরস্য ভগবন্ম হেশ্বরাধন—বলাদিহৈব জন্মনি জাত্যাদযো বিশিষ্টাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। এবং মন্যেষাং বিশ্বামিত্রাদীনাং তপঃ প্রভাবা—জ্জাত্যায়ুষী। কেষাঞ্চিজ্জাতিবেব, যথা তীব্রসংবেগেন দুষ্ট কর্ম্মকৃতাং নহুষাদীনাং জাত্যন্তব পবিণামঃ উর্ব্বশ্যাঞ্চ কার্ত্তিকেযশ্চ বনে লতারূপতযা এবং ব্যস্তসমস্ত রূপত্বেন যথাযোগ্যং যোজ্যং।

অনুবাদ। ইহ বা পবজন্মে যাহাব ফল অনুভূত হয এইরূপ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ক্লেশ হইতে উৎপন্ন হয। *

সমালোচন। আমবা দেখিতে পাই কোন কোন পুণ্য বা পাপ কর্ম্মের ফল ইহ জন্মেই ফলে, আর কোন কোন পুণ্য বা পাপ কর্ম্মেব ফল ইহ জন্মে ফলে না। কিন্তু কর্ম্ম মাত্রেবই যখন ফল আছে, তখন যে সকল কর্ম্মেব ফল ইহ জন্মে অনুভূত হয না, তাহাদেব জন্য অবশ্য জন্মান্তব স্বীকাব করিতে হইবে; কাযেই পুণ্য কর্ম্ম দুই প্রকাব, কাহাবও ফল ইহ জন্মে ভোগ হয, আর কাহারও ফল জন্মান্তরে ভোগ হয। এইরূপ পাপকর্ম্মও দুই প্রকাব; কাহাবও ইহ জন্মে ভোগ হয, আব কাহাবও পবজন্মে ভোগ হয়। এই সমুদয় পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের মূল—ক্লেশ। কাবণ চিত্তে রাগ (কামনা বা লোভ) না হইলে কোন প্রকাব কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্তি হয না। দ্বেষ বা মোহজন্যও কোন কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ আমাদেব যত প্রকার পুণ্য বা পাপকর্ম্ম তাহার বাগ, দ্বেষ অথবা মোহ মূলক অর্থাৎ ইহাদেব মধ্যে কোন না কোন একটি কর্ত্তৃক চিত্ত অধিকৃত হইলে পর তাদৃশ কর্ম্ম কবিতে প্রবৃত্ত হয। কাম লোভ প্রভৃতি রাগেব অন্তর্গত, ক্রোধ প্রভৃতি দ্বেষেব অন্তর্গত। কেহ বা স্বর্গ কামনা করিয়া অনন্ত সুখভোগের আশায পুণ্যকর্ম্ম করেন, কেহ বা

* ভোজবাজেব মতে ক্লেশ হইতে উৎপন্ন যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহাদেব (মধ্যে কাহারও) ফল ইহ জন্মে অনুভূত হয (কাহাব) বা পব জন্মে।

লোকের মনোরঞ্জন দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবার আশায় পুণ্য কর্ম্ম করেন। আর আজকাল অনেকে রাজার মনোরঞ্জন দ্বারা উপাধিলাভের আশয়ে পুণ্যকর্ম্ম দানাদির অনুষ্ঠান করেন। যাগ যজ্ঞ হৌক, দান ধ্যান হৌক অথবা স্কুল বা ডাক্তার খানা স্থাপনই হোক, যে আকারে, যে অভিপ্রায়ে হৌক, সকল প্রকার পুণ্যকর্ম্ম যে কামমূ-লক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ পাপকর্ম্ম নিচয়ের মধ্যে কোন কোনটা কাম-মূলক, কোনটা দ্বেষ-মূলক এবং কোনটা বা অজ্ঞান-মূলক। এদিকে দেখ কামই হৌক, ক্রোধই হৌক, দ্বেষই হৌক, আর মোহই হৌক ইহারা সকলেই ক্লেশ; অতএব এক্ষণে স্থির হইল আমাদের পাপ বা পুণ্য সকল প্রকার কার্য্য ক্লেশমূলক। এই সকল পুণ্য বা পাপকার্য্যের ফল উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জাতিপ্রাপ্তি, অধিক বা অল্পায়ু প্রাপ্তি এবং উত্তম বা অধম ভোগ লাভ। কাহারও বা স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে এই তিনটিই ইহজন্মে ঘটে, কাহারও ইহাদের মধ্যে একটি বা দুটি। পুরাণা দিতে প্রসিদ্ধ আছে নন্দিকেশ্বর নামক কোন ব্যক্তি আপনার সৎকর্ম্ম প্রভাবে ইহ জন্মেই মহাদেবের অনুচরত্ব লাভ করে। এবং বিশ্বামিত্র আপনার পুণ্য প্রভাবে ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ব্রাহ্মণ হন এবং দীর্ঘ আয়ুও প্রাপ্ত হন। অন্য দিকে রাজা নহুষ আপনার অসৎ কর্ম্ম প্রভাবে ইহ জন্মেই অজাগর সর্প রূপে পরিণত হন। এইরূপ পুণ্য বা পাপ কর্ম্মের ইহজন্মে ফলপ্রাপ্তির আরও উদাহরণ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পর জন্মে ফলপ্রাপ্তির ত অনেক কথাই আছে। ফল, কর্ম্মফলে জাতির পরিণাম এখনও কিছু কিছু লক্ষিত হয়। এবিষয় বিস্তর লেখা বাহুল্য। ভাষ্যকার বলেন নারকীদিগের দৃষ্টজন্ম বেদনীয়, আর কোন কর্ম্মাশয় অর্থাৎ ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নাই। এবং যাহাদের ক্লেশ ক্ষয় হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তির জন্মান্তরে বেদনীয় কোন ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নাই।

জপজী।

ভূমিকা।

জপজী শিখদিগের প্রথম গুরু নানক সাহেব রচিত। ইহা "আদি গ্রন্থের" প্রথম অধ্যায়। শিখগণ ভক্তি সহকারে আদিগ্রন্থের পূজা করিয়া থাকে। শিখধর্ম্মে হিন্দু দেবদেবীর পূজার বিধান নাই। একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস, আদিম গ্রন্থকে ঈশ্বর বাক্য জ্ঞানে পূজা, এবং গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি—শিখদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়। সমস্ত আদিগ্রন্থ গুরু নানকের রচিত নহে। কথিত আছে নানক-প্রমুখ মহাজনদিগের রচিত পদসমূহ সংগ্রহ করিয়া গুরু অর্জ্জুন পুস্তকাকারে যোজিত করেন। অমৃত সহরের স্বর্ণ মন্দিরে মণি-মুক্তা-খচিত সিংহাসনোপরি স্থাপিত "গ্রন্থ সাহেব," সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের পরম সমাদরের বস্তু, উহাই আদিগ্রন্থ *। অমৃতসর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে পরবর্ত্তী গুরুদিগের রচিত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহাও শিখসম্প্রদায়ের পরম পূজ্য। কিন্তু সকল গুরুই নানককে আদিগুরু স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব রচিত পদসমূহে নানকের নামেই ভণিতা দিয়াছেন, নিজের নাম কোন স্থলেই প্রকাশ করেন নাই। ঐসকল মহাত্মাদিগের চিত্ত সামান্য যশ বা প্রভুত্ব লালসায় মুগ্ধ ছিল না। স্বদেশের সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, এবং গুরুনানকের একমাত্র নামাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন করিয়াই তাঁহারা সেই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের মর্ম্ম তাঁহারাই সম্যক বুঝিয়াছিলেন। শিখগুরুগণের ধর্ম্মজীবন ব্যক্তি মাত্রে-রই আলোচ্য। এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে বঙ্গভূমিতে যে সকল ইংরাজী বিদ্যাভিমানী দেশহিতৈষী বন্ধুগণ ভারতমাতার উদ্ধার মানসে সুকুমার কণ্ঠ

---

* কেহ কেহ বলেন যে প্রকৃত আদি গ্রন্থ করতারপুরে গুরুজরাহর সিংহের গৃহে বিদ্যমান আছে। অমৃত সরে আদিম যে গ্রন্থ আছে তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

বিদারণ, অভোজ্য-ভোজন, বিধবা জননীর বিবাহ প্রভৃতি কঠোর আত্মোৎসর্গে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা একবার জ্ঞান নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক পঞ্জাব ভূমির প্রতি কটাক্ষপাত এবং শিখগুরুদিগের কার্য্য কলাপ পর্য্যাবেক্ষণ করুন, অন্ধকারে আলোক লক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শিখ ধর্ম্মাবলম্বীগণ জপজীকে অতি পবিত্র শাস্ত্র, এবং সৎকর্ম্মোপদেশের সার বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। সৎব্রাহ্মণেরা যেমন গায়ত্রী জপ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শিখেরাও তেমনি অতি প্রত্যূষে জপজীর প্রথম পদ কেহ দশ বার কেহবা শতবার, জপ না করিয়া পার্থিব কার্য্যে লিপ্ত হয় না। অনেক শিখ সমস্ত জপজি প্রত্যহ এক বা ততোধিক বার পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঈদৃশ বহুল কণ্ঠস্থপাঠের ব্যবহার থাকিলেও উহার অর্থগ্রহ অধিকাংশ শিখেরই নাই। এমন কি শিখ গ্রন্থীদিগের মধ্যেও অনেকে উহার ঠিক ঠিক অর্থ অবগত নহে। আধুনিক শিখগুরুগণের মূর্খতা এবং শিখধর্ম্মের অবনতিই ইহার প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন কয়েকটী আনুসঙ্গিক কারণ বশত জপজী সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়াছে।

১। নানক কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার আদ্যন্ত রচনা করেন নাই। তাঁহার শিষ্যেরা সময়ে সময়ে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, এবং নীতি সম্বন্ধে সংশয় ছেদন প্রার্থনায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, উত্তর স্বরূপ তিনি যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই সাধারণের উপকারার্থ পদ্যাকারে রচিত হইয়া "জপজী"র আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ প্রশ্নগুলি কি, তাহার স্থিরতা নাই; পরন্তু প্রশ্নগুলি সবিশেষ না জানিলেও উত্তরের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি হওয়া কঠিন। আবার একই পদে একাধিক প্রশ্নের উত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে, এজন্য জপজীর স্থানে স্থানে সহসা অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই নানক নানা শিষ্যের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, ইহা স্মরণ থাকিলে অসামঞ্জস্য বোধ হইবে না। জপজীর সকল পদের ছন্দ ও পংক্তি সংখ্যা সমান নহে, ইহাও বোধ হয় উক্ত কারণে ঘটিয়া থাকিবে।

২। হস্তলিখিত পুথীর উপর এবং শিষ্য পরম্পরার স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর থাকিলে প্রচীন পদের যেরূপ বিকৃতি হইয়া থাকে, জপজীরও তাহাই

ঘটিয়াছে। জপজীর প্রায় সকল পদই কঠিন আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ, অর্থ লেখক বা শিষ্য উহার ভাব সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইয়া পাঠের ব্যতিক্রম ঘটাইবে ইহাতে বিচিত্র কি ? তাহার উপর আবার টীকাকার মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্য। বিশ্বাস ও রুচি ভেদে এক জপজীতেই কেহ দ্বৈত মত, কেহ বা অদ্বৈত মত, কেহ বা মায়াবাদ, কেহ ভক্তির, কেহ বা জ্ঞানের প্রাধান্য ইত্যাদি নানা অর্থ আবিষ্কার করত স্বস্ব পাণ্ডিত্য দ্বারা সাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। কথিত আছে এই প্রকার ৫২ খানি টীকা আছে। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। এখন কোন্ পাঠ ও কোন্ অর্থ প্রকৃত, নানক স্বয়ং ধরাধামে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে স্থির হইবার উপায় নাই।

৩। নানক সর্ব্ব শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার রচিত পদসমূহ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরন্তু তিনি শাক্য সিংহের ন্যায় প্রচলিত প্রাকৃত (পঞ্জাবী) ভাষাতেই উপদেশ দিতেন। তাঁহার পদসকলও প্রাকৃত ভাষাতেই রচিত। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম জনসাধারণের জন্য, পণ্ডিতগণের জন্য নহে। বাস্তবিক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে নূতন শিক্ষা দিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। পুরাতন মহাত্মাগণ ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যের যতদূর সাধ্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহাদের অমূল্য ভাণ্ডার জন সাধারণের পক্ষে রুদ্ধদ্বার। গুরু নানক অমৃত সংগ্রহ পূর্ব্বক মাতৃ ভাষার মধু ময় পাত্রে সংস্থাপন করিয়া ব্যক্তি মাত্রেরই উপভোগ্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত হইয়া ঘোর অন্ধও ধর্ম্মালোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নানকের ভাষা জ্ঞান অদ্ভুতছিল। তিনি যখন যে দেশে যাইতেন, যখন যেরূপ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেন, সেই সেই দেশের ও সেই সেই ব্যক্তির মাতৃভাষা ব্যবহার করিতেন। আরবী ও পারসী ভাষায় তাঁহার প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। মুসলমান মৌলবীগণের সহিত তর্কে ও তাহাদের উপদেশের জন্য বহুবিধ পদ আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচনা করিয়াছেন। সম্রাট বাবর সাহের সহিত ধর্ম্মতর্কে যে সকল আরবী পদ রচনা করেন, অদ্যাবধি তাহা আদর্শ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। অপিচ, পঞ্জাব প্রদেশ বহুকালাবধি মুসলমানাধীন থাকায়, অনেক আরবী ও পারসী শব্দ প্রচলিত ভাষায় স্থান পাইয়াছিল, এজন্য নানক রচিত পদ সমূহের মধ্যে আরবী ও

পারস্য শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কালক্রমে তৎকাল প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার সহিত আধুনিক পঞ্জাবী ভাষার অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে। অনেক শব্দের ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে, উচ্চারণগত ভেদ বিস্তর হইয়াছে। এজন্য আধুনিক পঞ্জাব দেশবাসী নানকের পদ সকলকে সংস্কৃত শ্লোকের অপেক্ষা কোন মতেই সহজ মনে করে না।

৪। নানকের পদসমূহ, প্রত্যুত শিখদিগের যাবদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ, গুরুমুখী নামক অক্ষরে লিখিত। সম্ভবত নানকের বহুপূর্ব্ব হইতে পঞ্জাব প্রদেশে গুরুমুখী বর্ণমালা প্রচলিত আছে, কিন্তু নানকের পূর্ব্বে উহাতে কোন স্থায়ী গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ অদ্যাপি ঐ বর্ণমালায় লিখিত হয় না। গুরুমুখী বর্ণমালা দেবনাগরিক বর্ণমালার অপভ্রংশ মাত্র। উহাতেও ক, খ, প্রভৃতি বর্ণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র আকারে সন্নিবেশিত আছে। লিখিবার সময় বর্ণবিন্যাসের নিয়মও প্রায় একরূপ। বিভিন্নতা এই যে, উহাতে যুক্তাক্ষর নাই, এবং ইকার উকার সংযোগ প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইহাতে "ষত্ব ণত্বের" প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, লেখকের ইচ্ছামত এবং শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া "যথাশ্রুতি" বানান করা হইয়া থাকে; একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সংযোগে লিখিত হইতে দৃষ্ট হয়। পংক্তিতে শব্দবিচ্ছেদ করিয়া লিখিবার প্রথা নাই, একই মাত্রায় সকল শব্দ লিখিত হয়। ফলত গুরুমুখী লিখন পদ্ধতি অদ্যাপি নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। এই সকল কারণ বশত গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। পূর্ব্বে মর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে, গুরুমুখী পাঠ করা বিষম কঠিন। আজকাল কতিপয় নব্য শিক্ষিত দেশানুরাগী ব্যক্তি শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় উল্লিখিত বিশৃঙ্খলতা নিরাকরণ মানসে যত্নশীল হইয়াছেন, এবং দেবনাগরিক বর্ণমালানুযায়িক আকার ইকারাদি স্বরসংযোগ এবং ইংরাজী ব্যবচ্ছেদ চিহ্নাদি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুমুখীর কোন প্রকার সংস্কার অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মগ্রন্থে প্রাচীন প্রথার তিলমাত্র ব্যতিক্রম তাহারা পাপ মনে করিয়া থাকে। দেবনাগরিক বা পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ সাহেব বা তাহার কোন অংশ লেখা বা মুদ্রিত করা তাহাদের মতে ভ্রষ্ট

নাস্তিকের কার্য্য। * নানক-প্রমুখ গুরুগণ প্রচুর ম্লেচ্ছশব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক শিখ গ্রন্থীগণ তৎকৃত পদসমূহ দেবনাগরিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ করাও পাপ মনে করে। হায়! শিখদিগের কি শোচনীয় অবনতিই ঘটিয়াছে।

জপজীর ন্যায় সর্ব্ব সম্প্রদায় সমাদৃত গ্রন্থ বঙ্গভূমে এতাবৎ প্রায় অজ্ঞাত রহিয়াছে, ইহা ধর্ম্মানুরাগী মাত্রেরই আক্ষেপের বিষয়। গুরুমুখী লিখিত জপজী পাঠ করা অধিকাংশ বাঙ্গলীর পক্ষেই অসাধ্য। সরল অর্থ সহ বাঙ্গালায় জপজী প্রকাশিত হইলে, উপকার হইতে পারে, এই বিবেচনায় আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিয়াছি। আমার অজ্ঞানতা বশত অনুবাদে অনেক ভ্রম হইয়া থাকিবে। এক্ষণে পাঠক মহাশয়দিগের উপর বিচারের ভার।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমি বঙ্গীয় পাঠকের সুবিধার জন্য অনেক স্থলে হিন্দি ভাষানুযায়ী বানান এবং শব্দ বিচ্ছেদ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি। মূল জপজীতে বানানের অস্থিরতা এবং শব্দের অবিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিয়া টীকাকারেরা নানা পাঠ ও নানার্থ ঘটাইয়াছেন, এ সকলের বিস্তারিত সমালোচন আমার উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিদেশীয় ভাষা বঙ্গাক্ষরে লিখন সম্বন্ধে আমাদের একটী গুরুতম অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দীও পঞ্জাবী ভাষায় অন্তস্থ ব বর্ণের ব্যবহার অতি বিস্তৃত। উহার প্রকৃত উচ্চারণ ইংরাজী v বর্ণের ন্যায়; বাঙ্গালী এই উচ্চারণে উদাসীন। এজন্য বাঙ্গালা বর্ণমালায় বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব এই দুই বর্ণের ভিন্নতা—আকার-গতভেদ—রক্ষিত হয় না; কিন্তু হিন্দী ও পঞ্জাবী ভাষা লিখিতে হইলে, ঐ ভেদ রক্ষা করা অতীব আবশ্যক, নতুবা শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া যায়। পাঠকগণ জপজীর পাঠকালে বর্গীয় জ, ব বর্ণের সহিত অন্তস্থ য, ব

---

* শিখগ্রন্থীগণের সহিত পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শোচনীয় বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও কম দোষী নহেন। সে দিন একজন অতি বিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট জপজীর কথা উত্থাপন করায়, তিনি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন শিখ গ্রন্থ পাঠ করা মহা পাপ, তিনি উহা স্পর্শও করেন না।

বর্ণের, এবং শ, ষ ও স, এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণগত পার্থক্য স্মরণ রাখিয়া পাঠ করিলে ছন্দ ও শব্দের মনোহারিতা বিশেষ অনুভব করিয়া প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

—০—

বাউলের গান।

তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ, কার তরে মন উপবাস?
কাব তবে তের পার্ব্বণ, করিস্ রে তুই বার মাস?
রুক্ষু চুলে, গাঁট্টা মাথে, লম্বা নখে, ঊর্দ্ধ হাতে,
ধুনি জেলে বৃষকাঠে, গাছ তলাতে করিস্ বাস,
কেন ধুনি জেলে বৃষকাঠে, গাছ তলাতে করিস্ বাস।
ছাই মুখে, চিম্‌টে, কাঁধে গাঁজা টেনে, নেক্‌ড়া পিঁধে,
এমন্ শ্রী-ছন্ন ছাঁদে, পাবি কি তুই শ্রীনিবাস?
ভেবেছিস্ এমন শ্রীছন্ন ছাঁদে, পাবি রে তুই শ্রীনিবাস।
তুমি মানুষের ছেলে, সে মানুষ ভুলে গেলে,
মানুষ কি মাটীতে মেলে, রঙ্গ্ দিয়ে কল্লে তরাস্?
ভোলা মন মানুষ কি কাঠে মেলে, রঙ্গ্ দিয়ে কল্লে তরাস্।
তুই নিজে প্যাগম্বর তোর মাঝে বিশ্বম্ভর,
তবে কেন দিগম্বর, হয়ে, করিস্ হা হুতাশ।
ক্ষেপা মন হয়ে কেন দিগম্বর করিস্ রে তুই হা হুতাশ
যে আছে অন্তরে তারে ভাবিস্ অন্তরে,
অন্তরের ধন অন্তর করে, করিস্ রে তল্লাস্।
বোকা মন অন্তরের ধন অন্তর করে করিস্ রে তল্লাস।
দেখ যত তপ, জপ, কেবল কটভজপ,
ছেড়ে দে রে লপ ঝপ স্থির মনেতে কর বিশ্বাস,
বাচাল মন ছেড়ে দে রে লবরূপ, স্থির মনেতে রাখ বিশ্বাস।

—০—

বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার।

ভাষার উন্নতিতে সাহিত্যের সৃষ্টি। ভাষার কিরূপ এবং কতটুকু উন্নতি হইলে, সাহিত্য হয়, বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করা বড় সহজ নহে। মোটামুটি এতটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে ভাষা যত দিন ব্যাকরণ অলঙ্কারের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া, অজ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া, আপন পথে চলিতে থাকে, তখন তাহা কেবল ভাষা মাত্র। ভাষার আত্মজ্ঞান জন্মিলেই, ব্যাকরণ কায়দা মানিতে হইবে কি না হইবে, ভাষার মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইলেই, অলঙ্কারভূষণে ভূষিত হইবার বাসনা ভাষার মনে উদিত হইলেই, বুঝিতে হয়, যে ভাষা শৈশব হইতে, কৈশোরে, অর্থাৎ সাহিত্যপদবীতে পদার্পণ করিতেছে।

সকল ভাষাই প্রথম অবস্থাতে কাজ চালাইবার জন্য মুখে মুখে ব্যবহৃত হয়, তাহার পর কলমবন্দী হয়। কিন্তু কোন ভাষা কলমবন্দী হয় নাই বলিয়াই, সেই ভাষায় সাহিত্য নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। বড় বড় সাহেবেরা বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যভূমিতে লিখন পঠন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র বহুকাল ধরিয়া গুরু শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহারা একথা বলিতে পারেন না, যে বেদ সাহিত্য নহে। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মঙ্গোপার্ক সাহারা প্রদেশে লিখিত সাহিত্য দেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সমক্ষে অতিথি-সৎকার-পরায়ণা কুটীর বাসিনী রমণী দ্বয়, পা ছড়াইয়া সূতা কাটিতে কাটিতে, চরকার গুণ গুণ স্বরে আপনাদের মৃদুস্বর মিলাইয়া যে অভ্যর্থনা-গীতি গান করিয়াছিল, তাহা সাহিত্যের অঙ্কুর বলিতে হইবে।

সকল সাহিত্যের অঙ্কুর কোন না কোন রূপ গান হইতেই হয়। অতি অসভ্য অবস্থায় স্নেহময়ী জননী যখন ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইবার জন্য গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করিতে থাকে, তখনই জানিবে ভাষায় সাহিত্যের অঙ্কুর হইতেছে ; যুদ্ধপ্রিয় মদোন্মত্ত বর্ব্বর যখন আপন দলমধ্যে সমরোৎসাহ বর্দ্ধিত করিবার জন্য ভীষণ তাণ্ডবের সহিত তালে তালে গান করিতে থাকে, তখনই জানিবে সাহিত্যের অঙ্কুর দেখা দিতেছে। তবে প্রকৃতি সুকৃতি বলে এই অঙ্কুর হইতে কোথাও সংস্কৃতের মত বিশাল সাহিত্য বট-বিটপী উদ্ভূত হয়, কোথাও বা এস্কিমদিগের ভাষার মত অঙ্কুর অঙ্কুরই রহিয়া যায়।

সকল ভাষাতেই গান হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি, ইহাতেই বুঝাযায়, যে কেবল মনের ভাব মাত্র যেন তেন প্রকারেণ প্রকাশ করিতে পারিলেই হইল, মানব এই অবস্থা ছাড়াইয়া উঠিলে তাহার মনে ধারাবাহিক রস সঞ্চার হয়, এবং অন্যের মনে রস সঞ্চালনের ইচ্ছা হয়, তখনই সাহিত্যের অঙ্কুর উঠিতে থাকে।

অতএব রস-রচনাই সাহিত্যের জান বলিতে হইবে। রসাত্মক রচনার নাম কাব্য। সমগ্র কাব্য কলাপের নাম সাহিত্য। এই সাহিত্য পদ্য গদ্য ময়।

সাহিত্যের প্রথমাবস্থা গীতি, দ্বিতীয় অবস্থা পদ্যময়ী, তৃতীয় অবস্থা গদ্যময়ী। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না, যে পদ্যের অবস্থার সময় গীতি থাকে না, বা হয় না অথবা গদ্যের অবস্থা সময় গীতি বা পদ্য থাকে না বা হয় না।

ভাষায় লিখন পঠন থাকিলেই দলিল দস্তাবেজ হয়। কিন্তু সাধারণত দলিল দস্তাবেজ সাহিত্য নহে।

আবার ছন্দময়ী রচনা হইলেই যে সাহিত্য হয় এমনও নহে। ভাষা পরিচ্ছেদ পদ্যবটে কিন্তু সাহিত্য নহে। সেইরূপ চরক, সুশ্রুত, নিদান, ব্রহ্মমোহনের জ্যামিতি—এ সকলও সাহিত্য নহে।

অন্যান্য সাহিত্যের মত বাঙ্গালা সাহিত্যেও অগ্রে গীতি, পরে পদ্য, শেষে গদ্য হইয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি গীতিকার ;

মুকুন্দরাম, কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি পাঁচালি রচয়িতা; প্রকৃত গদ্য সাহিত্য বোধ হয় পৌনে দুই শতবর্ষের মধ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে। সেই কথাই বলিব।

বাঙ্গালা ভাষায় উহার বহুপূর্ব্ব হইতেই অবশ্য গদ্য ছিল, হিসাব কিতাবে চিঠিপত্রে, দলিল দস্তাবেজে, গদ্য থাকিবার কথা, ছিলও বটে। কৃষ্ণচন্দ্র রাজার উইলে সেই গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল ভাষা সম্বন্ধে ধরিতে গেলে, সেই গদ্যে ও এখনকার গদ্যে বড় অধিক পার্থক্য নাই।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম রায় কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে রাজীবলোচন রায় কৃষ্ণনগরের রাজ বংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে ভবানন্দ মজুম-দারের পিতামহ কাশীনাথের বাগুয়ানে আগমন অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আছে। রঘুরামের মৃত্যু বা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেকের কথা নাই। তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, ওখানি রঘুরামের জীব-দ্দশাতেই লিখিত হয়। *

সুতরাং সেই গ্রন্থ পৌনে দুইশত বর্ষের অধিক দিনের নহে। খাটি বাঙ্গালার তাহাই গদ্য-সাহিত্যের আদি গ্রন্থ বলিতে হইবে। এই গ্রন্থ বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়। এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, সমগ্র গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, উদ্ধৃত অংশ নানা স্থান হইতে দেখিয়াছি মাত্র; সময়ান্তরে আপনা-দিগকে এই গদ্যের নমুনা উপহার দিব। এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন হওয়া আবশ্যক। কেহ অনুগ্রহ করিয়া একখণ্ড দিলে, আমরাই পুনর্মুদ্রিত করিতে পারি।

তাহার পরের গদ্য-গ্রন্থকার রামরাম বসু। তাঁহার গ্রন্থ—প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত। এখানিও বিলাতে ছাপা হয়, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

তাঁহার পরের গদ্য গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক জীবিত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-

---

* নবজীবনের চতুর্থভাগে "কৃষ্ণনগরের রাজবংশ" নামক প্রবন্ধে আমরা এই সকল কথা সবিস্তার বলিয়াছি। ইচ্ছা এবং অনুগ্রহ হইলে পাঠক মহোদয় সেই প্রবন্ধ একবার (বা আর একবার) দেখিতে পারেন।

চরিত ও তাঁহার কৃত গ্রন্থাবলির, সবিস্তার পরিচয়, অদ্য আপনাদিগকে আমরা উপহার দিব।

১৭৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে একভাগ বাঙ্গালা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই মার্শমান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িষ্যা-জাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া বলিয়া জানেন। বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, থণের চাটুর্‌তি, শ্রীকরের সন্তান।

মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম মেদিনীপুরে, বিদ্যা শিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে, নাটোরে। নাটোর তখন অর্দ্ধবাঙ্গালার রাজধানী।

পূর্ব্বেই বলিযাছি মৃত্যুঞ্জয়ের জন্মস্থান ও শৈশব-ক্ষেত্রের ভাষা ত্র্যহস্পর্শিনী ছিল। তাহার পর কৈশোরে তিনি নাটোরে, এবং যৌবনে কলিকাতায় বাস করাতে, তাঁহার ভাষা একরূপ পঞ্চগব্যময়ী হইবে, তাহা আর বিচিত্র নহে। তাহাতে দধি দুগ্ধের সহিত গোমূত্র গোময়ের অসদ্ভাব নাই। নাই থাকুক, তথাপি হিন্দুসংস্কার বশে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী গদ্য সাহিত্য অতি পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। এবং পবিত্র ভাবেই গ্রহণ করিতে পাঠককে অনুরোধ করিতেছি।

মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের চীফ্ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ডওয়েলেস্‌লি, সিবিলিয়ানদের বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মৃত্যুঞ্জয় * সেই কালেজের

* Lord Wellesley, finding the Civil Servants imperfectly acquainted with the languages of the country, established the College of Fort William in Calcutta, in the year 1800. * * * * * * Able pundits were retained; and various works in Bengalee and other languages were compiled and printed, and thus a new impulse was given to the improvement of the country. The learned Mrityunjoy, a native of Orissa, was appointed chief of the Native Department, and reflected high honor on the institution by his great talents &c., &c, &c.

Marshman's History of Bengal
Section XVIII. page 252.

দেশীয় ভাষাবিভাগের প্রধান পণ্ডিত হইলেন। পূর্ব্ব পরিচয়েই কতক কতক বুঝিতে পারা গিয়াছিল, মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা জানিতেন এখন গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন দেখিয়া আমাদের সেই অনুমান দৃঢ়ীভূত হইল। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত হন। মৃত্যুঞ্জয়ের আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম রামমোহন। রামজয়ের পুত্র যদুনাথ ও সীতানাথ। রামমোহনের পুত্র বেহারীলাল ও ব্রজনাথ। এই বেহারী বাবুর অনুগ্রহেই আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিতে পারিলাম। ইঁহাদের বর্ত্তমান বাস, রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্ বাগবাজার, কলিকাতা।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে একটি হাস্য জনক গল্প শুনিয়াছি—আমাদের মূল প্রবন্ধের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও এই স্থলে গল্পটি বলিতেছি, পাঠক মহোদয় মার্জ্জনা করিবেন।

জন্মস্থানের প্রথানুসারে এবং গাঢ় বাল্যাভ্যাস বশত মৃত্যুঞ্জয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াও প্রত্যহ প্রাতঃ সন্ধ্যাদির পরে পলাণ্ডু পান্তভাত আহার করিতেন আর অধ্যাপনা কালে ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে পলাণ্ডুর অক্ষয় গন্ধ অনবরত বিকিরণ করিতেন। দেশীয় ছাত্রেরা ভয়ে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিত না—অন্যান্য পণ্ডিত গণের নিকটে গিয়া এই বিষয় তর্কালঙ্কারকে বলিতে বলিল। মৃত্যুঞ্জয় আর না পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন, এরূপ অনুরোধ করিতে বলিল।

পণ্ডিতেরা সাজিয়া গুজিয়া, স্মৃতি মুখস্থ করিয়া একদিন মৃত্যুঞ্জয়ের বাসায় গেলেন; এ কথায় সে কথায় কথা তুলিলেন, যে দ্বিজাতির পক্ষে পলাণ্ডু ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মৃত্যুঞ্জয় মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন "আপনিত পেঁয়াজ দিয়া প্রত্যহ পান্ত ভাত খাইয়া থাকেন।" মৃত্যুঞ্জয় তাহও স্বীকার করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন "আপনি মহাপণ্ডিত হইয়া, শাস্ত্র জানিয়া ও মানিয়া তবে এমনকর্ম্ম কেন করেন?" তর্কালঙ্কার বিস্ময়ে বলিলেন, "কি কর্ম্ম?" পণ্ডিতেরা বলিলেন "পলাণ্ডু ভক্ষণ।" মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "আমি পলাণ্ডু ভক্ষণ করি তোমাদিগকে কে বলিল?" "এই মাত্র আপনি বলিলেন—প্রত্যহ পেঁয়াজ দিয়া পান্তভাত

খান।" "তাত খাই, কিন্তু পেঁয়াজ যে পলাণ্ডু এটা তোমরা কিসে বুঝিলে?" তখন পণ্ডিত মণ্ডলী মুণ্ড চুল্‌কাইতে লাগিলেন। বিদ্যালঙ্কার বলেন "তাইত হে বিদ্যাভূষণ! তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এ যে বড় বিষম ফাঁকি দেখিতেছি।" আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা সচরাচর ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় ও স্মৃতি পড়িয়া থাকেন, কিন্তু রাজদ্বারে হাতী দেখিয়া বলেন "ওটা যখন রাজদ্বারে রহিয়াছে, তখন বান্ধবই হইবে"। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের অপূর্ব্ব ফাঁকির সেদিন আর মীমাংসা হইল না।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। তিনি 'প্রবোধ চন্দ্রিকা,' ও 'রাজাবলি' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সংস্কৃত হইতে 'পুরুষপরীক্ষা' ও হিন্দী হইতে 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদ করেন। এই কয় খানি গ্রন্থই তাঁহার সিবিলিয়ান ছাত্রগণের জন্য লিখিত হয়।

যদিও গ্রন্থ কয়খানি মূলত সাহেবদের জন্য লিখিত, কিন্তু তৎকালে অন্য কোন গদ্যগ্রন্থ না থাকায় ঐগুলি স্কুলকালেজে শিক্ষিত মাত্রেরই পাঠ্য ছিল। প্রথমে স্কলার্শিপ্ পরীক্ষা সৃষ্টি হইলেই প্রবোধচন্দ্রিকা পাঠ্য নির্ণীত হয়। এখন পর্য্যন্ত পুরুষপরীক্ষা পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বত্রিশ সিংহাসন কখন দেশীয় ছাত্রগণের পাঠ্য ছিল কি না জানি না। রাজা-বলি ছিল।

সম্প্রতি তর্কালঙ্কারের পৌত্র শ্রীযুক্ত বেহারী লাল চট্টোপাধ্যায় রাজা-বলীর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভূমিকায় বলিয়াছেন যে রাজাবলী ১৮১০ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থমধ্যে ১৮০৫ সালে ইহা লিখিত এমন পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাজাবলী গ্রন্থ, তখনকার হিসাবেত বটেই, এখনকার হিসাবেও অতি অদ্ভুত গ্রন্থ। ইহাতে কলির প্রারম্ভ যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে, ইংরেজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌গণের সংক্ষেপ ইতিহাস আছে। গ্রন্থকার আশ্চর্য্য গবেষণায় বহুতর পুরাণ হইতে পুরাতন কাহিনী ও বহুতর পারস্য গ্রন্থ হইতে ভারতে মুসলমান ইতিবৃত্ত, সংগ্রহ করিয়াছেন,—

রাজাবলী গ্রন্থের নমুনা স্বরূপ উপক্রমণিকা ভাগের কয়েক পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩,০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল। তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল। এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যের পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ বৎসর। তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ১৬ জন যোগীতে ৬৪১।৩ মাস। তাহার পর তিলকচন্দ্র অবধি গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ জনেতে ১৪০।৪ মাস। তাহার পর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ জন বৈরাগীতে ৪৫।৭ মাস। তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ জনেতে ১৩৭।১ মাস। তাহার পর দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর। তাহার পর পৃথুরায় এক জনেতে ১৪।৭ মাস। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১,২২৩ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪,২৬৭ বৎসর গত হইল। এপর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।"

মাঝামাঝি আর একস্থানে দেখুন,—

"ঐ বাবোরের বিবরণ এই—অমীর তৈমূরের পুত্র মীরজামীরশাহ; তাহার পুত্র মীরজামহমুদ, তাহার পুত্র মীরজা অবশইদ, ইঁহার ১৫ পুত্রের মধ্যে একপুত্র মীরজা উমরশেখ, ইনি অন্দজা দেশের বাদসাহ ছিলেন; ইহার পুত্র মীরজা মহমূদ বাবোর, ইনি তক্তে বসিলে পর, জহিরুদ্দীন বাবোরশাহ নামে বিখ্যাত॰ হইলেন। ঐ অমীর তৈমুর আপনি আপনার তুজকতৈমুরি কেতাবেতে অধস্তন স্বসন্তানদের শিক্ষার্থে যে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক কথা লিখি।—ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ও আপন নিয়তির সহকারেতে এইক্ষণে আমার রেকাবে চলিতে ২৭ বাদসাহ আকাঙ্ক্ষী; সেই নিয়তি এই —আমি যখন যে দেশ অধিকার করিলাম, তখন যে রাজারা যুদ্ধে মৃত হইলেন তাঁহাদের সন্তানকে আপন বশীভূত করিয়া স্বপিতৃপদে স্থাপিত করিলাম, কখনও কাহাকেও বে-বুনিয়াদ করি নাই। আর সেই সেই দেশের বৃদ্ধদিগকে পিতার তুল্য, যুবাদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, বালক দিগকে পুত্রের ন্যায়, বৃদ্ধা স্ত্রীদিগকে মাতার ন্যায়, যুবতীদিগকে ভগ্নীর ন্যায়, বালিকাদিগকে কন্যার ন্যায়, জ্ঞান করিলাম ও ধনাঢ্যদের ধন স্বধনের ন্যায় রক্ষা করিলাম,

নির্ধনীদিগকে ধনাঢ্য করিলাম, প্রজালোকের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইলাম, ইহাতে ঈশ্বরের কৃপাতে আমার সন্তানেরাও এ জগতের নমস্য হইবেন এ নিশ্চয় বটে, তথাপি এই নিয়মের মত ব্যবহার করা তাহাদেরও কর্ত্তব্য।"

শেষ ভাগ দেখুন,—

"এইরূপে সুবে বাঙ্গালাতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কোম্পানি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ও আপন মুনিব নবাব সিরাজ-দ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি বৃক্ষের ফল পাইলেন, অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরসেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম, অতএব বিপরীত খরচস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসীসমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পরমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করিলেন। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। *

"এইরূপে নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহআলম বাদসাহ পর্য্যন্ত ও মুনিমখাঁ নবাব অবধি নবাব কাশমালীখাঁ পর্য্যন্ত কোন কোন সম্রাট্ রাজাদের ও নবাবদের এবং তাঁহাদের চাকর লোকদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থান বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে এই হিন্দুস্থান রক্ষার্থ আরোপিত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের

---

* পাশ্চাৎ মহামান্য সুপ্রিম্ কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ৺ রামজয় তর্কালঙ্কা-রের সাহায্যে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া পোষ্যপুত্র মঞ্জুর করাইলেন ও রাজা গৌরবল্লভকে পোষ্যপুত্র লইলেন; তাঁহার পুত্র রাজা রুক্মিণীবল্লভ এখন জীবিত আছেন।

পুষ্পিতত্ব ও ফলিতত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারবরূপ বৃক্ষের আলবালত্বে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গনামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।"

পাঠক দেখিবেন, রাজাবলির ভাষা কোথাও সরল, কোথাও জটিল হইলেও সর্ব্বত্রই তেজঃ এবং ওজঃ পূর্ণ। মৃত্যুঞ্জয় পুরাণ হইতে যেমন সংগ্রহ করিতেছেন, তৈমুর সংহিতা * হইতে সেই রূপই গ্রহণ করিয়াছেন। কোনরূপ ঘৃণা বা পক্ষপাতের ভাব নাই। আবার কোথাও কিম্বদন্তীর উপর কিম্বদন্তী স্তূপীকৃত হইয়াছে। ফলত সে সময়ে যাহা কিছু সংগৃহীত হইতে পারিত, সমস্তই রাজাবলিতে আছে। তাহাতেই বলিতেছি, সংগ্রহ গণনায় এই গ্রন্থ অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত বলিলেও চলে।

প্রবোধচন্দ্রিকাও সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য লিখিত। মৃত্যুঞ্জয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।"

পূর্ব্বোক্তরূপ উদ্দেশ্য থাকাতে প্রবোধচন্দ্রিকায় কয়েকটি বৈচিত্র হইয়াছে;—

১। দুরূহ শব্দ প্রয়োগ। একখানি বা দুইখানি গ্রন্থ পড়াইয়া যখন একটি ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, তখন ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ যে আবশ্যক তাহা গ্রন্থকার মনে করিয়াছিলেন।

২। প্রতিশব্দ প্রয়োগ। উদাহরণ,—

"ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধূলা অঙ্গার পূরিয়া উপরে এক আধ সের ঘি দিয়া দেশে দেশে, শহরে শহরে, অনিয়মিত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়া শুদ্ধ তৌলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া

---

* এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের অনুবাদ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এই নবজীবনেই আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে তাহার পর সেই অনুবাদে আর হস্তার্পণ করেন নাই, ইহা আমাদের একান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে। ন, জী, স,

ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না, বলে যে 'এ হৈযঙ্গবীন, অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতাদের হোমের উপযুক্ত, আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না।' * * * *
"বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন, দুই এক সের আজ্য যদি দিতে, তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই।' * * * * (বিশ্ববঞ্চক) তাদৃশ সর্পিকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল।"

পাঠক দেখিবেন, হৈযঙ্গবীন, আজ্য, হবি ঘৃতের এই তিনটি প্রতিশব্দ বক্তাদের অবস্থোচিত না হইলেও, কেবল ছাত্র শিক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রযুক্ত আছে।

৩। বর্ণনায় বহুতর নাম প্রয়োগ। যেখানে যাতি, যূথী, মল্লিকা, মালতী বলিলেই হয়ত চলিত, সে খানে মৃত্যুঞ্জয়কে বায়ান্ন রকম লতা গুল্মের নাম করিতে হইয়াছে। উদাহরণ—"উজ্জয়িনী পতি মহারাজ কাশ্মীর-ভুবঙ্গমী কথার সমস্ত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া বেলা বসানে উপবনে চলিলেন। উদ্যানে গিয়া যাতি যূথী মালতী মল্লিকা, নব-মল্লিকা, শেফালিকা, সেবন্তিকা, পাটল সেবন্তিকা, পুন্নাগ, নাগকেশরী, সরোজ কুমুদ, কহ্লার, কেতকী, চম্পক, কনক চম্পক, টগর, গন্ধরাজ, বক, করবীরাদি পুষ্পমালঞ্চ শোভাদর্শনে ও ভ্রমরগণ গুঞ্জিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ বায়ু সুখস্পর্শেতে ও মিষ্টালাপামৃত রস ধারাতে পরমাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া স্বস্থানে বিদায় করিয়া স্বয়ং সন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়া করিতে দেবালয়ে গমন করিলেন।"

৪। পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ। গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাকরণ অলঙ্কার বাদশাস্ত্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত আছে, সুতরাং সে সকল ভাগ পরিভাষায় পরিপূর্ণ। কেন যে একপ হইয়াছে, তাহা বার বার না বলিলেও চলে।

৫। অতি সহজের সঙ্গে অতি দুর্ব্বোধ ভাষার একত্র সমাবেশ। গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ—সিবিলিয়ানগণ সকলরূপ ভাষা শিক্ষা করেন।

৬। বালক বালিকাদের শিক্ষার অনুপযোগী ভাব এবং ভাষার সমাবেশ। বিদেশী বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য গ্রন্থলিখিত, তাহাতে সুরুচি কুরুচির কথা

কাজেই উঠে নাই, সাহেবেরা কিসে সকলরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তর্কালঙ্কার কেবল তাহাই দেখিয়াছিলেন।

৭। রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীদের জন্য প্রবোধচন্দ্রিকা লিখিত বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত রাজধর্ম্ম শিক্ষাচ্ছলে, উপদেশ দান।

৮। হিন্দুসমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উপাদান সম্বন্ধে রাজপুরুষগণের অভিজ্ঞতা সম্পাদনার্থ হিন্দু সমাজভুক্ত বিবিধ জাতি ও জাতি সঙ্গত ব্যবসায় আদির পরিচয়।

উপরোক্ত ঐ আটটি বৈচিত্রের উল্লেখে, এবং উদাহরণে পাঠক গ্রন্থের দোষ গুণ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। গ্রন্থের পরিচয় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থার অন্যরূপ সমালোচনার প্রয়োজন দেখি না।

মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গ গদ্য সাহিত্যের একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে, তিনি স্বয়ং ভাষার সকল রূপ গতির সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। নানারূপ রচনা ভঙ্গি প্রবোধচন্দ্রিকায় বিরাজমানা। এক এক স্থানের রচনা ভঙ্গিতে স্তব্ধ হইতে হয়। "শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জনাকর্ণন, বিসঙ্কট বদন ব্যাদন, বিকট দংষ্ট্রাকড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত চট্ চট্ শব্দ, ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত" বাস্তবিকই যেন পাঠককে হইতে হয়। আবার "তরুণী-স্তন-সুন্দর ইন্দীবর কৈরব-কোরক, সুন্দরী-মুখ-মনোহর আন্দোলিত ফুল্লরাজীর নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করিণী তটস্থলে বট বিটপী ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে" যেন সত্য সত্যই আমরা শীতল সমীরণ সঞ্চারে সুস্নিগ্ধ হই। মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গগদ্যের একজন আদিগ্রন্থকার বলিয়া সামান্য নহেন, তাঁহার রচনায় আমরা এখনকার শাখা-প্রশাখা-ময়ী-বঙ্গ ভাষার সকল অঙ্গের অঙ্কুর দেখিতে পাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যঙ্গোক্তিগুলি মধুমক্ষিকার মত মধুময়ী অথচ কণ্টক শূলময়ী। তাহারই একটি উদাহরণ দিয়া আমরা প্রবোধ চন্দ্রিকার পরিচয় শেষ করিব। অনুস্বর বিসর্গ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় বলিতেছেন ;—"এই দুই বর্ণ মকার ও সকার ও রেফরূপ হল-বর্ণ-জন্য হইয়া হল ভিন্ন স্বরধর্ম্মাক্রান্ত হয়। অতএব স্বর এবং হল এই দুয়ের মধ্যে এই দুই বর্ণের গণনা নাই। স্বজাতীয়

ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম আশ্রয় যে করে, তার দশাই এই।" কথাটা অনেক কালের, কিন্তু এখনও পুরাতন হয় নাই।

তৃতীয় গ্রন্থ বত্রিশ সিংহাসন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা হিন্দী হইতে গৃহীত। ইহার আর কোনরূপ সমালোচনা না করিয়া, পরিচয়ার্থ সবিস্তার উদ্ধার করিব।

"অবন্তি নামক নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজাপালন, দুষ্টের দমন, এইরূপ পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরীদেবীর আরাধনা করেন, আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন হে ব্রাহ্মণ বরপ্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল, হে দেবী! আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন, তবে আমাকে অজরামর করুন। ইহা শুনিয়া দেবীসন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এইরূপ বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আসিলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া, ফলভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন, আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক, আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি? রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন, ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন, ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এই প্রযুক্ত, রাণীকে সেই ফল দিলেন, এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাণী প্রধান মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন, এই জন্য সেই ফল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। প্রধান মন্ত্রি এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন, সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল, এই ফল যদি আমি রাজা ভর্তৃহরিকে

দি, তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সেই ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে দিয়াছিলাম, এ গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি কিরূপে হইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদির বিষয় দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি, সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রিও রাণীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয়, সে বেশ্যারও মন্ত্রিতে অনুরাগ নাহি, কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রম মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্ব রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্তৃহরির সন্তান ছিল না। রাজ্য অরাজক হইল, দেশে দিনে দিনে চোর দস্যুর ভয় অতিশয় হইল। অগ্নি নামে বেতাল সে রাজ্য আশ্রয় করিলেন। ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারণ রাজ-লক্ষণ-যুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন, সেই দিবস রাত্রিযোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সেই রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এইরূপ মন্ত্রিগণেরা যখন যাকে আনিয়া রাজা করেন, তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহাতে সে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল; মন্ত্রিগণেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন নাই।

এক দিবস মন্ত্রিগণ চিন্তান্তঃকরণে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্যবেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ রাজ্য অরাজক কেন? মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বন প্রবেশ করিয়াছেন, আমরা রাজ্য রক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি, রাত্রি হইলে অগ্নিবেতাল তাহাকে নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিগণ বিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন, অদ্যপ্রভৃতি আপনি অবন্তীদেশের রাজা হইলেন। আপনার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এইরূপে

শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তীদেশের রাজা হইয়া সমস্তদিবস বজ্যোপযুক্ত সুখভোগ কবিয়া বাত্রিকালে অগ্নিবেতালেব কারণ নানা প্রকার মদ্য, মাংস মৎস্য মোদক, পিষ্টক, পবমান্ন, অন্নব্যঞ্জন, দধি দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, চন্দন, পুষ্পমালা নানা প্রকাব সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহেব মধ্যে রাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপব অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে কবিয়া সেই গৃহেব মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মাবিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে বিনষ্ট কবিতে আসিয়াছেন, অবশ্য নষ্ট কবিবেন, কিন্তু আপনাব নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী কবিযাছি, সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ কবিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট কবিবেন। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিযা সে সামগ্রী ভক্ষণ কবিয়া বাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমাব প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই অবন্তীদেশ তোমাকে দিলাম। পবম সুখে ভোগ কবহ কিন্তু আমাকে প্রত্যহ এইরূপ ভোজন কবাইবা। বাজাকে এইরূপ কহিয়া, স্ব স্থানে গেলেন। বাজা বিক্রমাদিত্য প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন কবিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রি প্রভৃতি বাজাকে দেখিয়া আপন আপন মনে নিশ্চয় কবিলেন, ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন বক্ষা পাইয়াছেন, অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচাব কবিয়া বাজাতে অভিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন আপন কার্য্য কবিতে লাগিলেন। বাজা ভয়-প্রীতিতে মন্ত্রি প্রভৃতিকে আপন আজ্ঞাব অধীন কবিয়া দণ্ডনীতির শাস্ত্রমতে রাজ কর্ম্ম কবেন। প্রত্যহ বাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বেব মত ভোজন কবান। এই উপায় দ্বাবা অগ্নিবেতালকেও বশ কবিলেন।

উদ্ধৃত গল্পেব প্রথমাংশেব সহিত শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পুস্তকেব প্রথমাংশেব উপাখ্যানগত সাদৃশ্য আছে। সেই ভাগেব সহিত এই ভাগের তুলনা কবিলে পঞ্চাশ বৎসরে ভাষাব কত বিভেদ হইয়াছে, এবং মৃত্যুঞ্জয়ী ও সাগবী ভাষায় কিরূপ প্রভেদ আছে, তাহা অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। ঐ রূপ তুলনায় ভাষাব পন্থা ও গতি শিখিতে পারা যায়। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে পথ দেখাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ভাষাব পন্থা ও গতি বিশেষ লক্ষ্য কবা তাঁহাদেব একান্ত আবশ্যক।

৪। মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যতম গ্রন্থ পুরুষপরীক্ষা। এখানি বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থের কোন না কোন অংশ প্রতিবর্ষে প্রবেশিকার পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে, উহা সর্ব্ব পরিচিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পুস্তক সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গগদ্যের লালন পালন ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্যসত্যই ভাষা পিতৃমাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা, ধূল্যর লুণ্ঠিতা, বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মানা, সংস্কৃত পণ্ডিত মণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত "তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা" বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে, এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পীঠে করিয়া 'মানুষ' না করিলে, আজি এই সাগর-তরঙ্গের তেজ ধারিণী, অক্ষয় ভূষণে ভূষিতা, হেম-ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম-ভঙ্গিমা-শালিনী, অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে আমরা বলি,—

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

মৃত্যুঞ্জয়! তোমার চরণ স্মরণ করিয়া বার বার নমস্কার করি।

মূর্খ।

—০০—

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিশ্বনাথ চৌধুরী নিতান্ত ক্ষুদ্র জমীদার নহেন। সুতরাং বেশী বেতনে তাঁহার একজন দেওয়ান আছেন।

দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভৌমিক অতি ধূর্ত্ত। একটা সূত্র পাইলেই তাঁহার উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হয়। আবশ্যক হইলে অতি সুসভ্যভাবে চুরি-ডাকাতি-জালিয়াতি ও নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

বঙ্গচন্দ্র মফস্বলে ছিলেন, তখন মনীববাড়ী ডাকাতি হইযাছে—এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বেশ ফলার জুটিয়াছে—বিশেষত এই সময়ে বিশ্বনাথ বাবুও বাড়ী নাই।

তিনি বাড়ী আসিয়া কৈলাশচন্দ্র কে বলিবেন—"মহাশয় পুলিশে এজাহার না দেওয়া অন্যায় হইয়াছে।" কৈলাশবাবু বলিলেন—"ডাকাতেরা কাহারো কোন ক্ষতি করে নাই, বিশেষ কোন জিনিস নষ্ট করে নাই, বা টাকা কড়ি লয় নাই সুতরাং একটা গণ্ডগোল সুধুসুধি কে করিতে যায়—বিশেষত কর্ত্রীর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অমত ছিল।" বঙ্গচন্দ্র বক্র হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"অইন সঙ্গত কাজ হয় নাই—যাহাহউক এখন একটা এজাহার দিয়া রাখা যাক্।" কৈলাশচন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন—বঙ্গচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "ভাল সুবিধা হইযাছে—এই উপলক্ষে অনেক বিদ্রোহী প্রকৃত শত্রু ও দুষ্ট লোক জব্দ করিতে পারিব"—এই সময়ে কৈলাশ ধূর্ত্ত দেওয়ানের মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার বিকৃত বদন ও কুৎসিৎ চক্ষু থেক্ শিযালের লালসা শঠতা ও হিংসায় প্রতিফলিত—যেন ঠিক্ একটা ধূর্ত্ত শৃগালের মুখ মানুষের শরীরে সংলগ্ন—যেন ঐ মুখ একটা নিরীহ শশক দেখিয়া খাইবার জন্য হা করিয়া আছে আর ঐ মুখের উপর দুইটা কোটর গত চক্ষু

আনন্দে—লোভে—ও হিংসার আবেগে—চক্রাকারে ঘুরিতেছে ; কৈলাসচন্দ্র ঘৃণার ভাবে বলিলেন—"নিজ স্বার্থের জন্য নির্দ্দোষ লোকের প্রতি অত্যাচার কি উচিত ?"

বঙ্গচন্দ্র বলিলেন "সহস্রবার—লর্ডক্লাইব জাল জোচ্চোরি না করিলে কি বাঙ্গালা ইংরেজের হ'ত—ডাল্‌হাউসি—আউটরাম ডাকাতি না করিলে, কি ওয়াজিদ আলীসার রাজ্যপাট যাইত—ইহা অবস্থা বিশেষে করিতেই হয়—হেষ্টিংস্ নিজ স্বার্থের জন্য—অপরের বিবাহিতা পত্নী বলপূর্ব্বক নিজের করিয়াছিলেন—আর মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন—এ সকল বৈষয়িক নীতি—আপনি বুঝিতে পারিবেন না।"

কৈলাসচন্দ্র আর তর্ক না করিয়া বলিলেন—"আপনি তবে কি পরামর্শ স্থির করিয়াছেন ?"

বঙ্গচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"বাড়ীর ও বৈঠকখানার অনেক জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিতে হইবে—খাজাঞ্চির খাতা বদলাইয়া জমার স্থানে পঁচিশ হাজার টাকা করিতে হইবে—লোহার সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে—দুইচারি জন লোক যখম করিয়া রাখিতে হইবে—মারিতে পারিলে আরো ভাল হয—তবেই মোকদ্দমা সঙ্গীন দাঁড়াইবে।"

কৈলাস বাবু বলিলেন, "তা যেন হইল—দোষ কাহাদের প্রতি—আরোপ করা হইবে ?"

"কেন, আমাদের অন্যতর শরীক নীলমাধব বসু ?" "কি ভয়ানক! তিনি যে অতি ভাল লোক !" "তাঁহার প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর হইলে—শত্রুধ্বংশ হইবে,—তাঁর বিষয় ক্রমে আমাদের হইবে—বাবু দ্বিগুণ ধনবান্ ও প্রতাপশালী হইবেন। চাইকি আপনার অদৃষ্টও ফিরিতে পারে।"

বৈজ্ঞানিক বলেন—কোমল, স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতি-পূর্ণ লোকই বিশেষ ভয়ঙ্কর। তুমি 'মার মার' বলিয়া উৎসাহে ও ক্রোধে চীৎকার কর, তিনিও তোমার সঙ্গে 'মার মার' বলিয়া চীৎকার করিবেন—আবার তুমি 'হায় হায়' বলিয়া চীৎকার কর—তিনিও কাঁদিয়া তোমার সঙ্গে 'হায় হায়' করিবেন। ইহারাই সমাজ ও সঙ্গী ভেদে দেব তুল্য কিম্বা পিশাচ তুল্য হইয়া থাকে। "রব্‌সপেরি" রক্তের স্রোতে পড়িয়া রক্ত পিপাসু হইয়াছিলেন—দয়ার ও

উদারতার স্রোতে পড়িলে দেবতা হইতেন। এই চরিত্র বৈষম্যে, এই মানবিক চিত্ত স্রোতেই, নরহন্তাকে অন্তিম জীবনে বাল্মীকির ন্যায় সাধু ও শুদ্ধ চিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং শুদ্ধ চিত্ত পরম হংসকে নরহন্তার শোণিত মগ্ন বেদীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্বাভাবিক—প্রকৃতিতে এ বৈষম্য না থাকিলে, মানবের উত্থান পতন—পতন ও উত্থান কিরূপে হইত? চণ্ডালে ব্রাহ্মণের মহাপ্রাণ, ব্রাহ্মণে চর্ম্মকারের নীচমন কোথা হইতে আসিত?—দরিদ্রে রাজতুল্য উদারতা,—আর ধনকুবেরে বেশ্যা পুত্রের নীচতা কোথা হইতে আসিত?—তাই কৈলাসচন্দ্র, উচ্চশিক্ষা থাকিলেও, মানসিক স্রোতের বিপরীত গমনে অক্ষম হইলেন। মনে মনে বঙ্গচন্দ্রের ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন এবং অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহার মতে মত দিলেন। * * *

গোপনে ষড়যন্ত্র হইল। তদনুযায়ি কার্য্য হইল—দুই জন দ্বারবান অর্থ লোভে স্বেচ্ছা যখম হইল এবং যথা রীতি পুলিশে এজাহার দেওয়া হইলে—মকদ্দমার তদারক চলিতে লাগিল।

কিন্তু এই গুরুতব ব্যাপারে হাত দিয়া বঙ্গচন্দ্র আব একটী বিষম সমস্যায় উপনীত হইলেন। হরানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন প্রাচীন নায়েব আছেন; লোকে তাঁহাকে সত্য এবং সাধুতার জীতন্ত মুর্ত্তি বলিয়া জানে। তিনি কখনও মিথ্যা কহেন না—সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাইলেও কহিবেন না—হয়ত এই ব্যক্তিদ্বারা বঙ্গচন্দ্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে—তাই তিনি মনে মনে স্থিব করিয়াছেন, মফস্বলের কাছারি বাড়ীটি জ্বালাইয়া দিয়া হরানন্দকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারিলে, সকল বিঘ্ন ঘুচিয়া যায়, বিশেষত মকদ্দমাটি আবও দৃঢ় হয়—কেন না যাহাদের কাছারি, তাহারা পোড়াইয়াছে এবং যাহাদের নায়েব, তাহারাই বধ করিয়াছে—এ কথা কিছু সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক বঙ্গচন্দ্র এ কল্পনা একেবারে গোপনে রাখিলেন।

বিংশতি অধ্যায়।

অন্ধকার রজনী, বারটা বাজিয়া গিয়াছে। হরানন্দের কাছারি বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবল দুই একজন পাইক বরকন্দাজ তামাকু এবং গাঁজা সেবন করিতে করিতে বাহিরের আটচালা ঘরে খক্ খক্ করিয়া কাসিতেছে। ছোট

আট চালার পশ্চাতে তিন খানি ছোট ছোট চালা ঘর। নায়েব হরানন্দ সপরিবারে ঐ ঘরে বাস করেন। পরিবারের মধ্যে একটী বিধবা কন্যা ও স্ত্রী। কন্যা অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে বলিয়া হরানন্দ ও তাঁহার স্ত্রীও শোক গ্রস্ত। সুতরাং সকলেই একবেলা কেবল আতপ তণ্ডুল ও নিরামিষ ভোজন করেন। রজনীতে কেবল ফলমূল ও দুগ্ধ সেবন করিয়া নিদ্রা যান।

কন্যা-পত্নী একশয্যায় শয়ন করিয়াছেন—তাঁহারা নিদ্রিতা। আর এক শয্যায় বসিয়া স্বয়ং হরানন্দ মালা জপ করিতেছেন। একটী বাতি অতি স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। হরানন্দের কেশ তিনভাগ শ্বেতবর্ণ; গোঁফ ও লম্বিত দাড়িও তদবস্থাপন্ন—তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল, বদন স্নিগ্ধ ও হাস্য পূর্ণ—শরীর ক্ষীণ, দেহ সুদীর্ঘ ও বর্ণ গৌর। সহসা তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হয়। অত্যাচার ও অবিচারে বিশ্বনাথ বাবুর প্রায় সমস্ত প্রজাই অবাধ্য, কেবল হরানন্দের শাসনাধীন মহাল গুলি ভাল। প্রজাগণ হরানন্দের গুণে বাধ্য এবং যথারীতি খাজনা দিতেও কুণ্ঠিত নহে। সুতরাং হরানন্দ নিশ্চিন্ত এবং তাঁহার কাছারি বাড়ী শান্তিময়।

সহসা গভীর রজনীতে এই শান্তি আজ ভঙ্গ হইল। মশালের আলো দেখিয়া ও লোক-রব শুনিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন——আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, বড় বড় লাঠি লইয়া দস্যুগণ উপস্থিত। দস্যুদের কেহ মশালের আগুণ ঘরে লাগাইয়া দিতেছে—কেহ কেহ বা দর্শক গণকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। অন্ধকারে কে দস্যু, কে সাধু, চিনিবার সাধ্য নাই। এদিকে হু হু করিয়া গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল—রজনী দিবা হইল; সেই আলোতে হরানন্দকে দেখিতে পাইয়া এক যোগে কতকগুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিল "নায়েব মশাই পালান! পালান!" এরূপ না করিলে হয়ত হরানন্দকে দস্যুরা সহজে পাইত না। অমনি চারি পাঁচ জন লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া হস্ত পদ বন্ধন করিতে লাগিল। যাহারা দস্যু নহে, তাহারা প্রাণপণে তাঁহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুদের শিক্ষিত হস্ত ও কৌশলের কাছে কেহই অগ্রসর হইতে পারিল না—কাহারও মাথা ভাঙ্গিল, কাহারও হাত পা ভাঙ্গিল—চারি দিক হইতে 'হায়! হায়! মার! মার!—ও পুড়েগেল' —এই বিকট ধ্বনি উঠিল।

হবানন্দ স্ত্রী কন্যাব জন্য চিন্তিত হইয়া অনুনয় কবিয়া বলিলেন "আমার স্ত্রী কন্যা পুড়ে মবিল, অন্তত তাদেব বক্ষা কব"—এই কথা শুনিয়া বিকট হাস্য কবিয়া একজন দস্যু তাঁহাব মস্তকে দারুণ প্রহাব কবিল। তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে আব একজন "বাম দা" বাহিব করিয়া বলিল, "শালাকে এই খানেই কাটি"। দা, উচ্চে উঠিয়া আলোকে ঝলসিল—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ"! বলিয়া একটা মহাধ্বনি উঠিল।

এই সময়ে প্রবল স্রোতেব ন্যায় একদল বিকটাকাব মুখস্-ধাবী লোক "মাব মাব" শব্দে প্রবেশ কবিল। দলপতি "বাম দা" ধাবীকে গম্ভীব শব্দে বলিল "নবহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—কবিস না"। সে সবিয়া দাঁড়াইল। দলপতিব তীব্র আদেশে দস্যুগণই হবানন্দের বন্ধন মোচন কবিযা সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। দলপতি পুনবায় কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসিল "কোন নবাধম ব্রাহ্মণেব মাথায় লাঠি মাবিযাছে?"—দস্যুদের একজন তাঁহাব পা ধবিয়া বলিল "রক্ষা করুন, আমি"। দলপতি তাহাকে ক্রোধে পদাঘাত কবিয়া বলিল "নবহত্যাব জন্য যে পযসা খায়, আমাব হাতে তাহাব নিস্তাব নাই, সাবধান এখনি পলাও, আর এরূপ কাজ কবিও না।"

দস্যুদল তিবোহিত হইলে দর্শকগণ ক্রমে নিকট হইল। সকলেই হবানন্দকে দেখিবাব জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইল। হবানন্দ একটু চৈতন্য পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাব কন্যা? আমাব স্ত্রী?" এক জন দর্শক হবানন্দকে বিষম আঘাতিত দেখিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিল "গবীবেব বন্ধু দুঃখীব বাপ, প্রজা লোকেব দেবতা, তুমি ভাল হও, আল্লা তোমায় বক্ষা কবন—ভাবনা নাই, তোমাব স্ত্রী কন্যা আমাব বাড়ীতে আছেন।"

মুখস্-ধাবী দলপতি তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল "তুমি সাধু তোমারই হাতে ইহার জীবন বহিল। তোমার বাড়ী লয়ে যাও, শুশ্রূষা কর, পুবস্কাব পাইবে।" সকলেই নিস্তব্ধ নির্ব্বাক ও বিস্মিত হইয়া এ উহাব মুখপানে চাহিল। দলপতি দলসহ তীববেগে অদৃশ্য হইল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই দলপতি বামা চণ্ডালেব নিবপরাধ জামাতাকে উদ্ধার করিয়াছিল।

মুখস্-ধারীদল অন্তর্হিত হইলে নিরক্ষর দর্শকগণ ভাবিল, উহারা দেবতা. হরানন্দ ধার্ম্মিক, তাই রক্ষা করিতে আসিয়াছিল।

*   *   *   *   *

পর দিন প্রাতঃকালে কৈলাস বাবু বিস্মিত হইয়া বঙ্গচন্দ্রকে কহিলেন—"সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ডাকাতেরা আবার মফস্বলের কাছারি পোড়াইয়া দিয়াছে; শুধু তাই নয়, নায়েবকেও খুন করিয়া গিয়াছে! উপায়?"—

বঙ্গচন্দ্রের মুখের চর্ম্ম একটুও কুঞ্চিত হইল না—কিছুই বিস্মিত হইলেন না—একটু হাসিয়া বলিলেন "ডাকাতেরা আমাদের উপকার করিয়াছে, তবে নিরীহ নায়েবের জন্য দুঃখ হয়, তা তাতেও আমাদের উপকার বই অপকার হয় নাই, মোকদ্দমার গোড়া আরো শক্ত হইবে।"

ভাড়াটে দস্যুরা দস্যুতার পর গা ঢাকা দেয়—ব্যাপারের আগেই টাকাটা হাত করে—সুতরাং তাহাদের নিজমুখে আর কিছুই শুনিবার উপায় থাকে না। ফল আপনি প্রকাশ পায়। কাছারি পুড়িয়াছে, আর নায়েব সপরিবারে অদৃশ্য, তাই জনরব এই যে কাছারি পুড়াইয়া, নায়েবকে খুন করিয়া, ডাকাতেরা যথা সর্ব্বস্ব লুঠপাঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কৈলাসচন্দ্র একথা শুনিয়া চিন্তিত ও চমকিত হইয়াছেন। বঙ্গচন্দ্রও শুনিয়া নিজ কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "তবে কি-এসংবাদ আপনি আরো পূর্ব্বে শুনিয়াছেন?"

"শুনিয়াছি বৈকি।"

"উপায়?"

"পুলিষে আর একটা এজাহার দিয়াছি।"

"খুনের কথা এজাহার দিয়াছেন?"

"দিয়াছি।"

মাষ্টার মাধবচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন; একটু হাসিয়া কৈলাশ বাবুকে রহস্যের স্বরে বলিলেন—"You are a sufficiently ample spectacle of contemplation to each other"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন "কেন?"

মাধব বঙ্গচন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গাল্ভির স্বরে বলিলেন—

"Through hatred of the gods, the parent Earth
Produced this last and worst Titanian birth."

বঙ্গচন্দ্রের মুখ রক্তিম হইল, ক্রোধে তাহার ক্ষুদ্র দেহ কাঁপিতে লাগিল। বিকৃত স্বরে বলিলেন—"কি বলিলেন, মাধব বাবু?"—

মাধব সেইরূপ তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"You are a pack of blood hounds—thieves and murderers !!!"

কৈলাস বিস্মিত হইলেন—ভাবিয়াছিলেন বঙ্গচন্দ্র এবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া মাধবের সঙ্গে হাতা হাতি করিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য মাধব নীরব হইলে, তিনি কেবল মৃদুস্বরে এই মাত্র বলিলেন—

"জমীদারের আমলা যখন, তখন চোর ও বদমাইস কাজে কাজেই।" মাধব যেন স্বর্গে উঠিলেন—বঙ্গচন্দ্র রসাতলে—তখন রসাতলস্থ সেই ক্ষুদ্র জীবের প্রতি স্বর্গীয় দেবতা গম্ভীর নিনাদে বলিলেন—"আর নরহত্যার ষড়যন্ত্র করিও না।"

বঙ্গচন্দ্র কিছু না বলিয়া মাধবের মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন। কৈলাসচন্দ্র মনে করিলেন, মাধবকে নিতান্ত পাগল মনে করিয়া বঙ্গচন্দ্র ঘৃণাভাবে হাসিতেছেন, সুতরাং তিনিও হাসিলেন, কিন্তু মাধব হাসিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ইহার অর্থ "ষড় যন্ত্র সুসিদ্ধ হইযাছে।" এখন সুসিদ্ধ যে হয় নাই, সেইটি বুঝাইয়া দেওয়া চাই—তাই বলিলেন "The poor bird has flown" ষড় যন্ত্র বৃথা হয়েছে।"

কৈলাস কিচুই বুঝিলেন না—কিন্তু চতুর বঙ্গচন্দ্র বুঝিলেন—মাধব ষড়যন্ত্র টের পাইয়াছে। ইহাও বুঝিলেন হরানন্দ মরে নাই। হঠাৎ এই কথায় যেন তাহার মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি আত্ম গোপন করিতে পারিলেন না, ভীত হইলেন, তাঁহার বদন বিবর্ণ ও বিকৃত হইল। ভগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—যেন এই ভাবে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হরানন্দের মৃত্যু মিথ্যা হইলে, তিনি সে কথা এজাহারে লিখাইয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছেন—"মাধব বাবু পাগলামি করিবেন না, জানেন ত ঠিক করিয়া বলেন, হরানন্দকে মারিয়াছে কি না?"—

মাধব তাহার মনের ভাব মুখে ও কথায় পড়িয়া ব্যঙ্গস্বরে উচ্চ হাসিয়া বলিলেন—

" Heri vidi fragilem frangi, hodi vidi mortalem mori "*—হাঃ হাঃ হাঃ—

বঙ্গচন্দ্র সহিষ্ণুতা ভ্রষ্ট হইয়া কোপন স্বরে বলিলেন—"বিশ্বনাথবাবু দুধ দে সাপ পুষিতেছেন—আপনি সাপ। আপনি বাচালতা করিতেছেন—কার কাজের তরে আপনাকে একটি সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি জানেন, না? আপনি সাপ, তা হতেও—"

মাধব সেই ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—অতি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন ' তা হতেও—তা হতেও কি বঙ্গবাবু?—"You mean a dragon—No I am not a dragon—if I am serpent a serpent cannot become a dragon, unless it devours another serpent—But Ihave not yet devoured you"

বঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে সর্প দংশনের বেদনা হইল, আর থাকিতে পারিলেন না—ভাবিলেন হবানন্দকে বিপক্ষে হাত করিলে সর্ব্বনাশ হইবে, বিশেষ হবানন্দ সকলই বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদের উপর আর তাহার বিশ্বাস নাই; এখন কোন উপায়ে তাহাকে পরিবার সহ কিছু দিনের জন্য স্থানান্তর করা চাই—মুখে বলিলেন "তবে একজাহাবটা বদলাইয়া দিবার চেষ্টা হইতে পারে কি না দেখা যাক '—এই বলিয়া উঠিয়া চলিলেন। তাহার কিছু পরে মাধব মাষ্টারও প্রস্থান করিলেন। কৈলাস শ্বাস ছাড়িয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

আজ শ্যামা সুন্দরীর শাশুড়ী—অর্থাৎ বিশু বাবুর মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ। উপযুক্ত আয়োজন হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছেন। অনেকের

*(Epictitus) এপিক্‌তিতস—একদিন বেড়াইতে যাইয়া পথে দেখিতে পান একবৃদ্ধা একটী মৃণ্ময় জলের ভাঁড় ভাঙ্গিয়া কান্দিতেছে—পর দিন আবার সেই পথে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, সেই বৃদ্ধা তাহার মৃত পুত্র কোলে করিয়া রোদন করিতেছে। তাই বলিয়াছিলেন—"কাল দেখিয়াছি ভাঁড় ভাঙ্গিয়াছে, আজ দেখিলাম মড়া মরিয়াছে"—অর্থাৎ ইহার পরেও আরো শোক ও বিপদ অদৃষ্টে থাকিতে পারে।

একটা প্রধান দোষ, অনেক সময় অনায়ত্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অর্থের ও অভিমানের পরিচয় দিয়া থাকেন। অনেক সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক বড় মানুষ না হইলে, আর তাহাদের প্রতি অযত্নের সীমা থাকে না, আপনি পাতে জল না লইয়া বসিলে, কেহ জিজ্ঞাসা করে না। আর যাঁর বাড়ীর কাজ, তিনি বড় মানুষ হইলে গরীবদের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না, মনে করেন সুখ সেব্য আহার, ইহার উপর কি বিনয় অনুনয় করিব? শুধু তাই নয়, যেখানে দাঁড়াইলে ঘৃণা হয়, তেমন কুৎসিত স্থানে বসিয়াও নিমন্ত্রিত গণকে খাইতে হয়। দশজন ভদ্রলোককে যে সম্মান রক্ষা করিয়া ভদ্রতার সহিত খাওয়াইতে পারে না, সে যে শত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান করে ও শারীরিক যন্ত্রণা দেয়, বাঙ্গালীর সমাজ ইহা চাহিয়া দেখে না। আমাদের শত কলঙ্কের মধ্যে এটি একটি মহা কলঙ্ক। এই দোষে ভোজনে বসিয়াও আজ ব্রাহ্মণগণ বিশুবাবুর মাতার শ্রাদ্ধে খাইতে পাইলেন না। দালানের বারান্দায় যাহাদের স্থান হইয়াছিল, দ্বিতল হইতে কাহার মল মূত্র তাহার মধ্যে একজনের মাথায় পড়ে —তাই 'ছি—ছি'—করিয়া সকলে উঠিয়া গেলেন। গরীবের বাড়ী হইলে অন্তত গৃহস্বামী দুঃখিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিতেন, কিন্তু বড়লোকের বাড়ী বলিয়া তাহা হইল না। একটী ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"প্রাতঃস্মরণীয়া ও সতী সাধ্বী যিনি, তাহার শ্রাদ্ধে এ বিঘ্ন কেন হইল"--আর একটী ব্রাহ্মণ তখনই উত্তর দিল, "ভুতোর মার যথা সর্ব্বস্ব যে রাক্ষসী অনায়াসে গ্রাস করিয়াছিল--সে প্রাতঃস্মরণীয়া নয় ত আর কে!—বেশ হইয়াছে, অমন পাপিনীর শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে কেন, কুকুর ভোজন হউক।"—এ কথা শ্যামাসুন্দরীর কাণে গেল, তিনি বুঝিলেন পাপিনীর মরিলেও নিষ্কৃতি নাই, তাহার শরীর ক্ষণেকের জন্য ভয়ে রোমাঞ্চিত হইল।

* * * * *

অন্তঃপুরে ব্রাহ্মণ রমণীগণ ভোজ করিতে বসিয়াছেন—শ্যামাসুন্দরী অভ্যাস না থাকিলেও তাদের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, কেন না তাহা করিবার বিশেষ কারণছিল। সকলের আহার হইলে শ্যামা নিজে সকলকে পানের খিলি দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন—সর্ব্বশেষে বংশীধর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর হাতে পান দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমার সহিত অনেক কথা আছে বাড়ী না যাইব।

হাসিয়া বলিলেন—"তোমার সহিত অনেক কথা আছে; বাড়ী না যাইয়া উপরে গিয়া বস; আমি হাতের কাজ সারিয়া আসিতেছি।" বংশীর স্ত্রী তাহাই করিলেন।

এ দিককার সকল কাজ নির্ব্বাহ হইলে শ্যামা উপরে যাইয়া বংশীর স্ত্রীর নিকট বসিলেন।

বংশীর স্ত্রী বলিল "কি বলিবে বল?" শ্যামা হাসিয়া তাহার অঙ্গুরী ধরিয়া বলিল, "এ আংটি কোথা পেলে?" এ প্রশ্নে বংশীর স্ত্রী কিছু বিপদ গ্রস্ত হইল। কেন না স্বামীর চরিত্রের উপর তাহার নিজের ভাল সংস্কার নাই; যদি 'স্বামী দিয়াছেন' এ কথা বলে তবে স্বামীর অনিষ্ট হইতে পারে—আর স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য আর কাহারো নাম করিলে, নিজের চরিত্রে দোষ স্পর্শ; সুতরাং মৌনভাবে রহিল।

শ্যামা বলিলেন—"এ আংটীর মূল্য এক শত, দেড় শত টাকা—দেখ ইহাতে কত বড় হীরা—এ আংটী সামান্য লোকে দিতে পারে না। এ আংটী আমার স্বামীর, যদি তিনি স্বয়ং ইহা তোমায় দিয়া থাকেন, তবে হয়ত তিনি তোমায় আমা চেয়ে শত গুণ অধিক ভালবাসেন—কেন না কতবার চাহিয়াছি—এ আংটী তিনি আমায় দেন নাই।" এই বলিয়া শ্যামা বংশী-ধরের স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। বংশীর স্ত্রী ভয় ও লজ্জায় অনেক ক্ষণ কাঁদিল—পরে সাহস সহকারে বলিল—"এ আংটী স্বামী দিয়াছেন।" এরূপ উত্তরে শ্যামা কিছু নৈরাশ—অথচ কিছু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"তিনি কোথা পেলেন?"

"জানি না।"

"কিছু বলেন নাই?"

"না।"

"তিনি চুরি করিয়াছেন।"

"তিনিই জানেন।"

"যদি জেলে দি?"

"চুরি করিলে, জেল ত আছেই।"

শ্যামাসুন্দরী আবার হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন "ভয় নাই ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিব না।—তৎপর কলম কাগজ দিয়া কহিলেন "তোমার যাহা খুসি স্পষ্ট করিয়া লেখ দেখি ?"

লেখা ভাল নহে, তথাপি বংশীর স্ত্রী অনেক চেষ্টায় "কাকের ঠ্যাং, বকের ডিম্‌" লিখিলে—শ্যামা বাক্স খুলিয়া একটু করা কাগজের লেখার সহিত মিলাইয়া আপনা আপনি বলিলেন "কি ইন্দ্রজাল!'

পাঠক হয়ত বুঝিয়াছেন—কোন্ লেখার সহিত বংশীর স্ত্রীর লেখা শ্যামা মিলাইতে বসিয়াছেন। যে দুই খানি কাগজ তিনি কৈলাশ বাবুর বাক্স হইতে চুরি করিয়াছিলেন, ইহা তাই।

কিছু কাল উভয়ে নীরবে রহিলেন—একজন ভাবিলেন—"যা ভাবিয়া ছিলাম, তাত নয়।" আর একজন ভাবিলেন—"ভগবান রক্ষা কর।" এই ভাবে কিছু কাল গেল। পরে শ্যামা একখানি কাগজ বংশীর স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন—"এ লেখা কার চিনিতে পার ?" লেখা দেখিয়া অপরা তখনি বলিল—"বেশ চিনি, এ লেখা ভুতোর মার।" শ্যামা সুন্দরী বিস্মিত—অতি বিস্মিত বলিলেন "ভুতোর মা কি তবে যথার্থই অসতী—কি আশ্চর্য্য।"

বাঙ্গালী মেয়ে অপর স্ত্রীলোকের নিন্দার সূত্র পাইলে-শতমুখ হইয়া বসে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক—কল্পনা বলে যত দোষ হইতে পারে কাহারো প্রতি আরোপ করিতে কুণ্ঠিত নহে। এখন বংশীধরের স্ত্রীর বিষম উৎসাহ হইল—কাসিয়া কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল—"ভুতোর মার স্বভাব মন্দ—আগেত চাঁড়ালের সঙ্গেই * * * * বোধ হয় এখনও থাকিতে পারে—তার পরত প্রমাণই হলো—এই চিঠি তার। আমার স্বামীর কাছে শুনিয়াছি, কৈলাশ বাবুর সহিত তার ভালবাসা হয়েছে। তা বড় আশ্চর্য্য নয়—আমার স্বামীকেও মাগী বড় ভাল বাসে—তার মেয়ের ব্যারামের সময় প্রায় আমাদের বাড়ী আসিত—আর আমার স্বামীও একটী পয়সা না নিয়ে প্রায় ২।৩ মাস তার চিকিৎসা করেন—আমার বোধ হয় কৈলাস বাবু এই আংটী ভুতোর মাকে দেন—আর সে মাগী হয়ত আমার স্বামীকে দিয়া থাকিবে।"

চতুরা শ্যামা একটু হাসিলেন ; হাসিয়া বলিলেন—"তা যাই হোক, আসল ব্যাপার খানা কি—আমি যেমন করে পারি জান্‌ব।"

বংশীর স্ত্রী উৎসাহ পাইয়া আবার বলিতে লাগিল—"ভুতোর মা ভয়ঙ্কর লোক, ঐ যে রামার মেয়েটা—তাকেও নাকি নষ্ট করেছে—রোজ রাতে তার কাছে নাকি কে আসে—তা ছুঁড়িটার স্বামীও জানে, কিছু বলে না। আর নাকি সেই লোকটা ভূতোর মাকে আজ কাল অনেক টাকা কড়ি দেয়।"

এই শেষ কথাটা শ্যামাসুন্দরী কিছু সম্ভব মনে করিলেন—তাঁহার বিশ্বাস হইল—ঐ লোকটা আর কেহ নয়—কৈলাস। ভুতোর মা সুখীর সহিত এই ব্যাপার ঘটাইয়া দিয়াছে। শ্যামার শরীরে কাল কুটে দংশন করিতে লাগিল, শ্যামা ভ্রূকুটী করিয়া ও মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিকৃত স্বরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"আচ্ছা, দেখ্‌ব দেখ্‌ব—এই হাতে— —এই হাতে——"

বংশীর স্ত্রী ভীত হইয়া দাঁড়াইল ; তাহা দেখিয়া শ্যামার চৈতন্য হইল। বলিলেন "কি যাবে এখন?"—ব্রাহ্মণী অঙ্গুলী হইতে আংটী খুলিয়া বিছানায় রাখিয়া তাড়া তাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল "আংটী রহিল,"—শ্যামা দুই বার ডাকিলেন—কিন্তু সে ফিরিল না। শ্যামা মনে মনে বলিল,—"আজ নয় কাল চোর ধরিব"।

—— ০ ——

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

রজনীর যথা সময়ে শ্যামা কৈলাসে সন্দর্শন হইল। শ্যামা যাহা যাহা শুনিয়া ছিলেন, সকলই কৈলাসের কাছে গোপন করিলেন—যেন তিনি কিছুই জানেন না। কেন না আজ একটী গুরুতর পরামর্শ কৈলাসের সঙ্গে করিতে হইবে। শ্যামা সুন্দরী অনেক কথার পর বলিলেন—"মাধব কিরূপ লোক চিনিতে পারিয়াছ?"

"পাগল।"

"তুমি পাগল—মাধব ভয়ঙ্কর লোক।"

"কিরূপে।"

"প্রজা বিদ্রোহ সেই ঘটাইয়াছে।"

"অসম্ভব।"

"অসম্ভব?—সকল প্রজা তারি হাতে।"

"তাকে তাড়িয়ে দিলেই হয়?"

"কিরূপে তাড়াবে?"

"জবাব দিলেই যায়।"

"তুমি কি মনে কর, দশ টাকার ভরসায় সে আছে?"

"তা নয় ত কি?"

"নির্ব্বোধ—সে ইচ্ছা করিলে, তোমার ও আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে——বিষয় আশয়ে গোল লাগাইয়া নিলামে বেচিতে পারে—দেওয়ান মুচ্ছুদ্দিকে জেলে দিতে পারে"—

কৈলাস ভীত ও বিস্মিত হইয়া শ্যামার মুখপানে চাহিলেন—শ্যামা আবার বলিতে লাগিলেন——"সে দিন কার ডাকাতের দল পতি কে?—হরানন্দকে কে রক্ষা করিয়াছিল?—বঙ্গচন্দ্রকে কে দস্যু হস্তে একবার বাঁচাইয়াছিল? সে দস্যুই বা কারা?—বংশীর পৃষ্ঠে কে লাঠি মারিয়াছিল?—তোমার আমার সকল কথা ত্রিকালজ্ঞের মত কে টের পায়? দেখ দেখি! একবার ভাবিয়া দেখ—এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুকে কি সহজে কেহ তাড়াইতে পারে?"

কৈলাশ ভয়ে চক্ষু মুদিলেন—এবারে সেই পাগল মাধবের মূর্ত্তি ভাবিলেন। সে মূর্ত্তির মস্তক গগনে ঠেকিয়াছে—পদ দ্বয়ের ভারে বসুন্ধরা টলমল করিতেছে। কৈলাস চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—

"তবে আর কে তাড়ায়?"

"তাড়ান অসাধ্য।"

"কৌশল?"

"কৌশল ব্যর্থ হইবে।"

"তবে অনুগ্রহ প্রার্থনা।"

শ্যামার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইল—তিনি অট্টহাস্যে দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"বাঘের অনুগ্রহ চাহিবে—যখন খুসি, তখনই রক্ত পান করিবে?"

"তবে কে এমন সুহৃদ হইবে, যে এই শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।"

"ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের সুহৃদ নাই।"

কৈলাস ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন—"পলাইব, আর এখানে আসিব না।"

শ্যামা বলিলেন "বিমর্ষ হইয়া কি ভাবিতেছ?" কৈলাশ বলিলেন—

"তবে না পলাইলে নিস্তার নাই।"

"তুমিত পলাইবে—আমার স্থান কোথা?"

"আমি যেখানে যাই।"

"পাগল—পলাইলেও এ শত্রুর হাতে নিস্তার নাই।"

"মাধব অর্থ লোভী, প্রচুর অর্থ দিয়া হাত কর।"

"অর্থ তার কাছে ধূলি-কণা!"

"তবে এরূপ করে কেন?"

শ্যামা সুন্দরীর স্বর ভঙ্গ হইল; কিছু কাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"এরূপাকরে কেন?—তার উদ্দেশ্য প্রজার উপর অত্যাচার নিবারণ—বঙ্গচন্দ্রের সর্ব্বনাশ সাধন,—তোমার সর্ব্বনাশ সাধন—তোমার দাদাকে বিপদ গ্রস্ত করিয়া—পরে উপকার করিয়া—তাহাকে বিশ্বাস দেখান,—বিশ্বাস পাইলে—সর্ব্ব ক্ষমতা নিজ হাতে নেওয়া। ক্ষমতা হইলে, আর যত ক্ষুদ্র শত্রু আছে দূর করিয়া দেওয়া—তার পর নিষ্কণ্টকে"———আর শ্যামা কিছু বলিতে পারিলেন না—কথা স্খলিত ও চঞ্চল হইল, চুপ করিলেন ও হাসিলেন—দুই গণ্ড লাল হইয়া উঠিল।

কৈলাশ বলিলেন "তার পর নিষ্কণ্টকে কি?"—

"নিষ্কণ্টকে আমার উপপতি হইবে"—

এই কথা অতি ক্রোধে শ্যামা বলিলেন।

"মাধবের মনের কথা কিরূপে জানিলে?"

"সে অনেক কথা?"

"বল শুনি।"

শ্যামা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন———"মাধবের বাড়ী আমার পিত্রালয়ে। মাধব অতি পণ্ডিত। বাবা আমাকে পড়াইতে উহাকে বলেন—তাই আমি পড়িতাম। মাধব আমাকে কত ভাল বাসিত—এত ভাল বাসা বোধহয় মানুষে মানুষকে বাসিতে পারে না। মাধব পলকের জন্য আমায় চক্ষুর অন্তরাল করে নাই।—আমি হাসিলে, হাসিত—আমি বেজার হইয়া থাকিলে, কাঁদিত।—আমি প্রথম বুঝিতাম না—বয়স হইলে বুঝিতাম—আমি মাধবের আরাধ্য দেবতা—মাধব যথার্থই আমায় ফুল দলে পূজা করিত। আমি বড় অনাবিষ্ট ছিলাম, কত বার আগুনে মাধবের হাত পা পোড়াইয়া দিয়াছি—মাধব সুখে হাসিয়াছে। আমার ওলাউঠা হইলে, মাধব একাসনে আমার কাছে তের দিন বসিয়াছিল ও নীরবে কান্দিয়াছিল—সেই তের দিনের মধ্যে দুই দিন ভাত খাইয়াছিল—আর এগার দিন আমার উচ্ছিষ্ট পথ্য-খাইয়াছিল। আমি ভাবিতাম, আমি মরিলে মাধব মরিবে—মাধবও তাই বলিত। আমি মামার বাড়ী গিয়াছিলাম, মাধব আমার সঙ্গে গিয়াছিল—তা না হ'লে সে থাকিতে পারিত না। রাত্রে আমি ঘুমাইলে, মাধব মার কাছে বসিয়া গল্প করিত, আর আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। এরূপ সারা রাত গিয়াছে—আমার পায়ে একটা ঘা হইয়া কোন ঔষধে ভাল হয় নাই, অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম—সে রোজ ঔষধ দিয়া আমার পা ধোয়াইত—ও ৭ ক্রোশ দূর একটা ডাক্তার খানায় স্বয়ং গিয়া রোজ ঔষধ আনিত। সে পথে নৌকা বা পাল্‌কী চলে না—কোথাও জল, কোথাও বা ডাঙ্গা ও কাদা। মাধব শীতের দিনে জল সাঁতরাইয়া রাত্রে ঔষধ আনিত। আমাকে ভাল বাসে—আমি বড় হইলে (১৫ বৎসর কালে আমার বিবাহ হয়)—উহা অবৈধ ভাল বাসা মনে করিয়া বাবা মাধবকে অন্তত বিশ দিন চারিজন চাকরকে হুকুম দিয়া মারিয়াছেন—এক এক দিন এমন মারিয়াছেন, যে তার নাক মুখ ও কাণ দিয়া রক্ত পড়িয়াছে, শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। মাধব বলবান; চাই কি বাবাকে শুদ্ধ সকল লোক জন মারিয়া যাইতে পারিত, তবু কিছু বলিত না—আশ্চর্য্য সে মৃদু ভাবে তাহা সহিত—আবার এক ঘণ্টা পরেই আমার কাছে আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত—আমি অন্যমনস্ক থাকিলে, কাঁদিত। শেষে মারিয়া মারিয়া বাবার দুঃখ হইয়াছিল, আর কিছু

বলিতেন না। আমি যদি বলিতাম, 'মাধব আমার পানে অমন করে এক ভাবে এক দৃষ্টে থাক কেন?'—মাধব কাঁদিয়া বলিত—হৃদয়ে হাত দিয়া বলিত—"শ্যামা এক অনুপল তোমায় না দেখিলে, এই স্থান জ্বলিয়া উঠে—তাই প্রাণ ভরে তোমায় দেখি।" মাধবের কত বার ভাল চাকরী হইল—মাধব গেল না। আমার সম্বন্ধ হলো—আমি বলিলাম, "মাধব এখন কি হইবে?"—মাধব বলিল "তোমার স্বামীর ভৃত্য হইব—তবু তোমা ছাড়া হ'তে পারিব না।" বিবাহ হলো, মাধবের সকল আশা নির্ম্মূল হলো—তবু মাধব আমায় বলিল—"শ্যামা তুমি সতী হ'য়ো—আমায় ভুলে যেও—আমায় ঘৃণা করো—আমি তথাপি তোমাকে দেখিব—তোমার কাছে থাকিব—মনে করিব সতীর পূজা করিতেছি, সতীর ধ্যান করিতেছি, নয়ন ভরিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য সমষ্টি দেখিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অপূর্ব্ব শক্তি নিরীক্ষণ করিতেছি—শ্যামা তুমি ভাল বাসিবে বলে, আমি ভাল বাসি না। আমি ভাল বাসিব, ভাল বাসা আমার ধর্ম্ম—ভাল বাসা আমার কর্ম্ম—তুমি সেই ভাল বাসার আধার; তুমি আমার ব্রহ্মাণ্ডময়ী, আমি তোমায় ভাল বাসিব মাত্র। এ ভাল বাসায় পাপ আনিবে না; উচ্চ হইতে নীচে স্বর্গ নামাইয়া আনিবে"—মাধবের এ সকল কথার অর্থ আমি আগে বুঝিতে পারিতাম না—এখন বুঝিতে পারি। মাধব যথার্থই আমার জন্য পৃথিবীর সকল সুখ ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশে এখানে আসিল, আজিও সেই উদাসীন। আগে সতী ছিলাম, মাধব আমায় চায় নাই, আমার পূজা করিয়াছে, দেখিয়াই বিভোল হইয়াছে। এখন গ্রহফলে, আমি অসতী, সে পূজার বদলে এখন আমার মৃণ্ময় শরীরের—অশ্রদ্ধিত শরীরের—আরো অশ্রদ্ধা করিতে চায়। যখন আমি মাধবের হইতে চাহিয়া ছিলাম, তখন মাধব বলিত—"সতীর অবমাননা আমা হ'তে হবে না, আমি দেখিয়াই সুখে থাকিব।" এখন আমি পবিত্র মাধবের অস্পৃশ্য—এখন মাধবের পিপাসা তোমাকে দিয়া মিটাই—আর তাকে দিয়া কি করিব? মাধব বলে "তুমি এখন অসতী—আমি তোমার জন্য অসৎ হইব, নরকে ঝাঁপ দিব"—শ্যামা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"না—আর না—মাধব আমায় বড় কষ্ট দিয়াছে—মাধব আমার শত্রু, পাপে হাত দিয়াছি; শুদ্ধ পাপ করিয়া ক্ষান্ত হইব না—মহা পাপ—মহা পাপ করিব—কোন হিন্দু নারী যে

পাপ স্বপ্নেও ভাবে নাই, সেই পাপ করিব—মাধবের রক্ত পান করিব—এই অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তার উষ্ণ রক্ত পান করিব। জগতকে ভালবাসার নামে বিভীষিকা দেখাইব।"—শ্যামা সুন্দরী বিষম উত্তেজিতা হইয়া যখন এই কয়টি কথা কহিলেন—কৈলাশচন্দ্র ভয়ে দুই হাত সরিয়া বসিলেন—অমনি নিষ্প্রভ আলোকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—দেখিয়া ভয়ে তাঁহাব শরীর আড়ষ্ট হইল। দেখিতে পাইলেন, কে শোণিত বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত, আর শুনিতে পাইলেন—মোহন মৃদু তানে গাইতেছে—

"ধবম জ্যোতি—পাপ অনল ভেল।
হের, লক লক জীভ ধক ধক জ্বলি সকলি দহল।
আমি যে পতঙ্গ নাহিক আতঙ্ক ঐ শিখামুখে ধাই নাচিতে,
পড়ি পড়ি পড়ি উঠি উঠি উঠি ধরিতে।
ঐ হেব হের রূপ মনোহব ভয়ঙ্কব হলাহল উগরল॥"

* * * * *

তখন কৈলাশচন্দ্র শ্যামা সুন্দবীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেই বিভীষিকা দেখাইলেন—শ্যামা সুন্দরী শয্যা পার্শ্ব হইতে সেই শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া সবলে ছুড়িয়া মারিলেন—ছুরি ঠন ঠন ঝনাৎ শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। শ্যামা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"আমারই চেলীর কাপড় খানা" কৈলাশ অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তবে গান কে করিল?"

"মাধব।"

"কি মাধব!"

"হাঁ।"

"এত রাতে?"

"এত রাতে"—এই বলিয়া শ্যামার বদন ভীত ও বিষদ মাখা হইল।—

কৈলাশ বলিলেন—"কি ভাবিতেছ?"

শ্যামা বলিলেন "মাধব সব শুনেছে।"

"সে কি এখানে আসিতে পারে?"

"মাধবের অগম্য স্থান নাই।"

ভয়ে কৈলাশের মুখ শুকাইল।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

বঙ্গচন্দ্র সে দিন কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া—বাসায় বসিয়া কি লিখিলেন—লেখা হইলে মোড়ক করিয়া, একটী লোকেব হাতে দিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন; সে দ্রুত বেগে চলিয়া গেল।

এ দিকে মাধবও ধীবে ধীরে উঠিয়া গ্রাম পাব হইয়া একটা আম্রকাননেব ধাবে গিয়া বসিলেন। আম্রকাননের কিছু দূবে ক্ষুদ্র নদী। অর্দ্ধ ঘণ্টা পবে একজন লোক সেই আম্র কানন দিয়া নদী তীরে আসিল। মাধব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।—সেই লোকটী নদী পার হইল—মাধবও নদী পার হইলেন—তৎপব প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠেব মাঝখানে মাধব তাহাকে বলিলেন—"তোমার সঙ্গে একখানি চিঠি আছে, তাহা দাও।" বাহক বলিল "আমাব সঙ্গে চিঠি নাই।" মাধব তাহার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কহিও না, চিঠি দাও, নচেৎ এই খানে তোমার জীবনের শেষ।" বাহক অগত্যা চিঠি বাহির কবিয়া দিল। মাধব তাহা পাঠ করিয়া, তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, "লইয়া যাও"—তৎপর ট্যাঁক হইতে একটী টাকা বাহির কবিয়া তাহাব হাতে দিলেন। বাহক অবাক হইয়া যথা স্থানে চলিল।

সেই দিন রজনী ৭।৮ ঘটিকার সময় এক খানি পালকি ও দুই খানি শিবিকা নদী পার হইয়া আম্রকাননে প্রবেশ করিল। আম্রকাননেব মধ্য দেশে আসিলে, একদল মুখসধাবী লোক পালকী আক্রমণ করিল। দুইজন বরকন্দাজ ও বেহারাগণকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। দস্যুদলপতি ধীরে ধীরে পালকির দ্বার খুলিয়া চুপে চুপে কি বলিল—তৎক্ষণাৎ পালকী হইতে এক জন লোক বাহির হইয়া শিবিকার দুইটী স্ত্রীলোককে ডাকিল, তাহারাও বাহির হইল। তথন একে একে সকল দস্যু অন্তর্হিত হইল—দলপতি পালকি শিবিকারোহিত্রয়কে সঙ্গে করিয়া আম্রকাননের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া এক কুটীরের দ্বারে আঘাত করিল। কুটীর হইতে একটী সুন্দরী রমণী বাহির হইলে, তাহাকে বলিল "ইঁহারই নাম হরানন্দ ঠাকুর

—সঙ্গে পত্নী ও বিধবা কন্যা। সময়ে আমি আবার আসিব—ঘাটে নৌকা প্রস্তুত থাকিবে—ইহারা যাইবেন, সঙ্গে তুমি থাকিবে। কিছু দূর উজান বাহিয়া গেলে নদী তীবে দুলাল পাটনীর বাড়ী দেখিতে পাইবে—দুলাল আমার আপনার লোক—আর যাহা কবিতে হয় সেই করিবে।" আগন্তুক গণ গৃহে যাইলে রমণী মুখস্ টানিয়া ফেলিয়া বলিল—

মাধব—"এখন কোথা যাবে?"

"রোজ যেখানে।"

"শ্যামার ঘরে?"

"হাঁ।"

"রোজ কেন?"

মাধব হৃদয়ে—হাত দিয়া বলিলেন "গুপ্ত বড় যন্ত্র জানিতে।"

"কি কবে ভিতবে যাও?"

"প্রাচীর টপ্‌কে।"

"তার পর?"

"কাঁটাল গাছে উঠি।"

"তার পর?"

"ছাদে যাই।"

"তার পর?"

"ছাদের দরজা দিয়া নীচে যাই।"

"তার পর থাম ধরিয়া কার্নিসে পা দিয়া বারন্দায় যাইয়া জানালার কাছে দাঁড়াই।"

রমণী বলিল "মাধব আর যেও না।"

মাধব হাসিয়া বলিলেন "আজ যাব, কালও যাব, তার পর আর যাব না।" রমণী বলিল "দাঁড়াও কুটীর হইতে আসি"—এই বলিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসলি; আসিয়া বলিল "খাও!" মাধব দেখিলেন, এক বাটী দুধ, এক ছড়া সুপক্ক কদলী।—মাধব মিনিটের মধ্যে অতগুলি দুধকলা উদরসাৎ কবিয়া প্রস্থান করিলেন।

মাধব যখন যান, তখন প্রায় দশটা। আজ শেষ বেলায় নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলেই শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করিয়াছে সুতরাং তিনি গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গ্রাম নিস্তব্ধ—তখন মাত্র বারটা বাজিয়াছে! তার পর মাধব কি করিলেন—পাঠক হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন। মাধব যখন ফিরিয়া আসেন, তখন গান গাইয়া আসিতে ছিলেন, তাই—শ্যামা সুন্দরী শুনিয়া—ভয়ে ভয়ে বলিয়া ছিলেন "মাধব।"

পরদিন প্রাতঃকালে বঙ্গচন্দ্র উন্মাদের মত হইয়া—চারিজন বরকন্দাজকে হুকুম দিলেন "মাধব মাষ্টারকে ধরিয়া আন।" কিন্তু কেহই তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

দিবা দশটার সময় মাধব স্কুলে যাইতেছেন, সেই চারিজন লোক তাঁহাকে বলিল "আপনাকে খুঁজিয়া পাই নাই, চলুন দেওয়ানজী আপনাকে ডাকিয়াছেন।" মাধব মনে মনে হাসিলেন, মনে মনেই কহিলেন "ষড় যন্ত্র ভাঙ্গিয়াছি, হরানন্দ হস্ত চ্যুত হইয়াছে—তাই।" প্রকাশে বলিলেন,—"স্কুল করিয়া চারিটার পর যাইব—এখন যাইব না।" বরকন্দাজেরা বলিল—"মহাশয়কে ধরিয়া লইতে হুকুম দিয়াছেন—যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক না যান, বল-পূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

এ কথায় মাধব কিছু মাত্র রাগিলেন না--চঞ্চল হইলেন না--হাসিয়া বলিলেন "আমায় কোথায় লইয়া যাইতে চাও?"

"দেওয়ানজীর বাসায়।"

মাধব বলিলেন "আচ্ছা যাইব—স্কুলের বালকগণকে বলিয়া আসি, তারা গোল না করে--আমার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে পারে"—চারিজন লোক তাঁহার সঙ্গে চলিল—তিনি বালকগণকে বলিয়া বঙ্গচন্দ্রের সমীপে চলিলেন। মাধব চলিয়া গেলে বালকগণ জমীদারের পাইক বরকন্দাজ তাঁহার সঙ্গে দেখিয়া সন্দেহ করিল।

দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়াছেন; মুনসী নিকটে বসিয়া চিঠি লিখিতেছে; এই সময়ে মাধব উপস্থিত হইলেন।—বঙ্গচন্দ্র মাধবকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত শৃগালের ন্যায় মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"মাধব মাষ্টার! আমার সঙ্গে চালাকি জুড়িয়াছ?"

মাধব তাঁহার স্বভাবাতীত নম্রতা ও ধীরতার সহিত বলিলেন—

"কি চালাকি ?"

"সবকাবি কাজে প্রাণ পণে বাধা দেও।"

"অন্যায করিলে, কেন দিব না ?"

"আমি আজ তোমাব পাগলামি ভাঙ্গিয়া দিব।"

মাধব সেই ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন "Not before thou art sent to lodge in thy kennel"

"আমার লোক জন মারিয়া হবানন্দকে কেন চুরি করিযাছ ?"

"আমি কি একাকী অমন কাজ করিতে পারি ?"

"তোমাব সঙ্গে ২০।২৫ জন লোক ছিল।"

"মিথ্যা কথা।"

"তবে কত লোক ছিল ?"

"সমস্ত আম্র কাননে যত লোক ধরিতে পাবে।"

বঙ্গচন্দ্রে ও মাধবে এইরূপে কথোপকথন হইতেছে, এ দিকে ক্রমে স্কুলের তিন চারি শত বালক দেওয়ানের বাসার চারিদিকে দাঁড়াইয়া বেড়া ফুট করিয়া কি হইতেছে, দেখিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সংবাদ রটিয়াছে মাধবকে আপমান করিবার জন্য দেওয়ানের লোক ধরিয়া নিয়া গিয়াছে—তাই দেখিবার জন্য গ্রাম ও গ্রামান্তর হইতে বালক বৃদ্ধ খঞ্জ কুব্জ কাতারে কাতারে দলে দলে আসিয়াছে; বন্দোরে চাসার দল বাজার করিতে আসিয়াছিল—তাহারাও ঐ কথা শুনিয়া ক্রমে সকলেই আসিয়াছে। এত লোক উপস্থিত হইয়াছে, সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, লোকের হাতে হাতে,—হুড় মার করিয়া এক দিক্‌কার বেড়া পড়িয়া গেল—যাহাবা ঐ বেড়ার অব্যবহিত পশ্চাতে ছিল, তাহাবা মাধবকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ মাষ্টার মশায়! ঐ মাষ্টার মশায়!"—সেই ধ্বনি শুনিয়া যত লোক তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল "কোথা মাষ্টার মশায়! কোথা মাষ্টার মশায়!"——বঙ্গচন্দ্র ভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, লোকের মাথার চুলে—চারি-

দিকে কৃষ্ণ সমুদ্র-তরঙ্গ। তাঁহার মুখ শুকাইল—ভাবিলেন, এত লোকের নিশ্বাসেই তিনি উড়িয়া যাইতে পারেন।

মাধব এবারে গর্ব্ব করিয়া বলিলেন। "একবার প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলাম। এবার কি করিব বল ?"

বঙ্গচন্দ্র উন্মাদের ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন। মাধব আবাব ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন।

"Knav, treat a friend as if at some future time he may become an enemy, and an enemy as if he may become a friend—এই বলিয়া মাধব চলিয়া গেলেন। সাগব তুল্য জন স্রোত নিমেষে কোথায় গেল। বঙ্গচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া অপনা আপনি বলিলেন "এ সামান্য পাগল নয়।"

*   *   *   *   *

বেলা একটার সময় দুইজন লোক লইয়া বঙ্গচন্দ্র কি পবামর্শ করিলেন।—তাহাব একজন বলিল—"আজই ?"

"আজই !"

"মোটে ২০০্ শটাকা ?"

"কৃত কার্য্য হইলে আরো ১০০্ দিব।"

লোক দুইটী চলিয়া গেলে—বঙ্গচন্দ্র ধীরে ধীরে কৈলাশচন্দ্রের নিকট গেলেন। কৈলাশচন্দ্র পূর্ব্ব রজনীর কথা ভাবিতে ছিলেন। বঙ্গচন্দ্রকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—

"সংবাদ কি ?"

"বড় মন্দ।"

"কেমন ?"

"বুঝি জেলে যেতে হয়।"

"কেমন কথা ?"

তখন বঙ্গচন্দ্র বলিলেন—"যে কাজ করি, তাই ফঁস্কে যায়; উপরন্ত—নিজের জালে নিজে জড়িত হই।"—তাহার পর হরানন্দের ব্যাপাব ও সেদিন তাঁহার বাসায় যে ঘটনা হইয়াছিল, একে একে বিবৃত করিলেন। কৈলাশচন্দ্র শুনিয়া

কিছুই বিস্মিত হইলেন না। হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, কোন কোন অংশ বাদ দিয়া সকলই বলিলেন।

বঙ্গচন্দ্র শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা নিশ্চুপ থাকিয়া বলিলেন,—"ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি, যদি আমাব জেল হয়, তবে ৭।৮ বৎসরেব কম হইবে না; দায়মালও হইতে পাবে—তা হলে আব এজীবনে প্রয়োজন কি? আমি মাধবকে মারিব। অন্তত যার নুন খাই, তাঁকেত নিষ্কণ্টক করিয়া যাইব।"

কৈলাশচন্দ্র বলিলেন—"আপনি বেড়ান ডালে ডালে, মাধব বেড়ায় পাতায় পাতায়—চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, পারিবেন না।

বঙ্গচন্দ্র বলিলেন—"না পাবি জেলেব দিকে আব একপদ অগ্রসর হইব।" এই বলিয়া বঙ্গচন্দ্র উঠিয়া চলিলেন, যাইবাব বেলা বলিলেন, "কর্ত্তার কোন চিঠি আসিয়াছে?"

কৈলাস বলিলেন "তিনি সকল বিপদেব কথা শুনিয়াছেন, শীঘ্র আসিবেন।"

বঙ্গচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

ক্রমে বেলা অবসান হইল—দেখিতে দেখিতে নয়টা বাজিয়া গেল, সকল লোক এখনও শয়ন করে নাই। শ্যামা সুন্দরী পর্য্যঙ্কে বসিয়া কেশ বিন্যাস করিতেছেন। শ্যামার নীলোৎপল চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে। পরিপুষ্ট পদ্মদলের ন্যায় বর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্রে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; বদনের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এরূপ দেখিলে বিশ্বের ও প্রকৃতির উপর ক্রোধ হয়—নশ্বর শরীরের এত সৌন্দর্য্য কেন? শ্যামার বয়স ত্রিশ পূর্ণ হইবার দুই এক বৎসর বাকি আছে; কিন্তু ষোড়শী রমণীর যৌবন শ্যামার যৌবনের কাছে হারি মানে—নারী-শরীর অতিসুন্দর, অতি কমনীয়, অতি লাবণ্য বিশিষ্ট হইতে যাহা যাহা চাই, তাহা সকলই শ্যামার শরীরে আছে। কেশ ও বদন মাধুরী পরিমাণের অতিরিক্ত আছে। শ্যামা চুল বাঁধিতেছেন এবং আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি

মোহিত হইয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন; একজন আগন্তুক সেই প্রজ্জলিত রূপ রাশি অনিমিক নয়নে গ্রাস করিতেছেন।

শ্যামা তাহা দেখিতে পান নাই—আপনার ভাবে আপনি বিভোরা। হঠাৎ তাঁহার সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। শ্যামা ভয় বিস্ময়ে চীৎকার করিতে করিতে অসাধারণ ক্ষমতায় সেই স্বর সংযত করিলেন—এবং বীরাঙ্গনার ন্যায় দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটী করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"দূর হও! এখনই দূর হও!"

আগন্তুক নত জানু হইয়া শ্যামার চরণ তলে বসিয়া হৃদয়ে হাত দিয়া বলিল—"শ্যামা এখনই দূর হব—এই শেষ দেখা—কিছু বলো না—কিছু বলো না—একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি"-বলিতে বলিতে আগন্তুকের দুই চক্ষু হইতে জলধারা বহিল।

শ্যামার ক্রোধ শান্তি হইল—রাগপূর্ণ বদন প্রসন্ন ও প্রশান্ত হইল। যে স্রোত বাঁধ বাধিয়া রাখিয়াছিলেন, শ্যামার সেই স্রোত বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া আজ গর্জ্জিয়া ছুটিল। কৈলাস বালির বাঁধ—লক্ষ লক্ষ কৈলাস এ মহাস্রোতে ভাসিয়া চলিল। শ্যামা কান্দিলেন; এ ক্রন্দনে অনেক সুখ পাইলেন; আগন্তুকের বীরমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিল—শ্যামা হাত ধরিয়া বলিলেন—"মাধব দাঁড়াও।" মাধব দাঁড়াইলেন কিন্তু যেন প্রাণ শূন্য দেহ। শ্যামা দুই হাতে সেই দেহ হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন—মাধব শ্যামার সেই মাধুরি পূর্ণ বদন বক্ষে ধারণ করিয়া আবার প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। উভয়ে নির্ব্বাক; উভয়েই কাঁপিতেছেন—উভয়ের নয়নে অশ্রুধারা বহিতেছে; উভয়েরই ঘন ঘন উষ্ণ শ্বাস বহিতেছে—এ দিকে শ্যামার অর্দ্ধবেণী বদ্ধ ঘন-মেঘ-রুচি কেশ জাল বিশৃঙ্খল হইয়া পৃষ্ঠে, পার্শ্বে ও মাধবের বাহুতে লুটাইতেছে। শুভ্র সুচিক্কণ বসনাঞ্চল মাঝিয়ায় লুটাইতেছে। উভয়ে এই ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা রহিয়াছেন; সে অর্দ্ধ ঘণ্টা তাঁহাদের পলার্দ্ধ। মাধব বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—

To love or to have loved that is enough. Ask nothing further; ah—love is the only ecstacy, every thing else—weeps —weeps—weeps!

ঐ দেখ শ্যামার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কে ঐ ভীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল—অজ্ঞান অচল অথচ ক্রোধ-ঘৃণা-মিশ্রিত কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া।

মাধব দেখিলেন,—কৈলাসচন্দ্র। কৈলাস দেখিলেন মাধব—উভয়েই লজ্জিত, ভীত। মাধব শ্যামার কোমল বন্ধন মোচন করিলেন। শ্যামা কিছুই লজ্জা ভয় করিলেন না; একবার মাধবের মুখ পানে আর একবার কৈলাসের মুখ পানে চাহিলেন—কৈলাসের আরক্তিম লোচন—মাধবের সেই প্রভাময় শোভাময় কাতর দৃষ্টি। মাধব কৈলাসকে জয় করিলেন। শ্যামা সাম্রাজ্ঞীর ন্যায়—আদেশ করিলেন——"কৈলাস নীচে যাও।" কৈলাস আদেশ পালন করিলেন।

কৈলাস চলিয়া গেলে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "মাধব যাহা হইল, ইহার পর আর গৃহে থাকা যাইবে না, চল কাশীতে যাইয়া বাস করি।" এই বলিয়া পঁচিশ হাজার টাকার এক তাড়া নোট তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন "ইহাতেই দুজনের চলিবে।"

মাধব বলিলেন—"আমি জীবনের ভয় করি না। যদি পাপ করি, তাহাও লোকের ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া করিব না—স্বামী বাড়ীতে আসিলে, তাঁহার চরণ ধরিয়া দোষ স্বীকার কর এবং এ দোষ হইতে নিবৃত্ত হইতে যদি অক্ষম হও, তবে তাহাও তাঁহাকে বল। স্বামীর হস্ত হইতে শাস্তি গ্রহণ কর, স্বামীর আদেশ পালন কর। মাধব তোমাকে পাইলে সাম্রাজ্য পাইবে। তাহার অর্থের প্রয়োজন কি?—মাধব যে অর্থ ঘৃণা করে, এক বস্তু ছাড়া পৃথিবীও ঘৃণা করে, তাহা তুমি জান।" এই বলিয়া নোট গুলি শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন।

শ্যামা মাধবের কথার অর্থ—বুঝিতে পারিলেন।—অবশের ন্যায় নোট গুলি হাতে করিলেন,—কিন্তু শিথিল মুষ্টি হইতে উহা পড়িয়া গেল।

ছড়াইয়া পড়িল—শ্যামা বিস্মিত হইলেন। মাধব বলিলেন "এ যে ১০৲ করিয়া পঁচিশ খানি নোট"—শ্যামা বলিলেন—"কৈলাসের একাজ। ২৫ খানি ১০০০৲ নোটের স্থানে ২৫ খানি ১০৲ দশ টাকার নোট রাখিয়া সমস্ত চুরি করিয়াছে।"

মাধব হাসিলেন—বলিলেন,“নোট সংপ্রতি কৈলাসের কাছে নাই। বংশীধর হঠাৎ নিষ্প্রয়োজনে—কলিকাতা গিয়াছে—বোধ হয় নোটগুলি সেই ভাঙ্গাইতে গিয়াছে; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তাহার এক পয়সা কৈলাসের হস্তগত হইবে না। এই বলিয়া বংশী ও কৈলাসের সকল কাহিনী একে একে কহিলেন। শ্যামা ক্রোধে দন্ত কট্ মট্ করিয়া বলিলেন "এখন উপায় ?”

“নোটগুলির নম্বর আছে ?”

“আছে।”

“দাও।”

শ্যামাসুন্দরী মোড়কের কাগজ খানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন “ইহাতে লেখা আছে।”

মাধব কাগজ খানি হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন—শ্যামা তাঁহার হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—“যেঁও না সাবধান,—দেওয়ানজী তোমাকে মারিবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করেছে”—

মাধব হাঁসিয়া বলিলেন—“এ ষড়যন্ত্র কৈলাসচন্দ্রও আছেন”। এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, রহিলেন না।

শ্যামাসুন্দরী বিস্মিত হইলেন, মাধব এ সংবাদ কিরূপে জানিতে পাইলেন! মনে মনে বলিলেন ‘‘মাধব তুমি কি দেবতা!’’

ইংরেজ সৈন্যের দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা।

১৮৫৭ অব্দে সিপাহি যুদ্ধের সূত্রপাত মীরাটে হয়। মে মাসে মীরাটের সিপাহিরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়া উক্ত স্থানের ইউরোপীয়দিগের অনেককে নিহত করে। ইহার পর তাহারা দিল্লীতে উপনীত হয়। তাহাদের আক্রমণে দিল্লীর ইউরোপীয়েরা, অনেকে নিহত হয়, অনেকে তাড়িত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। দিল্লী ইংরেজদিগের হস্তভ্রষ্ট হয়। সিপাহিরা দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে, সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সংবর্দ্ধনা করে। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমে দিল্লীর উদ্ধারে উদ্যত হন।

প্রধান সেনাপতি আন্‌সন্ সিমলা হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কর্ণালে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। সেনাপতি বর্ণার্ড প্রধান সেনাপতির স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

বর্ণাড এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া দিল্লীর অভিমুখে সৈন্যপরিচালনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈন্যদল অম্বালা হইতে দিল্লী উদ্ধারার্থ যাত্রা করিল। নিদাঘের প্রচণ্ড তপন চারিদিকে অনল-কণা বিকীরণ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্যগণ এইজন্য দিবসে যাইতে পারিত না। দিবা অবসানে আতপ-তাপের শান্তি হইলে, ইহাদের অভিযান আরব্ধ হইত। যখন রাত্রি প্রভাত হইত, পূর্ব্বাকাশ যখন ধীরে ধীরে অরুণরঞ্জিত হইয়া চারিদিক আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত, তখন ইউরোপীয় সৈনিকদলের হৃদয়ে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ইহার পর সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিলে পরিশ্রান্ত সৈনিকদল আপনাদের পটবাসে প্রবিষ্ট হইত। এই আশ্রয়-স্থানেও তাহাদিগের শান্তি ছিল না। নির্দ্দয় তপন পটাশ্রম যেন শতছিদ্র করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জলন্ত বহ্নি ইহাদের গাত্রে ঢালিয়া দিত। প্রখর আতপতাপে এইরূপ নিপীড়িত হইয়া, ইহারা চারি দিকে অবরুদ্ধ তাম্বুর মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত। শেষে যখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে

গড়াইয়া পড়িত, আতপের তেজ যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিত, তখন ইহাদের মধ্যে আবার জীবনী শক্তির সঞ্চার দেখা যাইত। তখন ইহারা আপনাদের তাম্বু হইতে বাহিরে আসিত এবং স্ব স্ব দ্রব্যজাত লইয়া আবার অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইত। এইরূপে সায়ন্তন সময়ই ইহাদের নিকট কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। ইহারা এইসময়ে যাত্রা করিয়া রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গপূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইত। তারকাময়ী বিভাবরী এখন ইহাদের নিকটে বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল। কিন্তু যদিও ইহারা শান্তিময়ী রাত্রিতে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিত, তারকা খচিত-প্রশান্ত আকাশ যদিও ইহাদের সম্মুখে প্রশান্তভাব বিস্তারিত করিয়া দিত, তথাপি ইহাদের হৃদয়ে শান্তি ছিল না। দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া, ইহারা অশান্ত ভাবে পথিমধ্যেই অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। দিল্লী হইতে যে সকল ইউরোপীয় পলায়ন করিয়াছিল, পথে তাহাদের অনেকে নানা দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। দিল্লীযাত্রী সৈনিকদল এখন আপনাদের গন্তব্য পথের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসীদিগকে ঐ দুর্দ্দশার হেতু মনে করিয়া তাহাদের উপর কঠোর ভাবে বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা তাহাদের অনেককে ধরিয়া আনিল, এবং আপনারাই তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে লাগিল। ইহাদের আফিসরেরাও এই কার্য্যের অনুমোদনে ত্রুটি করিলেন না। এক জন সহৃদয় লেখক এই শোচনীয় দৃশ্যের এইরূপ চিত্র দিয়াছেন,—"সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর উগ্রভাব প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতে ছিল, সমভিব্যাহারী ভৃত্যদিগের নিকট ইহারা সর্ব্বদাই ঐ ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিত, এজন্য অনেক চাকর পলাইয়া গিয়াছিল। বন্দীগণ কয়েক ঘণ্টা মধ্যে অর্থাৎ তাহাদের বিচার ও বিনাশের মধ্যে যতটুকু সময় ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ইহাদের হস্তে যারপর নাই নিগৃহীত হইত। ইহারা তাহাদের চুল ধরিয়া টানিত, সঙ্গীন দিয়া খোঁচাইত এবং জোর জবরদস্তি করিয়া গোমাংস খাওয়াইয়া দিত। ইহাদের অফিসরগণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যের অনুমোদন করিতেন।"

মিরাট হইতে ৬০ মাইল দূরে গঙ্গার তটে রুড়কি অবস্থিত। এইস্থানে দেশের সর্ব্বপ্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এতদ্দেশীয়গণ ইউরোপীয় স্থপতিবিদ্যার

আলোচনা করিয়া থাকেন। রুড়কির এই টমাসন্ কলেজের কারখানা বিবিধ যন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ। কল কারখানার কার্য্যে এই স্থান প্রায় জীবন্ত ভাবে থাকিত। খালের জলসেচনের প্রধান কার্য্যালয়ও এই স্থানে অবস্থিত। এই কার্য্যালয় হইতে যে সকল নিয়ম বাহির হয়, তদনুসারে ক্ষেত্র সমুদায়ের জলসেচন করিয়া উহা শস্যশালী করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ ইউরোপীয় অফিসরদিগের অধীনে অবস্থিতি করেন। সুতরাং রুড়কি জনবহুল ও জীবন্ত ভাবপূর্ণ স্থান ছিল। মে মাসের প্রারম্ভে এই স্থানে শান্তির কোন ব্যাঘাত দেখা যায় নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ শান্তভাবে শিক্ষার্থীদিগকে স্থপতিবিদ্যার উপদেশ দিতেছিলেন। শিক্ষার্থিগণ শান্তভাবে ঐ উপদেশ গ্রহণ করিতেছিল। ইঞ্জিনিয়ারেরা শান্তভাবে আপনাদের মাণচিত্র ও যন্ত্রাদি লইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কোথাও কোনরূপ আকস্মিক গোলযোগ বা অধীরতার চিহ্ন দেখা যায় নাই। কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ এই স্থানে সর্ব্ব প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যখন জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার সম্বন্ধে এই স্থান পৃথিবীর মধ্যে নিরাপদ বলিয়া অহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন মিরাটের দুর্ঘটনার সংবাদ ঐ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ স্থানে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত সামরিক ইঞ্জিনিয়ারদিগের অধ্যক্ষ মেজর ফ্রেজার, মিরাটের সেনাপতির নিকট হইতে আদেশ পাইলেন যে, তাঁহাকে অবিলম্বে অধীনস্থ দলের সহিত অতি সত্বর মিরাটে উপস্থিত হইতে হইবে, যেহেতু তত্রত্য সিপাহিগণ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথের নিকট যখন এই সংবাদ পঁহুছিল তখন তিনি, কর্ণেল ফ্রেজারের নিকটে, গঙ্গার খাল দিয়া নৌকাপথে সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। ফ্রেজার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি ছয় ঘণ্টার মধ্যে, হাজার লোক পাঠাইবার উপযোগী কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিলেন। রুড়কিতে কেবল ৭১৩ জন মাত্র সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল। এই সকল লোক মিরাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহার মধ্যে মিরাট হইতে আবার সংবাদ আসিল যে, রুড়কি রক্ষার জন্য দুই দল লোক রাখিয়া, অবশিষ্ট লোক মিরাটে পাঠাইতে হইবে। সুতরাং ৭১৩ জনের মধ্যে ৫০০ শত লোক সজ্জিত হইয়া ফ্রেজারের অধীনে, মিরাটে যাত্রা করিল।

এদিকে ফ্রেজারের অধীনে সিপাহিরা মিরাটের অভিমুখে যাইতেছিল। তাহারা পথে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা বিরোধের নিদর্শন দেখায় নাই। শান্তভাবে আপনাদের অধিনায়কের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহারা, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। কিন্তু মিরাটে তাহাদের শান্তভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বারুদ প্রভৃতি তাহাদেব তত্ত্বাবধানে বাখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কোন বিষয়ে তাহাদের উপব অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, এরূপ কার্য্য কবিতে তাঁহাব ইচ্ছা ছিল না। গোলার আঘাত সহিতে পাবে, এমন একটি সুদৃঢ় গৃহ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ঐ গৃহেই আপনার সৈন্যদিগেব বারুদপ্রভৃতি বাখিবাব ইচ্ছা কবিয়াছিলেন। যদি সিপাহিদিগকে এই অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেওবা হইত, তাহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিত। কিন্তু সৈন্যদিগকে পূর্ব্বে ঐ বিষযেব কিছুই বলা হয় নাই। সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির অভাবে অনেক সময়ে নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। উপস্থিত বিষয়েও পদে পদে সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিব অভাব দেখা যাইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহিদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করেন নাই। তাঁহাবা অনেক সময়ে মনে মনে একরূপ ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, সন্দিগ্ধ সিপাহিরা তাঁহাদের কার্য্য অন্যরূপ মনে কবিয়া, তাঁহাদিগকে গুরুতর শত্রু বলিয়া স্থির করিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছিল। মিবাটে পঁহুছিবার পর দিন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের বারুদপ্রভৃতি সহসা স্থানান্তবিত হইয়াছে। অধিনায়কের অভিপ্রায় তাহারা কিছুই জানিত না। সুতবাং তাহাদের হৃদয় সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা ঐ কার্য্য ঘোবতব বিশ্বাসঘাতকতা মনে করিয়া, বোম্বাই গাড়ী অববোধ কবিল, এবং গভীর উত্তেজনায় মিবটের সিপাহীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল। একজন আফগান সিপাহি পশ্চাৎ দিক হইতে সেনাপতির প্রতি বন্দুক ছুড়িল। ফ্রেজার পৃষ্ঠদেশে আহত হইয়া, ভূতলে শায়িত হইলেন। সেনাপতিকে হত্যা করিয়া উত্তেজিত সিপাহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। একদল ইউরোপীয় সৈন্য, তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা কবিল। অনেকেই পলায়ন করিয়াছিল, কেবল পঞ্চাশ জন মাত্র ধৃত হইল। ইহাদেব কেহই পরিত্রাণ

পাইল না। সকলেই উত্তেজিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগের হস্তে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইল।

২৭এ মে সেনাপতি উইলসনের অধীনে মিরাটের সৈন্যদল দিল্লীযাত্রী সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। গ্রিথেড্ সাহেব দেওয়ানী কর্ম্মচারী-রূপে ইহাদের সহিত যাত্রা করিলেন। প্রথম দুই দিন ইহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহিদিগের সঙ্গাৎ হইল না। গ্রিথেড্ ভাবিলেন যে, দিল্লীর প্রাচীরের সম্মুখবর্ত্তী না হইলে বোধ হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ৩০এ মে গ্রিথেডের অনুমান অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। উইলসন, এই সময়ে হিন্দন নদীর তীরবর্ত্তী গাজিউদ্দীন নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া, ব্রিটীশ শাসন বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা ইংরেজের সমক্ষে, আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল, ইঙ্-রেজের আধিপত্য দূর করিয়া বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল, এবং সমগ্র দিল্লীতে অকুতোভয়ে ও অক্ষুণ্ণভাবে আপনাদের প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছিল। এইরূপ কৃত-কার্য্যতায় তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। তাহারা আপনাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর বাহিরে আইসে, এবং অম্বালার সৈন্যদিগের সহিত সম্মিলনের পূর্ব্বে মিরাটের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা আপনাদের সন্নিবেশিত স্থানের দক্ষিণভাগে কয়েকটি কামান স্থাপিত করিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। ইংরেজ সৈন্যও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। এই সঙ্গে বন্দুকধারী ইংরেজ সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সিপাহিদিগের সম্মুখবর্ত্তী হয়। কিছুকাল উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সিপাহিরা এই যুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত হয়। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে। কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী গ্রামে উপনীত হয়, অনেকে দিল্লীর দিকে গমন করে, তাহাদের ৫টি কামান ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরাও ক্ষতি-গ্রস্ত হন। একজন সিপাহির অসাধারণ

সাহসে ও তেজস্বিতায় সিপাহিদিগের বারুদের এক খানি গাড়ী জ্বলিয়া উঠে। ঐ গাড়ীর বারুদ যে কামানে ভরা হইতে ছিল, একজন ইঙ্গরেজ সেনা-নায়ক যখন একদল সৈন্য লইয়া, সেই কামান অধিকার করেন, তখন ১১ গণিত দলের একজন সিপাহি গুরুতর যুদ্ধের মধ্যে যথোচিত একাগ্রতার সহিত উক্ত বারুদ বোঝাই গাড়ীতে বন্দুক ছুড়িতে থাকে। বন্দুকের আগুনে বারুদ, গাড়ীসমেত জ্বলিয়া উঠে। সেই মুহূর্ত্তেই সিপাহির প্রাণবিয়োগ হয়। ইঙ্গরেজ সেনানায়কও কয়েকজন অনুচরের সহিত নিহত হন। আরও কতকগুলি আহত হইয়া যুদ্ধ ইতে নীত হয়। সিপাহি আপনার প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ঐরূপ .ব পরিচয় দিয়াছিল, এবং আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হই ক্ষদিগের বলক্ষয় করিতে এইরূপ কার্য্য-ক্ষমতার পরিচয় দিয় .ত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যে এইরূপ সাহস ও বীরত্বসম্পন্ন যোদ্ধা অভাব ছিল না। ইহারা স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থলে ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় জীবন স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, বীরপুরুষগণ কিরূপে আপনাদের সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা ঐ সিইপাহিদিগের বিবরণে বুঝা যায়। ইহাদের অনেকের বীরত্বকীর্ত্তি উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকের কীর্ত্তি-কাহিনী আবার ইতিহাসেও স্থান পরিগ্রহ করে নাই। বিদেশী ঐতিহাসিক অনেকস্থলে, বিদেশীয়ের বিপক্ষের জ্বলন্ত কীর্ত্তির পরিচয় দিতেও বিমুখ হইয়াছেন। ইউরোপে হইলে এই সকল বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্ত্তি ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে যেন জীবন্ত ভাবে বিচরণ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অনন্ত কালের অভিঘাতে, অতীত স্মৃতির সন্তাড়নে সমস্তই নিঃসন্দেহে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

সিপাহিরা দিল্লীতে উপনীত হইলে বিপক্ষদিগকে আবার বাধা দিবার জন্য প্রয়োজন হইতে লাগিল। যে সকল সিপাহি হঠিয়া আসিয়াছিল, তাহারা আবার আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা হিন্দনের তীরে আসিয়া বিপক্ষদিগের উপর কামানের

গোলা চালাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজপক্ষের কামান রক্ষক সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া সম্মুখীন শত্রুদিগের অগ্রভাগে আপনাদের কামান সকল সজ্জিত করিল। দুই ঘণ্টা কাল উভয়পক্ষে কামানে কামানে যুদ্ধ হইল। মে মাসের শেষ দিন এই যুদ্ধ ঘটে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ইঙ্গরেজ সৈন্যের দুরবস্থার একশেষ হইল। অনেকে নিদারুণ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। এদিকে সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে অনেকে প্রাণ হারাইল। অনেকে পথে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল। কেহ কেহ পরিশ্রান্তির সময়ে জল পান করিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত[illegible]। বিপক্ষদিগকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সিপাহিরা দিল্লীতে[illegible]যা যাইতে উদ্যত হইল। ইঙ্গরেজ পক্ষের অগ্রগামী দলের প্রতি অ[illegible]ন্নি বৃষ্টি করিতে করিতে তাহারা বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত হঠিয়া গে[illegible]দের কামান বারুদ ও গোলাগুলি প্রভৃতি কিছুই বিপক্ষদের হস্তগত হইল না। সিপাহিরা আপনাদের সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীতে উপনীত হইল। প্রখর উত্তাপে নিদারুণ পিপাসায়, ইহার উপর অনশনে কাতর হওয়াতে, ইঙ্গরেজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন সময়ে সিপাহিদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। { ফাল্গুন, ১২৯৫। } ষষ্ঠ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগ সূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধনপাদ।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥১৩॥

পদচ্ছেদঃ। সতি, মূলে, তদ্-বিপাকঃ, জাতি-আয়ুঃ-ভোগঃ।

পদার্থঃ। ' মূলং উক্তলক্ষণাঃ ক্লেশাঃ তেষু (অনভিভূতেষু) সৎসু তদ্বিপাকঃ তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ ফলং—জাতিঃ মনুষ্যত্বাদিঃ, আয়ুঃ চিরং শরীর সম্বন্ধঃ, ভোগঃ বিষয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি, সুখ দুঃখ সংবিচ্চ, জাতিশ্চ, আয়ুশ্চ, ভোগাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। '

অন্বয়ঃ। মূলে সতি জাত্যায়ুর্ভোগ (রূপঃ) তদ্বিপাকঃ ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ক্লেশরূপে কর্ম্মাশয়স্য মূলে সত্যেব কর্ম্মাশয়স্ত বিপাকঃ ফলং ভবতি, ক্লেশাশ্চ বাসনারূপা এবং জন্মাদিবিপাক কারণং। বিপাকস্ত স্বরূপমাহ জাত্যায়ুর্ভোগা ইতি, জাতির্জন্ম, আয়ুর্জীবনকালঃ ভোগঃ সুখ দুঃখাত্মকশব্দাদিবৃত্তিঃ।' নতু সুখাদি সাক্ষাৎকার এবাত্রভোগঃ তে হ্লাদ পরিতাপ ফলা ইত্যুত্তর সূত্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত্রোচ্যতে বিবিধ যোনি হেতুশ্চ শুভাশুভ-কর্ম্মসু যত্র রাগাদিরন্তকালে উদ্বুদ্ধ তিষ্ঠতি মরণোত্তরং

তামেব যোনিং জীবঃ প্রাপ্নোতি, নেতরা মিত্যন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ম্মবত্রা-গাদি দোষোপি বিপাক হেতুঃ। ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। যতক্ষণ অবধি কর্ম্মাশয়ের মূল ক্লেশ অনভিভূত অবস্থায় থাকিবে, অর্থাৎ প্রবল অবস্থায় থাকিবে, ততক্ষণ অবধি ঐ কর্ম্মসমূহের বিপাক অর্থাৎ ফলস্বরূপ জাতি, আয়ু এবং ভোগও থাকিবে।

সমালোচন। জাতি বলিতে মনুষ্যত্ব, গোত্ব, পশুত্ব, ইত্যাদি ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ইহারাও জাতি; আয়ু বলিতে জীবিত কাল, বাঁচা; ভোগ বলিতে বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান কারণ ভোগ, এই কথাটী তিন প্রকারে সাধ্য হইতে পারে, (১ম) কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয় যোগে অর্থ—যাহা ভোগ করা যায়—বিষয়; (দ্বিতীয়) করণ বাচ্য প্রত্যয়যোগে অর্থ—যাহা দ্বারা ভোগ করা যায়—ইন্দ্রিয়; (তৃতীয়) ভাববাচ্য প্রত্যয় যোগে অর্থ ধাত্বর্থ (ক্রিয়া) অনুভব মাত্র। ইহারা আবার প্রত্যেকে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি পুণ্যকর্ম্মের বিপাক বা ফল এবং অপকৃষ্টগুলি পাপকর্ম্মের বিপাক বা ফল। যতক্ষণ অবধি নিজের উপর ক্লেশের অধিকার বা প্রভুত্ব থাকে, ততক্ষণই আমাদের পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের ভোগ থাকে, ক্লেশ ক্ষীণ হইলে, আর সে ভোগ থাকে না। ইহাই সূত্রের অর্থ। এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ক্লেশ থাকাতেই কর্ম্মাশয় অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ পরিণাম আরম্ভ হয়, ক্লেশের উচ্ছেদ হইলে আর তাহাদের পরিণাম হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যেমন তণ্ডুল তুষদ্বারা আবৃত থাকিলে অথবা তাহার বীজ বা অঙ্কুরোৎপাদনী শক্তি বিনষ্ট না হইলে, উহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয়, কিন্তু উহার তুষাবরণ না থাকিলে অথবা বীজ বা অঙ্কুরোৎপাদনী শক্তি বিনষ্ট হইলে, যেমন তাহা হইতে আর অঙ্কুর উদ্গত হয় না,—সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত ক্লেশের সংযোগ থাকিলেই এবং সমাধি দ্বারা ঐ ক্লেশের বীজভাব দগ্ধ না হইলে উহাদের পরিপাক হয় এবং ক্লেশের সংযোগ না থাকিলে অথবা ঐ ক্লেশের বীজভাব দগ্ধ হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের আর পরিপাক হয় না। সেই পরিপাক তিন প্রকার জাতি, আয়ু এবং ভোগ। (পুণ্য বা পাপ) কর্ম্ম জন্ম প্রভৃতির মূল, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিশেষ বলা

হইতেছে। সেই বিশেষ বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার চারিটি বিকল্প বা সন্দেহ করিতেছেন! (১ম) একটি কর্ম্ম এক জন্মের কারণ? (২য়) কিম্বা এক কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ? (৩য়) অথবা অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ? (৪) কিম্বা অনেক কর্ম্ম এক জন্মের কারণ? এই চারিটি সন্দেহ করিয়া ভাষ্যকার ক্রমশঃ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। এক একটি কর্ম্ম এক একটি জন্মের কারণ নয়! যদি বল কেন? তাহার উত্তর এই যে, অনাদিকাল হইতে কর্ম্ম সকল সঞ্চিত হইয়া অপরিমিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি কর্ম্মের ফল যদি একটি জন্ম হয়, তাহা হইলে যে সকল কর্ম্ম অভুক্ত অর্থাৎ যাহাদের অদ্যাপি কোন পরিপাক হয় নাই, এবং ঐহিক অর্থাৎ সেই বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের মধ্যে কাহার কি ফল হইবে, সে বিষয় কোন নিয়ম না থাকায়, কর্ম্ম ফলের অনিশ্চিততা প্রযুক্ত লোকের আর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি না হইতে পারে। কথাটা একটু ভালক'রে বুঝা উচিত। সৃষ্টির প্রথম হইতে মনুষ্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে সৃষ্টি অনাদি সুতরাং সেই অনাদি কাল হইতে এক একটী মনুষ্যের অসংখ্য কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছে। সেই অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে একটি কর্ম্মের ফল যদি একটি জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই একটী কর্ম্ম ভিন্ন অপর অনন্ত কর্ম্ম অভুক্ত অর্থাৎ তাহাদের ফল ফলিতে বাকি থাকে। আবার এদিকে জন্মগ্রহণ করিয়াই মনুষ্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য। এক্ষণে সেই অভুক্ত অনন্ত কর্ম্মের এক একটি করিয়া প্রথম ফল ভোগ হইবে, তাহার পর ঐহিক অর্থাৎ সেই বর্ত্তমান জন্মের অসংখ্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল হইবে; অথবা ইহার বিপরীত হইবে, এরূপ কোন নিয়ম না থাকায়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম ফল লাভের প্রতি একটি স্বাভাবিক হতাশতা উৎপন্ন হয়; কাজেই ইহ জন্মে আর কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বাস্তবিক তাহা নয়, কারণ শীঘ্র শীঘ্র ফল প্রাপ্তির আশাতেই লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এক কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ, এ কথাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ সৃষ্টিকাল হইতে মনুষ্য অসংখ্য কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে এক একটি কর্ম্মই যদি অনেক জন্মের কারণ হয়, তবে এত কর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়া পড়ে যে তাহাদের সকলের ফল ভোগ অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে অনেক

কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ হইলে ক্ষতি কি? এ কথাও বলিতে পার না; কারণ এক কালে অনেক জন্ম হইতেই পারে না, কর্ম্ম সকল ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়াই হয়; এক্ষণে এক একটি কর্ম্মের ফল এক একটি জন্ম বলিলে, পূর্ব্বোক্ত দোষই আসিয়া পড়ে। অতএব এ বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে মরণ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে যে সকল পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা সকলে স্ব স্ব কারণাদি অনুসারে প্রধান অপ্রধান ভাবে একটি রাশি বা গুচ্ছাকারে অবস্থিত থাকে। পরে মরণকাল উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মের ভোগ সমাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মের বল ক্ষীণ হওয়ায়, ঐ রাশীভূত কর্ম্ম সময় পাইয়া 'প্রবল হইয়া' একযোগে আপন আপন ফল দিবার নিমিত্ত শীঘ্র মৃত্যু সাধন করিয়া আরও বলবান্ হয় এবং আর একটি জন্মের সাধন করে এবং তাহাতেই আপন আপন শক্তি অনুসারে ফল প্রদান করে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহার সার সংগ্রহ এই যে, একটি একটি কর্ম্মকে এক একটি জন্মের কারণ বলা যায় না, কারণ মনুষ্যের এক একটি জন্মে অসংখ্য কর্ম্ম। সৃষ্টিকাল হইতে কত জন্ম হইয়া আসিতেছে তাহার নির্ণয় নাই। সুতরাং কর্ম্মও অসংখ্য ও অনন্ত। সেই পূর্ব্বসঞ্চিত অনন্ত কর্ম্মের মধ্যে প্রত্যেক কর্ম্মের ফল যদি এক একটি জন্ম হয়, তাহলে ফল লাভের প্রতি হতাশ্বাস হইয়া ইহজন্মে আর কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কেন না শীঘ্র ফললাভের আশা না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি অসম্ভব, কাজেই শাস্ত্রাদির উপদেশ সকলই বিফল হইয়া পড়ে।

এক একটি কর্ম্ম হইতে এক একটি জন্ম স্বীকার করিলে, যখন দোষ হইল, তখন এক একটি কর্ম্ম হইতে অনেক জন্ম স্বীকার করাত আরও দোষের। এবং অনেক কর্ম্ম হইতে অনেক জন্ম একথাও বলা যায় না, কারণ এককালে অনেক কর্ম্ম হইতেই পারে না। অথচ কর্ম্ম হইতে জন্ম ইহা একেবারে স্বতঃসিদ্ধের মত সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং এ বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, যে মনুষ্যের জন্ম অসংখ্য হউক এবং তজ্জন্য কর্ম্ম অনন্ত হৌক্ তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রতি জন্মে উৎপত্তি

ক্ষণ হইতে মরণ ক্ষণের পূর্ব্বক্ষণ অবধি মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্ম পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁল পাকাইয়া অথবা একটি গুচ্ছাকারে অবস্থিতি করে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ঐ পুঞ্জীভূত কর্ম্মের মধ্যে সকল কর্ম্ম কিছু সমান ভাবে প্রবল হইতে পারে না, কারণ অনুষ্ঠানের সামগ্রী, বিধি, রীতি ও কাল, দেশ, পাত্রাদি অনুসারে কোন কর্ম্ম প্রধান এবং কোন কর্ম্ম অপ্রধান বলিয়া গণ্য হয়। মরণকালে পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্মরাশির ভোগ সমাপ্তি হওয়ায় তাহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন ঐহিক কর্ম্মরাশি প্রবল হইয়া আপন অনুযায়ী ফল প্রদানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু আনয়ন করে এবং আর একটি জন্মের উৎপাদন করে। মোট কথা একএকটি কর্ম্মে একএকটি জন্ম হয় না, অনেক কর্ম্মেও অনেক জন্ম নয়; পূর্ব্বজন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মরাশি একীভূত হইয়া পরজন্মের সাধন করে এবং ঐ জন্মে আপন আপন শক্তি অনুসারে ফল প্রদান করে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন মরণ শব্দের অর্থ স্থূল দেহ হইতে লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহের অপসরণ মাত্র, নাশ নয়।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল কর্ম্ম হইতে কি কেবল জন্মই হয় আর কিছু নয়? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, সেই জন্ম সেই কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধায়ুঃ অর্থাৎ উৎপন্ন ব্যক্তির জীবন কালের নির্দ্ধারণ করে এবং সেই জীবন কালের মধ্যে কিরূপ সুখ দুঃখের অনুভব হইবে, তাহারও নিয়ম করে অর্থাৎ ভোগেরও নির্ণয় করে কাযেই কর্ম্ম সকল জন্ম, আয়ুঃ এবং ভোগের হেতু হওয়ায় ত্রিবিপাক নামে অভিহিত হয়।

সমষ্টিভূত কর্ম্ম হইতে এক একটি জন্ম হয় বলিয়া উহাদিগকে 'একভবিক' বলে; একভবিক শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ একটি জন্ম যাহাতে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যদি এইরূপ হয়, তবে স্বর্গী বা নারকীর আবার জন্ম হয় কেন? কারণ স্বর্গ বা নরকভোগের সময় ত তাহাদের কোন কর্ম্ম নাই, এদিকে তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের স্বর্গ বা নরকভোগেই পর্য্যবসান হয়। ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, তুমি এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের কেবল স্বর্গ বা নরকভোগে পর্য্যবসান হয় না, তাহার পর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণাদি অবধি তাহাদের জের চলে।

অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরে ফলদায়ী কর্ম্ম সকল ত্রিবিপাকারম্ভী

অর্থাৎ জাতি আয়ু এবং ভোগের কারণ এই কথা বলা হইল, এক্ষণে দৃষ্ট জন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে যাহাদের ফলভোগ হয় এইরূপ কর্ম্মের কথা ভাষ্যকার বলিতেছেন—দৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্ম সকল প্রায় এক বিপাকারম্ভী হয়, একমাত্র ভোগই তাহাদের ফল, কখন কখন বা দ্বিবিপাকারম্ভীও হয়, আয়ু এবং ভোগ এই দুইটি ফল দেখা যায়। যেমন নহুষ রাজার পাপ কর্ম্মের কেবল সর্পজাতির ভোগেই ফল লাভ হয় এবং নন্দীশ্বর স্বীয় পুণ্য কর্ম্মের বলে দীর্ঘায়ু এবং জাতির ভোগ এই দুইই প্রাপ্ত হন *। মনুষ্যদেহের যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি পরিণামের ন্যায় নহুষ ও নন্দীশ্বরের সর্পাকারে বা দেবাকারে দেহের পরিণাম হয়, ওরূপ পরিণামকে জন্মান্তর বলা যায় না সুতরাং জাতি লাভ তাহাদের কর্ম্মের ফল নয়।

কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল মনুষ্যের কর্ম্মসমূহ যেমন এক-ভবিক অর্থাৎ এক একটি জন্মের কারণ, তেমনি বাসনা সকলকেও 'এক-ভবিকী' কেন না বলা যায়? এবং তাহা বলিলেই বা দোষ কি? দোষ এই যে বাসনা সকলকে এক-ভবিকী বলিলে প্রতি জন্মে ভিন্ন ভিন্ন বাসনার কল্পনা করিতে হইবে, সূত্রকার যে বাসনা সকলকে নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার অনুপপত্তি হয়। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন—ক্লেশ ও কর্ম্মের বিপাক হইতে চিত্তের যে সকল বৃত্তি বা পরিণাম হয় সেই পরিণাম জন্য সংস্কারের নাম বাসনা। এই বাসনা সকল অনাদি কাল হইতে চিত্তে সঞ্চিত হইয়া চিত্তকে উহার আকার পুষ্ট করিতেছে। সেই সকল নানারূপ বাসনা দ্বারা নানা রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্রের মত চিত্ত সর্ব্বদা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, এবং মৎস্যের জাল যেমন সর্ব্বাঙ্গে গ্রন্থি ব্যাপ্ত, চিত্তও ঐ সকল বাসনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই সকল বাসনাকে অনেক-ভব-পূর্ব্বিকী বলা হয় অর্থাৎ ইহারা এক আধটি নয় অসংখ্য পূর্ব্বজন্ম হইতে সঞ্চিত। এই জন্য মনুষ্য জন্মের পরই স্ব স্ব প্রবল বাসনানুসারে কেহ বা গো জন্ম প্রাপ্ত হয়, কেহ বা গন্ধর্ব্ব জন্ম প্রাপ্ত হয়; আর কাহার বা গো জন্মের পরই গন্ধর্ব্ব জন্মের প্রাপ্তি হয়; বাসনা সকল যদি এক-

* আজ কাল মহাভারত এবং পুরাণাদির বঙ্গভাষায় নানাপ্রকার অনুবাদ হওয়ায় এসকল গল্পের সবিস্তর বর্ণন অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। ইতি প্রবন্ধলেখক।

ভবিকী হইত, তাহা হইলে মনুষ্য জন্মের পর কেবল মনুষ্য জন্ম হইত, অন্য প্রকার জন্ম হইতে পারিত না, কারণ মনুষ্য জীবন কালে অন্য জাতীয় বাসনার উদ্ভবই হয় না। বাসনা সকলকে পণ্ডিতেরা জীবরূপ মৎস্যের বন্ধনকারী চিত্তরূপ জালের গ্রন্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' এই শ্লোকে হৃদয়গ্রন্থি শব্দের অর্থ বাসনা মাত্র, অহঙ্কারাদি নয়। বাসনা সকল অনেক ভবিকী এবং কর্ম্মাশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল এক-ভবিক অতএব কর্ম্মাশয় এবং বাসনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের স্মৃতির হেতু সংস্কার সমুদয়ই বাসনা এবং অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল এক-ভবিক। উহারা আবার দুই প্রকার, কাহারও বিপাক বা পরিণাম একই নিয়মে হয় এবং কাহার কাহারও বিপাক বা পরিণাম এক নিয়মে হয় না। দৃষ্ট অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে যাহাদের ফল ভোগ হয়, এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণাম একই নিয়মে হয়। এবং অদৃষ্ট অর্থাৎ জন্মান্তরে যাহার ফল ভোগ হয়, এরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিপাক বা পরিণাম এক নিয়মে হয় না, তাহাদের পরিণাম তিন প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমে, যাহারা ফল প্রদান করে নাই তাহাদের বিনাশ, দ্বিতীয়, প্রধান কর্ম্মের সহিত তাহার অঙ্গীভূত কর্ম্ম সকলের ফল প্রাপ্তি, তৃতীয় যাহাদের বিপাক নিয়ত আছে, এইরূপ প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া অবস্থান। যথাক্রমে ভাষ্যকার উপরোক্ত কথাগুলির উদাহরণ দেখাইয়াছেন। প্রথম ফল প্রদান না করিয়াই কর্ম্মের নাশ—যেমন আলোকের প্রকাশে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারের নাশ হয়, সেইরূপ পুণ্য কর্ম্মের উদয়ে তৎক্ষণাৎ পাপ কর্ম্মের নাশ হয়। দ্বিতীয়, প্রধান কর্ম্মের ফলের সহিত অপ্রধান কর্ম্মের ফল লাভ হয়; তদ্বিষয় ভাষ্যকার পঞ্চশিখাচার্য্যের একটি বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য্য এই, যদি প্রধান কর্ম্ম পুণ্যজনক হয়, তাহা হইলে ঐ অপ্রধান কর্ম্ম জন্য পাপ অতি অল্পমাত্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনীত হয়, আর যদি দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিস্মৃতি হয়, তবে সে পাপ উৎকট দুঃখপ্রদ হয় না, তাহা সহনীয় হয়, যেমন পুণ্য রাশির মধ্যে অল্প দুঃখ সহ্য হয়। তৃতীয় প্রধান দ্বারা অপ্রধানের অভিভূতি—অতি সহজেই বুঝা যায়।

গুরু নানক কৃত জপজী বা জপ পরমার্থ।

এক ওঁকার সত্ নাম করতা পুরুষ,

নির্ভউ নির্বৈব অকাল-মূরত,

অজুনি সৈভং গুরু প্রসাদ ।জপ।*

আদি সচ্, জুগাদি সচ, হৈ ভী সচ্, নানক, হোসী ভী সচ্ ।।

সোচে সোচ ন হোবৈ, যে সোচী লখবাব,

চুপে চুপ ন হোবৈ, যে লাই রহা লিবতাব।

ভুখিয়া ভুখ ন উতবি, জে বনৃনা পুরিয়া ভার।†

সহস সিয়ানপা লখ হোবে ইক ন চলে নাল।

কিবঁ সচিয়ারা হোবৈ? কিবঁ কুড়ে তুটে পাল?

হুকুমী বজাই চলনা, নানক, লিখিয়া নাল ॥১॥

অর্থ।

একমাত্র পবমাত্মা সত্যস্বরূপ, জগৎকর্ত্তা, অন্তর্যামী, নির্ভয়, বৈব-রহিত, অকালমূর্ত্তী, জন্মরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ, এবং সৎগুরুব (অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্ববেবই) কৃপায় প্রাপ্য। তাঁহাবই জপ করা কর্ত্তব্য। তিনি সৃষ্টির আদিতে

---

* জপজীর এই প্রথম পদ শিখ ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই প্রতি প্রত্যূষে কেহ দশ বার, কেহ বা শত বার জপ করিয়া থাকেন।

জপজীর প্রায় প্রতি পদের অন্তে নানক নাম ভণিতা আছে; উহার অর্থ "নানক বলিতেছেন"।

"গুরু প্রসাদ"। কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে উত্তম পার্থিব গুরুর উপদেশে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব। পবন্ত নানক "গুরু" ও "সৎগুরু" শব্দ ঈশ্বরকে প্রয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার ভাব এই যে ঈশ্বরের প্রসন্নতা ব্যতীত ঈশ্বব প্রাপ্তি হয় না।

† কেহ কেহ এই পংক্তির অর্থ এরূপ করিয়াছেন যথা "স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের রাজত্ব লাভ হইলেও মনুষ্যের বিষয় ভোগ লালসা তৃপ্ত হয় না।"

কেহ কেহ এরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা পুরির (লুচীর) বোঝা বাঁধিলে ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ ঐ লুচী উদরস্থ হওয়া আবশ্যক। একই পংক্তিতে ক্ষুধা এবং পুরির সংযোগ থাকায় এই অর্থ উপাদেয় সন্দেহ নাই।

হুকমী হোবন্ আকার, হুকুম ন কহিয়া জাই,
হুকমী হোবন্ জীব, হুকুমী মিলে বড়িয়াই।
হুকুমী উত্তম নীচ, হুকুমী লিখি দুখসুখ পাবেহ্,
ইকনা হুকমী বখশীস, ইক হুকুমী সদা ভবাঁবেহ্।
হুকুমে অন্দর সভকো, বাহর হুকম ন কোই,
নানক, হুকুমৈ জে বুঝেত ইউঁমেঁ কহে ন কোই ॥২॥

অর্থ।

বিদ্যমান ছিলেন, যুগের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন, এখনও বিদ্যমান আছেন, ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকিবেন।

লক্ষ বার চিন্তা করিলেও তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান হয় না, তিনি চিন্তার অতীত; কিন্তু মৌন অবলম্বন করিতেও পারা যায় না, কারণ তাঁহার প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবলোক প্রভৃতি প্রাপ্তি হইলেও তাঁহাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না; সহস্র বা লক্ষ চাতুরি বা বুদ্ধিমত্তাও এবিষয়ে কার্য্যকরী হয় না। তবে কি প্রকারে সত্য জ্ঞান লাভ হইতে পারে, এবং কি উপায়েই বা মিথ্যার আবরণ ছিন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে নানক লিখিতেছেন, যে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করাই ইহার একমাত্র উপায়। ১।

তাঁহারই আজ্ঞায় আকার সকল সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার আজ্ঞার পরিমাণ স্থির হয় না। তাঁহারই আজ্ঞায় জীব উৎপন্ন এবং (স্বাধীনতারূপ) শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহার আজ্ঞাতেই জীব উত্তম বা নীচ ভাব * প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহারই নিয়ম অনুসারে দুঃখ সুখ প্রাপ্ত হয়। একজন তাঁহার আজ্ঞা প্রভাবে পুরস্কার (শান্তি) পাইতেছে এবং অপরে সদা মিথ্যা ভ্রমণ করিতেছে (কষ্ট পাইতেছে)। সকলই তাঁহার আজ্ঞার অধীন, কিছুই উহার বহির্ভূত নহে; যে তাঁহার আজ্ঞা বুঝিতে পারে, তাহার "আমি আমি" অহঙ্কার থাকে না। ২।

* উত্তম ও নীচ অর্থে কেহ কেহ মনুষ্যযোনি এবং নীচযোনি বুঝিয়াছেন।

গাবে কো তাণ হোবে কিসি তাণ,
গাবে কো দাত জানে নিসান।
গাবে কো গুণ বড়িয়াইয়া চার।
গাবে কো বিদ্যা বিষম বিচার।
গাবে কো সাজ কর তনু খেহ্।
গাবে কো জীব লৈ ফিরি দেহ্।
গাবে কো জাপৈ দিসৈ দূর,
গাবে কো বেখে হাদরা হদূর।
কথ না কথিন আবে তোট,
কথ্ কথ্ কথ্ কোট কোট কোট॥
দেঁদা দে লৈন্দে থক্ পাহ্,
জুগা জুগন্তর খাহী খাহ্।
হুকুমী হুকুম চলাবে রাহ।
নানক বিগসৈ বে-পরবাহ্ ॥৩॥

অর্থ।

কাহার এত শক্তি আছে যে তাঁহার শক্তি বর্ণন করিবে? কেহ তাঁহার দান (কৃপা) উপলক্ষ করিয়া পূজা করে। কেহ তাঁহার সুন্দর গুণ ও মহিমা স্মরণ করিয়া পূজা করে। কেহ বিদ্যার কঠিন বিচার দ্বারা, (অর্থাৎ ঈশ্বরকে জ্ঞানময় কল্পনা করিয়া) পূজা করে। কেহ বা শরীরে ভস্ম লেপন ও অন্যান্য বেশ বিন্যাস দ্বারা তাঁহার পূজা করে। কেহ জীবের পুনঃ দেহ প্রাপ্তি উপলক্ষ করিয়া পূজা করে, (অর্থাৎ পুনর্জন্ম না হয় এই প্রার্থনা করে)। কেহ তাঁহাকে দূরস্থিত ভাবিয়া চিন্তা করে, কেহ তাঁহাকে সম্মুখস্থিত দেখিয়া পূজা করে। উপাসকদিগের বাক্য বিন্যাসের ত্রুটি নাই। কোটি কোটি (স্তব) কথিত হইয়াছে। সেই দাতার দান লইয়া গ্রহীতা ক্লান্ত হইতেছে, (অর্থাৎ ঈশ্বরের দয়ার অন্ত নাই)। যুগ যুগান্তর

* তান—শক্তি।

সাচা সাহিব, সাচা নাঁউ, ভাখিয়া ভাউ অপার, *
আখেহ্ মংগেহ্ দেহ্ দেহ্, দাত করে দাতার।
ফের কি অগে রখিএ, জিত্ দিসৈ দরবার?
মুহে কি বোলন বলিএ, জিত্ সুন ধরে পিয়ার?
অমৃত বেলা সচ্ নাঁউ বডিয়াই বিচার,
করমী আবৈ কপড়া, নদরী মোক্ষ দুয়ার। †
নানক, এবৈঁ জানিএ সভ্ আপে সচিআর ॥৪॥

অর্থ।

ভক্ষক জীব তাঁহারই অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছে। সেই প্রভুর আজ্ঞা (নিয়ম) জগতকে চালিত করিতেছে, তিনি স্বয়ং বিকাশমান এবং তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ৩।

পরমাত্মা সত্য, তাঁহার নাম সত্য, তাঁহার ভাব বর্ণন অসাধ্য। সকলে তাঁহার নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছে, সেই পরম দয়ালু সকলকেই কৃপা করিতেছেন।

(প্রশ্ন) তবে কি দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে রাখিলে তাঁহার দর্শন মিলে? মুখে কি বাক্য (স্তব) উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রীতিসাধন হয়?

(উত্তর) অতি প্রত্যূষে তাঁহার সত্য নাম জপ, এবং তাঁহার মহিমার জ্ঞান বা উপলব্ধি, ইহাই তাঁহার পূজা। কর্ম্ম অনুসারে জীব অধ্যাত্ম শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। নানক বলেন সেই সম্পূর্ণ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে এই প্রকার জানিও। ৪।

---

* কেহ অর্থ করিয়াছেন—তাঁহার ভাব বর্ণন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, অর্থাৎ পূজা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন।

† এই পংক্তির অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। "কপড়া" অর্থে বস্ত্র, আধ্যাত্মিক শরীরকে জীবের বস্ত্র বা আচ্ছাদন কল্পনা করা হইয়াছে। ফলতঃ এস্থলে পাঠ ব্যতিক্রমে অন্য কোন শব্দ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নানকের মতে জীব আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে উত্তম বা অধম দেহ লইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না, কেবল ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টিই মোক্ষলাভের কারণ। অতএব অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদন ভিন্ন ঈশ্বর ভক্তি ও উপাসনা মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য।

থাপিয়া ন জাই কিতা ন হোই।
আপে আপ নিরঞ্জন সোই।
জিন সেবিয়া তিন্ পাইয়া মান্,
নানক, গাবী ঐ গুণী নিধান।
গাবে স্তুনে মন রখি ভাউ,
দুখ পরিহর সুখ ঘর লে জাই॥
গুরমুখী নাদং, গুরমুখী বেদং, গুরুমুখী রহিয়া সমাই,
গুরু ঈসর, গুরু গোরখ, বর্মা গুরু, পার্ব্বতী মাই।
জে ইউ জানা আখ্যা নাহি? কহনা কথন ন জাই,
গুরাঁ ইক দেহি বুঝাই,
সভনা জীয়া কা ইক দাতা, সো মৈ বিসরি ন জাই॥৫॥

অর্থ।

তিনি স্থাপিত বা নির্ম্মিত হয়েন না, তিনি স্বয়ং নিরঞ্জন (নির্ম্মল বা গুণরহিত)। যে তাঁহার সেবা করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। সেই গুণ-নিধানের গুণ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। মনোমধ্যে ভক্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রবণে দুঃখ দূর হইয়া সুখ লাভ হয়। সেই মুখ্য গুরুই (পরমাত্মা) আমার নাদ, তিনিই আমার বেদ, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই শিব, তিনিই গোরক্ষনাথ, তিনিই ব্রহ্মা এবং তিনিই পার্ব্বতী মাতা। (অর্থাৎ কেহই ঈশ্বরকে প্রকৃত অবগত নহেন, তবে সকলেই যথাশক্তি পরমাত্মার আংশিক মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন)। আমি যদি তাঁহাকে জানিতাম, তো বলিতাম না কি? বাক্যে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত হয় না। পরন্তু আমি সেই মহাগুরু ঈশ্বরের কৃপায় এইমাত্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে তিনি সকল জীবের একমাত্র দাতা। আমি তাঁহাকে ভুলিব না। ৫।

---

* গোরক্ষনাথের এক সম্প্রদায় আছে, যাহারা শঙ্খনাদ করিয়া ঐ নাদকে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূজা করে।

তীরথি নাঁবা জে তিস্ ভাবাঁ, বিন্ ভাণে কি নাঁই করি ?
জেতী সিরঠী উপাই বেখা, রিনু করমা কি মিলে লই ?
মতি বিচ রতন, জবাহর মাণিক, জে ইক গুরুকী শিখ সুনী,
গুরাঁ ইক দেহি বুঝাই,
সভনা জীয়া কা ইক দাতা, সো মৈ বিসরি ন জাই ॥ ৬ ॥
জে জুগ চারে আরজা হোব দসুনী হোই,
নবা খণ্ড বিচ জানিএ, নাল চলে সভ কোই, *
চঙ্গা নাঁউ রখাইকে, যস্ কীরতি জগ লেই,
জে তিস্ নদরী ন আবে, ত বাত পুছে ন কোই।
কীটাঁ অন্দর কীট কর দোসী দোস ধরে।
নানক, নিগুণী গুণ করে, গুণবন্তিয়াঁ গুণ দে।
তেহা কোই ন সুরুই জি তিস্ গুণ কোই করে ॥ ৭ ॥

অর্থ

তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাবই তীর্থ স্নানের ফল প্রদান করে; ভক্তি বিনা তীর্থ স্নানে ফল কি? সৃষ্টির উপায় বস্তু যত কিছু আমরা দেখিতে পাই, কর্ম্ম বিনা উহার মধ্যে কোন্‌টী প্রাপ্য? (অর্থাৎ সকল লাভই কর্ম্মাধীন, অতএব ঈশ্বর ভক্তি রূপ কর্ম্ম করিলেই মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়।)

মুক্তামালার মধ্যে রত্ন মণি মানিক্যের ন্যায়, গুরুর নিকট এক উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; সেই সৎগুরু আমাকে বুঝাইয়াছেন যে সকল জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র পরম পুরুষ; তাঁহাকে আমি ভুলিব না। ৬।

যদি কাহারো আয়ুঃ চারি যুগ ব্যাপী হয়, অথবা উহারও দশ গুণ হয়; যদি নব খণ্ডের মধ্যে তাহার নাম ঘোষিত হয় এবং সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া (প্রসাদ লাভের জন্য) অনুগমন করে; যদি সে জগতে প্রশংসা স্থাপন

---

* ঐন্দ্র, কসেরু, তাম্র পর্ণ, কুমারিকা, নাগ, সৌম্য, বারণ প্রভৃতি নব খণ্ড।

সুনিএ সিধ পীর সুরনাথ,
সুনিএ ধরতী ধবল আকাশ.
সুনিএ দ্বীপ লোঅ, পাতাল,*
সুনিএ পোহ্ ন সকে কাল।
নানক ভগতা সদা বিগাস
সুনিএ দুখ পাপ কা নাস ॥ ৮ ॥

অর্থ

এবং যশ কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে; তথাপি যদি তাহার দৃষ্টি পরমাত্মার প্রতি না থাকে, তো তাহার সকলই বৃথা। এরূপ ব্যক্তিকে কীটের মধ্যে কীট এবং দোষীর মধ্যে দোষী গণনা করা উচিত। নানক বলেন, ঈশ্বর-ভক্তি গুণহীন ব্যক্তিকে গুণ প্রদান করে এবং গুণবান ব্যক্তির গুণও তিনিই দান করিয়া থাকেন; ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ দয়ালু কাহাকেও দেখিতে পাই না (অর্থাৎ ঈশ্বরের দয়া গুণী নির্গুণ সকলের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে)। ৭।

নানক নিম্নোক্ত চারি পদে ঈশ্বরের "শ্রবণ" এবং তৎপরবর্ত্তী চারি পদে ঈশ্বরের "মননের" মহিমা বর্ণন করিতেছেন।

তাঁহার আজ্ঞা বা নাম শ্রবণে জীব সিদ্ধপীর এবং দেবতা হইয়াছে; তাঁহার আজ্ঞাতেই পৃথিবী, পর্ব্বত, আকাশ, দ্বীপ, লোক, এবং পাতাল সমূহ সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করিলে কাল স্পর্শ করিতে পারেনা (অর্থাৎ লোক মুক্তি লাভ করে)। তাঁহার ভক্তের নিকট তিনি সর্ব্বদা বিকাশমান। তাঁহার নাম শ্রবণে দুঃখ এবং পাপের নাশ হয়। ৮।

---

* দ্বীপ—জম্বু, শাক, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদক, পুষ্কর।
লোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য।
পাতাল—তল, অতল, বিতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

সুনিএ ঈসর বমা ইন্দ,
সুনিএ মুখ সলাইনমন্দ,
সুনিএ জোগ জুগতি তন ভেদ,
সুনিএ সাসত সিম্রিতি বেদ।
নানক ভগতা সদ বিগাস
সুনিএ দুখ পাপ কা নাস ॥ ৯ ॥
সুনিএ সৎ সন্তোষ গিয়ান,
সুনিএ অঠসঠী কা ইসনান,
সুনিএ পঢ় পঢ় পাবে মান,
সুনিএ লাগে সহজ ধিয়ান।
নানক ভগতা সদা বিগাস
সুনিএ দুখ পাপ কা নাস ॥ ১০ ॥
সুনিএ সরাঁ গুণাঁ কে গাহ্,
সুনিএ সেখ পীর পাতসাহ,

অর্থ

তাঁহারই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শিব, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা তাঁহার নাম শ্রবণে মন্দ ব্যক্তি অত্যন্ত প্রশংসা যোগ্য হইয়াছে এবং প্রশংসা যোগ্য ব্যক্তি প্রধানত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞাতেই যোগের যুক্তি, শরীরের ভেদ জ্ঞান, এবং শাস্ত্র স্মৃতি এবং বেদের জ্ঞানোপযোগিতা প্রতীত হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্তের নিকট ইত্যাদি। ৯।

তাঁহার শ্রবণে (আজ্ঞা পালনে) সত্য সন্তোষ ও জ্ঞান লাভ হয়; ৬৮ তীর্থ স্নানের ফল হয়; শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ধ্যান ও সমাধিতে মন অনুরক্ত হয়। তাঁহার ভক্তের নিকট ইত্যাদি। ১০।

ঈশ্বর নাম শ্রবণে গুণ-সরোবরে অবগাহন করার ফল হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকার গুণ লাভ হয়। সামান্য মনুষ্য সেখ পীর ও বাদসাহ হয়; অন্ধ পথ প্রাপ্ত হয়, (অর্থাৎ তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়) এবং অতি গভীর

সুনিএ অন্ধে পাবে রাহ্,
সুনিএ হাত হোবে অসগাহ্ ।
নানক ভগতা সদা বিগাস, ।
সুনিএ দুখ পাপ কা নাস ॥ ১১ ॥
মন্নে কী গতি কহী ন জাই,
জে কো কহে পিছে পছতাই,
কাগদ কলম ন লিখন, হার,
মন্নে কী বহি করন বিচার ।
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই,
জে কো মন্ন জানে, মন্ন কোই ॥ ১২ ॥
মন্নে সুরতি হোবে মন বুধ,
মন্নে সগল ভবন কী সুধ,
মন্নে মুহি চোটা ন খাই,
মন্নে যম কে সাথ ন জাই ।
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই,
জে কো মন্ন জানে মন্ কোই ॥ ১৩ ॥

অর্থ

দরাশি হস্ত পরিমিত প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ অতি কঠিন বিষয়ও সহজ বলিয়া বোধ হয়। ভক্তের নিকট তিনি সর্ব্বদা বিকাশমান রহিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রবণে দুঃখ দূর এবং পাপ নষ্ট হয়। ১১।

ঈশ্বর মননের (ধ্যানের) ফল বর্ণনাতীত; যদি কেহ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা বৃথা হইবে। কাগজ ও কলম লিখিতে সমর্থ হয় না; কাহারও সমর্থ নাই যে বসিয়া মননের বিচার করে। তাঁহার নামের এতই পবিত্র মহিমা যে, যে ব্যক্তি মনন করিতে জানে, সেই মনন করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মননের ফল জানিতে পারিয়াছে, সে কখন মনন হইতে বিরত হয় না। ১২।

মননে সুরতির (চৈতন্য বা সুরুচি) এবং বুদ্ধির উদয় হয়, সকল ভবনের

মনুনে মারসি ঠাক * ন পাই,
মনুনে পতি সিউঁ পরগট জাই,
মনুনে মগ্ন চলে পন্থ, †
মনুনে ধরম সেতী সম্বন্ধ।
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই,
জে কো মনুন জানে মন সোই ॥১৪॥
মনুনে পাবে মোক্ষ দুয়ার,
মনুনে পরবারে সাধার, ‡
মনুনে তরে তারে গুরু সিখ,
মনুনে, নানক, ভবেঁ ন ভিখ।
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই,
জে কো মনন জানে মন সোই ॥১৫॥

অর্থাৎ

শুদ্ধিতে সাধন হয়, কখন সন্তাপে তাপিত হইতে হয় না, এবং মৃত্যুভয় থাকে না। ১৩।

ঈশ্বর মননে মননকারী ধর্ম্মপথে পদ স্খলিত হয় না; সম্মানের সহিত প্রকাশিত হয়; কর্ত্তব্য সম্পাদনে কুপথগামী হয় না; এবং ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (অর্থাৎ তাহার ধর্ম্মে প্রীতি হয়)। ১৪।

মননে মোক্ষ-দ্বার প্রাপ্তি হয়; পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়াও মোক্ষ পদবী প্রাপ্তি হয়; মননদ্বারা গুরু স্বয়ং ভবসাগর উত্তীর্ণ হন, এবং (উপদেশ

---

* ঠাক্—প্রতিবন্ধক।

† কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন "ঈশ্বর মননকারী মগ্ন হইয়া ধর্ম্ম পথে চলিয়া থাকে" অর্থাৎ ঈশ্বর গত চিত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

‡ এই পংক্তির নানাপ্রকার ব্যাখ্যা কথিত হয়। কেহ অর্থ করিয়াছেন যে "মননকারী আপনাকে ও পরিবারকেও উদ্ধার করেন।" পরন্তু সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গুরু নানকের কতদূর অনুমোদিত,এ বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে।

পঞ্চ পরবাণ পঞ্চ পরধান,
পঞ্চে পাবে দরগাহি মান,
পঞ্চে সোহে দর রাজান।
পঞ্চাঁ কা গুরু এক্ক ধিয়ান॥
জে কো কহে করে বিচার,
করতে কে করনে নাহি সুমার॥
ধবল ধর্ম্ম দয়া কা পুত,
সন্তোষ থাপি রখিয়া জিন্ সুত।
জে কো বুঝে হোবে সচিয়ার,
ধবলে উপরি কেতা ভার?
ধরতী হোর পরে হোর হোর,
তিস্তে ভার তলে কৌন জোর?

অর্থ

দান দ্বারা) শিষ্যকে উদ্ধার করেন। মনন করিলে ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে হয় না। ১৫।

শ্রবণ এবং মননকারী ব্যক্তি সাধুলোকদিগের মধ্যে প্রমাণ এবং প্রধান-রূপে গণ্য হন। তাঁহারা ঈশ্বর সমীপে বা পরলোকে সম্মিলিত হয়েন; তাঁহারা রাজদ্বারে শোভা বিস্তার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বিবেকী সাধু ঈশ্বরেই আত্মসমর্পণ করিয়া গৌরবান্বিত হন; ধ্যানই তাঁহাদের উপদেষ্টা।

বিচার করিয়া দেখ, সেই জগৎকর্ত্তার কার্য্যের সংখ্যা নাই। * ধবল ধর্ম্মের অপর নাম মাত্র, উহা দয়ার পুত্র, সন্তোষ-রূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার মর্ম্ম বুঝে, সে নিশ্চয় করিয়া দেখুক যে ধবলের

---

* সাধারণ বিশ্বাস এই যে পৃথিবী ধবল নামা বৃষের উপর স্থাপিত। কেহ কেহ বলেন ধবল বৃষ নহে, সুমেরু পর্ব্বত বা ধবলগিরি। নানক এই কুসংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, যে পৃথিবী ধর্ম্মের উপরই সংস্থাপিত আছে, অর্থাৎ এই জগত ঈশ্বরের নিয়মাধীন থাকিয়া প্রসন্নতা ভাব ধারণ করিয়া আছে।

জীব জাতি রঙ্গা কে নাম,
সভনা লিখিয়া বুড়ি কলাম।
এহ্ লেখা লিখি জানে কোই,
লেখা লিখিয়া কেতা হোই।
কেতা তাণ সুআলিহ রূপ
কেতী দাত জানে কৌন কুত ?
কীতা পসাউ একো কবাহ্
তিস্তে হোএ লখ দরিয়া ॥
কুদরতি কৌন কহা বিচাব,
বারিয়া না জাবাঁ একবার,
জো তুধ ভাবে সাই ভলিকার
তূঁ সদা সলামতি নিরঙ্কাব ॥১৬॥

অর্থ

উপর কত পরিমাণ ভাব স্থাপিত রহিয়াছে। এবং পৃথিবীর নিম্নদেশে যেমন ধবল বহিয়াছে, সেইরূপ ধবলেব নিম্নদেশেও অন্য কিছু অবশ্যই থাকিবে, এবং তাহারও নিম্নদেশে অন্য কিছু, এইরূপ অবশ্যই ক্রমে ক্রমে একবস্তু অন্য বস্তুকে ধারণ করিয়াছে। ভাল, সকলেব নিম্নভাগে থাকিয়া কোন শক্তি সকলকে ধারণ করিযা আছে ?

জীব, জাতি এবং উহাদের নানাবিধ বর্ণের বিষয় সকলেই বিচারপূর্ব্বক কত কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু উহারা কতপ্রকার ইহা কে গণনা করিতে সক্ষম ? তাঁহার শক্তিও সুন্দররূপ কে জানিতে পারে ? তাঁহার দয়ার পরিমাণ কে করিতে পারে ?

এই বিস্তীর্ণ সংসারকার্য্য তাঁহার একমাত্র ইচ্ছায় সমুদ্ভূত হইয়াছে। *

---

* কেহ কেহ আরবী "কবাহ্" শব্দের অর্থ "নিয়ন্তা পুরুষ" লিখিয়াছেন, এবং "একমাত্র নিয়ন্তা পুরুষ কর্ত্তৃক জগত রচিত হইয়াছে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

অসংখ জপ, অসংখ ভাউ,
অসংখ পূজা, অসংখ তপ তাউ।
অসংখ গ্রন্থ মুখ বেদ পাঠ,
অসংখ জোগ মন রহে উদাস,
অসংখ ভগতি, গুণ গিয়ান বিচার।
অংসখ সতী, অসংখ দাতার,
অসংখ সুর মুহ ভখসার,
অসংখ মোনি লিব লাই তার।
কুদরতি কৌন কহা বিচার,
বারিয়া না জাবা একবার
জো তুধ ভাবে সাই ভলিকার,
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥১৭॥

অর্থ

সেই ইচ্ছা বা সংকল্প হইতেই লক্ষ লক্ষ নদনদী সমুদ্র প্রভৃতি সৃজিত হইয়াছে। হে ঈশ্বর! তোমার শক্তি বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম? আমি তোমার নিকট একবার মাত্র উৎসর্গিত (বলি প্রদত্ত) হইবার উপযুক্ত নহি। তুমি যাহা চিন্তা কর, তাহাই জীবের পক্ষে মঙ্গলময়। হে নিরাকার, তুমি নিত্য কল্যাণময় অথবা সদা একভাবেই অবস্থান করিতেছ। ১৬।

ঈশ্বরের নাম জপ এবং তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন অসংখ্য প্রকারে হইয়া থাকে। তাঁহার পূজা এবং তপ পদ্ধতিও অসংখ্য প্রকার। অসংখ্য লোক নানামতের গ্রন্থ এবং বেদের মৌখিক পাঠ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। কত কত যোগী মন সংযম বা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কত ভক্ত তাঁহার গুণ এবং জ্ঞানের বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছে। কত কত লোক সত্য বাক্য বলিতেছে, বা দান করিতেছে। কেহ বা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিতেছে, কেহ বা তত্ত্ব বা শাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিয়া ফিরিতেছে। কত কত মুনি ঈশ্বর ধ্যানে তদ্গত চিত্ত হইয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ উপরোক্ত

অসংখ মূরখ অন্ধ ঘোর,
অসংখ চোর হরাম-খোর,
অসংখ অমর কর জাহ জোর,
অসংখ গলবড় স্তুতিয়া ফমাহ,
অসংখ পাপী পাপ কব জাই,
অসংখ কুড়িয়ার কুড়ে ফিবাহ্,
অসংখ ম্লেছ মল্ ভখি খাহ্,
অসংখ নিন্দক সির করে ভাব,
নানক নীচ কহে বিচার। †
কুদরতি কৌন কহা বিচার।
বারিয়া ন জাবাঁ একবার,
জো তুধ ভাবে সাই ভলিকার,
তুঁ সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥১৮॥

অর্থ

সকল ব্যক্তিই আপন আপন পন্থাকে ঈশ্বরের পূজা, অথবা ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় স্থির করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে)। হে ঈশ্বর, তোমার মহিমা কে জানিতে সক্ষম? কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণনা করিতেও আমার সাধ্য নাই। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, মনুষ্যেরপক্ষে তাহাই উত্তম। তুমি নিরাকার এবং সদানন্দ।১৭।

মূর্খ, ঘোর অন্ধ, (অর্থাৎ অজ্ঞানী), চোর এবং হারামখোর—জগতে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি অন্যায় শাসন করিতেছে। অসংখ্য প্রতারক প্রতারণা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অসংখ্য পাপী পাপাচরণ করিতেছে;

* হরাম—অন্যায় লাভ। জার অমর—কঠিন হুকম। এ'দুইটী পারসী শব্দ।

† কেহ অর্থ করিয়াছেন, "নানক আপনাকে নীচের অপেক্ষাও নীচ জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন।"

অসংখ নাবঁ অসংখ থাচ ॥
অগম্য অগম্য অসংখ লোঅ,
অসংখ কহে সির ভার হোই
অখরী নাম অখরী সালাহ, *
অখরী গিয়ান গীত গুণ গাহ।
অখরী লিখন বোলন বাণি
অখরাঁ সিব সংযোগ বখানি।
জিন এহ লিখে, তিস্ সির নাহি,
জিবঁ ফরমাএ তিবঁ তিবঁ পাহি।
জেত্তা কীতা তেত্তা নাঁউ,
বিন্ নাবেঁ নাহি কো থাঁউ।
কুদরতি কৌন &c ॥১৯॥

অর্থ

অসংখ্য মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলিয়া ফিরিতেছে। অসংখ্য ম্লেচ্ছ অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছে। অসংখ্য নিন্দুক পরের নিন্দা করিয়া মস্তক পীড়িত করিতেছে। নানক এই সকল নীচ লোকের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, হে ঈশ্বর তোমার মহিমা বর্ণনাতীত, কারণ তোমার দয়া সকলের উপর সমান। তুমি যাহা করিতেছ, মনুষ্যের পক্ষে তাহাই কল্যাণকর। হে ঈশ্বর, তুমি বিকার-রহিত এবং নিরাকার।

হে ঈশ্বর, তোমার নাম এবং স্থান অসংখ্য। অগম্য এবং অসংখ্য লোক সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার অসংখ্য রচনা বর্ণন করিতে মস্তক পীড়িত হয়; তোমার নাম, ভজন, জ্ঞান, গুণ, গীত এবং তোমা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বা কথিত হইয়াছে, সকলই মনুষ্যের পরিমিত জ্ঞান অনুসারে

* অখর পারসী শব্দ, অর্থ, পরিমিত জ্ঞান। ভাব এই যে ঈশ্বরের পূর্ণজ্ঞান অনন্ত, এজন্য মনুষ্যের পরিমিত জ্ঞানের বহির্ভূত; পরন্ত মনুষ্য জ্ঞানের যতটুকু সাধ্য তদনুসারেই তাঁহার পূজাদির বিধান নিরূপিত হইয়াছে।

ভরিএ হথ পৈর তন দেহ্,
পানি ধোতে উতরস্ খেহ্।
মুত পলিতী কপড়া হোই,
দে সাবুন লইএ উহ্ ধোই।
ভরিএ মতি পাপা কে সঙ্গ,
উহ্ ধোপে নাবঁ কে রঙ্গ।
পুন্নী পাপী আখন নাহ্,
কর কর করনা লিখনে জাহ্,
আপে বীজি আপেহি খাহ্
নানক, হুকমী আবে জাহ্ ॥২০॥

অর্থ।

হইয়াছে। এই পরিমিত জ্ঞানেই তোমার সহিত সংযোগ (ঈশ্বর দর্শন) এবং তোমার মহিমার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উহার সংখ্যা বা সীমা করিতে চাহে, সে নির্ব্বোধ। তোমার যেরূপ আজ্ঞা হইতেছে, জীব সেই রূপ প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহার কীর্ত্তিও যত, নামও তত, অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। কোন স্থানই তাঁহার নাম ব্যতীত নাই, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তাঁহার গুণের প্রকাশ রহিয়াছে, অতএব স্থানই তীর্থ। হে জগদীশ, তোমার শক্তি কে বুঝিবে? ইত্যাদি ॥১৯॥

হস্ত পদ দেহাদি মলিন হইলে জলে ধৌত করিলে মলিনতা দূর হয়; মূত্র দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র হইলে সাবান দ্বারা ধৌত হইয়া পবিত্র হয়; অর্থাৎ জল সাবান প্রভৃতি বস্তু দ্বারা জড় পদার্থের শুচিতা সম্পাদিত হয়। পাপের দ্বারা মতি মলিন হইলে উহা ঈশ্বরের নাম-রূপ রংএর দ্বারা ধৌত হয়। পুণ্যবান এবং পাপী কেবল কথায় হয় না। জীব যে যেমন কর্ম্ম করে, স্ব স্ব কর্ম্মের হিসাব সঙ্গে লইয়া যায়। যে যেমন বীজ বপন করে, সে তেমনি ফল লাভ করে। নানক বলেন সেই ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই সংসারে যাতায়াত হইতেছে ॥২০॥

মূর্খ।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়ের স্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল—কোমল শরীরের পাষাণ প্রাণ আরো দৃঢ় হইল।—শ্যামা বিধাতার আসনে বসিয়া নিরীহ কৈলাসকে মহা পাপী—মহা দোষী স্থির করিলেন। মাধবকে তিনি হৃদয় সমর্পণ করিতেছেন, তাহা কেন কৈলাস জানিলেন। যাহা চন্দ্র সূর্য্যেও জানিবার অধিকার নাই, তিনি কেন তাহা জানিলেন? কৈলাসের দ্বিতীয় অপরাধ, যাহা মাধবের, তাহা কেন তিনি আপনার করিয়া ছিলেন। তৃতীয় অপরাধ, তিনি তৃতীয় ব্যক্তি, তৃতীয় ব্যক্তির জীবনে অধিকার নাই। চতুর্থ অপরাধ, কৈলাস রাজভক্ত নহে—তাহা হইলে সুধীর সতীত্বে কলঙ্ক আরোপ করিতে যাইবেন কেন? পঞ্চম অপরাধ, অবিশ্বাসী ও চোর। ষষ্ঠ অপরাধ, বিশ্বনাথ বাবু আসিলে নিশ্চয়ই তাহা কর্ত্তৃক (Secret Society) গুপ্ত সমিতির রহস্য ভেদ হইবে সুতরাং বিদ্রোহী। অতএব তাঁহার প্রতি প্রাণ দণ্ডের আদেশ বিহিত হইল।

* * * *

কৈলাস শ্যামার গৃহ হইতে ক্রোধে ও দুঃখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গচন্দ্রের নিকট গেলেন। বঙ্গচন্দ্র—একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন,—চিন্তা, গুণ্ডারা কি করিল এখনও তাহার সংবাদ নাই। দ্বিতীয় চিন্তা, অকৃত কার্য্য হইলে বড় বিপদ হইবে। তৃতীয় চিন্তা, কেন এরূপ কাজে হাত দিয়াছেন এবং এতদুর অগ্রসর হইয়াছেন যে ফিরিবার সময় নাই। চতুর্থ চিন্তা, ঘোর আত্মগ্লানি; যাহার প্রাণ নাশের জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন, সে এক দিন তাঁহাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

এমন সময় কৈলাসচন্দ্র উপস্থিত হইলেন—তাঁহাকে দেখিয়া বঙ্গচন্দ্রের উদ্বেলিত হৃদয় একটু প্রশমিত হইল—এখন দুই জন হইলেন। কৈলাস চুপে চুপে কহিলেন—"ভাল সুবিধা হইয়াছে মাধবের, একটা চাক্‌রানীর

সঙ্গে দোষ আছে, সে রোজ পাচিল ডিঙ্গাইয়া থিড়কিতে প্রবেশ করে, আবাব পাচিল ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়—আমি এখন বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়া আসিলাম, সে বাড়ীর ভিতর কোন স্থানে লুকাইয়া আছে। কর্ত্তৃ ঠাকুরাণী আমায় বলিয়া দিয়াছেন "দেওয়ান ইহার প্রতিবিধান না কবিলে, আমি তাহাকে জবাব দিব।"

বঙ্গচন্দ্র কৈলাসেব কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন "বাড়ীব ভিতরে একটা গোলযোগ করিলে নিন্দা হইতে পারে, বিশেষ কর্ত্তা এখন বাড়ীতে নাই।"

কৈলাস বলিলেন—"বোধ হয় প্রাচীরেব বাহিরে চারি দিকে লোক দিয়া ঘিরিয়া রাখিলে অবশ্যই তাকে পাওয়া যাইবে।"

বঙ্গচন্দ্র বলিলেন "অনেক লোক না হলে বাড়ীব চাবি দিকে ঘেরা যাইবে না—সুতরাং এ ভয়ঙ্কব ব্যাপাব কি এত লোকের জানা উচিত? একটু অপেক্ষা করুন না, সংবাদ পাওয়া যাইবে—আমার লোক শিকার অন্বেষণে ঘুরিতেছে। যতক্ষণ সংবাদ না পাই ততক্ষণ আমি ঘুমাইব না।"

কৈলাস বলিলেন—"আমিও আপনাব নিকট বসিয়া থাকিব, সংবাদ না পাইলে সুস্থ হইতে পারিতেছি না।"

উভয়ে ঘুমাইলেন না—প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলেন—সাড়ে তিন টার সময় একজন লোক নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া কৈলাসচন্দ্রকে দেখিয়া আরো ভীত হইল।

বঙ্গচন্দ্র আগন্তুকের লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিলেন কৃতকার্য্য হইয়াছে; বলিলেন "ভয় নাই বল, ইনি মনীব, ভয় কি?"

আগন্তুক বলিল "কর্ত্তা কাম্ ত হাসিল—এখন যা হয় আপনারা করেন, আমি চল্লাম।"

বঙ্গচন্দ্র তাহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন "লাস্?" "লাস্ বিছানায় যেমন শুয়ে ছিল তেমনই আছে।"

"সর্ব্বনাশ! লাসের একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হচ্ছে।"

"এত রাতে কর্ত্তা আর কিছু পার্ব্ব না।" "আরে সর্ব্বনাশ! আরো পঁচিশ টাকা নে" —এই বলিয়া বাক্স খুলিয়া টাকা দিয়া বলিলেন—"যা বাবা কোন চিহ্ন যেন থাকে না।"

নবহন্তা ভয়ে ভয়ে বাহিরে গিয়া ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "কর্ত্তা সর্ব্বনাশ! লাশ ত নাই।"

বঙ্গচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন—"আরে বলিস্ কি—কেমন মেরে ছিলি? কোথায় যথম্ করে ছিলি?"

নবহন্তা বলিল "আজ্ঞে কর্ত্তা বুকের মাঝাবে এ ফোঁড ও ফোঁড করছি—কত নারি চারি দ্যাক্‌চি মরছে—ভাল কৈরাই মরছে—যখন দ্যাখ্‌লাম দাত হিটুকাইয়া রৈচে, পুঁঙ্গির পুত আর কথা কৈচে না—হাঁসও সারচে না, বুকির মাঝারে দেল ও খবির কলের নাথাল নর্‌চে না—তখন মুই আইছি। কর্ত্তামশই, মরচে যে তার কুছু সন্দি নাই। আর এত শিগ্‌গির লাশ যে কেউ ন্যাবে—তাওত সম্বব্ না; ও কর্ত্তা মহাশয় তোমার কসম মাধব বাবু নিশ্চয়ই বেরমোজ্ঞানী—না—না—বেরমো দৈত্য হৈয়া চৈলা গ্যাছে।"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন "এখনও দেশের লোকের কুসংস্কার যায় নাই, ব্রহ্মদৈত্য টত্য সব মিথ্যা, আমার বোধ হয় এ বেটা আমাদের ফাকি দিচ্ছে।"

বঙ্গচন্দ্র ভীত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন "চল্ বেটা চল্, আমি স্বয়ং যাইয়া দেখিয়া আসিব।" এই বলিয়া নবহন্তাকে লইয়া অন্ধকারে স্কুল মাষ্টারের বাসায় চলিলেন। পকেটে দেশলাই লইলেন—কৈলাসচন্দ্রও সঙ্গে চলিলেন।

অনতিবিলম্বে মাষ্টারের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাহার শয্যা শোণিতে রঞ্জিত। রুধির ধারা তক্তপোষ হইতে গড়াইয়া ঘরের মাঝিয়া পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সুতরাং নৃশংস ব্যাপার সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। পরে তিন জনে শয্যা ও গৃহ পরিষ্কার করিয়া আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

নরহন্তা পুনরায় বলিল—"মশাই মুই দাবি ছুসা বল্‌তি পারি ও ঠাহুর বেরমো দেবতাই হৈচে, তা আপনাদের ভয় কি? মুই ক্ষুণ করছি—মোর ঘারে চাপ্‌তি পাবে।"

কৈলাস বলিলেন—"বোধ হয় একেবারে মরে নাই, অজ্ঞান হ'য়ে ছিল শেষে উঠে পলাইয়াছে।"

নবহন্তা বলিল "আল্লার কসম্, লাশটার জান থাক্‌তে মুই আসি নাই, নিসন্দি মরছে।"

বঙ্গচন্দ্র বলিলেন—"কি জানি, আমিত অবাক হয়েছি—কিছুই বুঝতে পারি না। যার শরীর হতে এত রক্ত পড়ে, যে এরূপ গুরুতর আঘাত পায়, না মরিলেও, সে স্বয়ং নীরবে উঠিয়া যাইতে পারে না।"

এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয় দেখিয়া বঙ্গচন্দ্র চিন্তাকুলিত চিত্তে শয়ন করিলেন—কৈলাসচন্দ্র ও নবহন্তা চলিয়া গেল।

* * * *

এদিকে মাধব শ্যামাসুন্দরীর নিকট হইতে বাসায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন কে তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অতিথি সজ্জন তাঁহার বিছানায় শুইয়া থাকিত। অতিথির নিদ্রা ভাঙ্গিবেন কি না চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে দূরে যেন দুইজন লোকে গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে, এমনই অনুমান হইল। মাধব শয়ন ঘরের সংলগ্ন একটী গুপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই জন লোক ঐ ঘরে প্রবেশ করিল এবং কিছুকাল পরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—যাইবার সময় মাধব তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে মাধব শয়ন-গৃহে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, নিদ্রিত ব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নাড়ী দেখিয়া বুঝিলেন তখনও প্রাণ আছে। তখন বস্ত্রে জড়াইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া সেই আম্র কাননের পার্শ্বস্থ কুটীর দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। কুটীর উন্মুক্ত হইল, সেই রমণী বাহিরে আসিয়া বলিল—

"কে? মাধব?"

"হাঁ।"

"স্কন্ধে কি?"

"অর্দ্ধ মৃত মানুষ।"

"কে মেরেছে?"

"দেওয়ান"।

"কেন?"

"আমাকে ভ্রম করিয়া"

রমণী শিহরিয়া বলিল "ঘরে এস"। মাধব ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ক্ষত ভয়ঙ্কর হইলেও মারাত্মক নহে। মাধব নিজে চিকিৎসা শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ সুতরাং ঘা পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া পটি বান্ধিয়া দিলেন। রক্ত বন্ধ হইল—রোগী এখনও অজ্ঞান।

মাধব রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরানন্দের সংবাদ কি ?"

রমণী বলিল, তিনি এখন বেশ সুস্থ আছেন—তোমার যত দিন অভিরুচি, তিনি পাটনী বাড়ী থাকিবেন। তিনি বলিয়াছেন 'যিনি দুইবার আমার প্রাণ ও পরিবারের মানরক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহার কৃতদাস।'

মাধব বলিলেন "তুমি আসিলে কেন ?"

"তোমার জন্য।"

"আমার জন্য ?"

"তা বৈকি, তুমি শত্রু জালে জড়িত; আমি সর্ব্বদা ছদ্মবেশে তোমার পেছনে পেছনে থাকি, তুমি জানিতে পার না।"

মাধব হাসিয়া বলিলেন—"আজ যে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলে, কোন নূতন কথা শুনিয়াছ ?"

রমণী বলিল—"তোমার ঔষধ ধরিয়াছে, দারগা তোমার আদেশানুসারে সকল অনুসন্ধান গোপনে লইয়াছে। দেওয়ানজীর এজাহার মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে—আর মোকদ্দমা পাকা করিবার জন্য দেওয়ানজী যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেছেন, তাহাও দারগা বুঝেছেন। ইহার পরে জানিতে পাইবে, দারগার বহিতে আমাদের এজাহার লেখা আছে। দারগা আমাকে বলিয়াছেন রোজ রাত দশটা এগার টার সময় যাইয়া তাহার নিকট সকল গুপ্ত সংবাদ বলিতে হইবে। তোমাকে মারিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, একথাও আমি কাল বলিয়া আসিয়াছি। আজ যাই নাই, কাল এ ব্যাপারও দারগার কর্ণগোচর হইবে।"

মাধব বলিলেন "হরানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল ?"

রমণী বলিল—"দারগা বলিতেছিলেন, বোধ হয় হরানন্দ দেওয়ানজীর হাতে পড়েছে, হরানন্দকে একবার পাইলে দেওয়ানজীকে দেখিতাম।'

মাধব বলিলেন "আর কোন খবর ?"

"পরশু পুলিসের বড় সাহেব আস্‌বে।"

"আর কিছু জান্?"

"পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়া মকদ্দমা ছেড়ে দিবে।"

"তুমি কিরূপে জান্‌লে?"

"বড দারগা ও ছোট দারগায় যে কথা হয়, তা আমি আড়াল থেকে শুনেছি।"

"তারা কি বলা-বলি কচ্ছিল?"

'বড় দারগা বল্লে হাঁ হে, আমাদের হাজার ত্রিশেকের, আর বড় সাহেবের হাজার বিশের একটা বন্দোবস্ত করে ফেলাও না।'

ছোট দারগা বলিল—'সর্ব্বনাশ এত টাকা?' বড দারগা বলিলেন 'সাহেবের কিছু টাকার দরকার' এবারে সুবিধা হলো, ঐ সঙ্গে আমাদেরও কিছু হ'য়ে যাক্।'

ছোট দারগা বলিল 'দেখা যাবে।' তার পরই আমি একটা গান গেয়ে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেম।

এই সময়ে আঘাতিত ব্যক্তি "জল্ জল্"—বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, রজনীও প্রভাত হইল। মাধব একবার বাহির হইয়া কতক গুলি পাতা ও গুল্ম আনিয়া রমণীর হাতে দিয়া কহিলেন, এই রস করিয়া ঘা ধোওয়াইয়া দিবে, পিপাসা লাগিলেও জলের সঙ্গে খাইতে দিবে। সাগুদানা ও এরোরুট পথ্য দিবে। শুশ্রূষার কথা তোমায় অধিক করিয়া বলা বৃথা।"

রমণী হাসিল। মাধব ধীরে ধীরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

রমণীকে পাঠক বোধ হয় চিনিতে পারেন নাই। ইহার নাম রমাদাসী। রমাদাসী বিশ্বনাথ বাবুর পদাঘাত খাইয়া কয়েক দিন অতি কষ্টে এদিক ওদিক্ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্য আনিয়া বিনোদের মান ও প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যখন দেখিল, লীলা মরিল, বিনোদ পাগল হইল—তখনই গ্রাম ছাড়িল—ভূতনাথের অন্বেষণে ঢাকায় ছুটিল—ঢাকায় অলি

গলি নানাস্থান খুঁজিযা ভূতনাথের সাক্ষাৎ পাইল না। এদিকে হাতেও কিছু নাই, বড় বিপদে পড়িল—সহরে বড় বড় দান আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র ভিক্ষা নাই—তবে রমার রূপ আছে—যেখানেই ভিক্ষা করিতে যায়, সেই বলে "তোমার এমন রূপ, তুমি ভিক্ষা কর কেন?'—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতি এই তোমার এমন রূপ আছে, বেচিয়া খাওনা কেন?

এক দিন যথার্থই রমাকে একটী বড় মানুষের ছেলে বলিল "সুন্দরি আমার বৈঠকখানায় চল, তোমায় ভিক্ষা দিব।" রমা বাবুদের বৈঠকখানার অর্থ ত জানে না, আর মনে করিল বাবুর সঙ্গে বুঝি পয়সা নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে নির্ম্মল অন্তঃকরণে বৈঠকখানায় চলিল। বৈঠকখানার অবস্থা দেখিয়া রমা বিস্মিত হইল। তথায় ঢোলক পাখওয়াজ তবলা তানপুর বিরাজমান। ঢুলুঢুলু নয়নে দুই সুন্দরী তাম্বুল খিলি রচনা করিতেছে, আর মৃদু মধুরে গাইতেছে।

সোমপানে কেশব রঞ্জিত নয়ন।
মরি রতি দল মাঝে বিরাজে মদন॥
কুঙ্কুমা উড়াই—কোহি মারে হে পিচকারি,
ফুল ছোড়ত কোহি—শ্যামদেহ পরি,
সব বোলত হোরি—হোরি—দোলই জঘন।"

একজন বাদক তবলা বাজাইতেছে—আর দুটী বাবু "আহা হা" বলিয়া মাঝে মাঝে তাল দিতেছে—একবার বা উঠিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। যে বাবুর সঙ্গে রমা গিয়াছিল, তিনি পোষাক ছাড়িয়া বসিয়া বলিলেন— "তোমার নাম কি?" এই সময় গান বাদ্য বন্ধ হইল। রমা বলিল "রমা।"

"বাড়ী কোথায়?"

"বাড়ী ত্রিপুরার পর্ব্বতে।"

"এখানে কিরূপে আসিলে?"

"পায়ে হাঁটিয়া"।

"একাকী?"

"হাঁ"

"এখানে থাকিবে?"

"থাকিব।"

"কি কাজ করিতে হইবে, জান?"

"না।"

"গাইতে নাচিতে হইবে।"

"তা আমি পারব না।"

"ক্রমে শিখবে।"

"তাও শিখব না।"

"তবে কি করিবে?"

"আপনার মা ভগিনী যাহা করেন, তাই করিব—তাদের সেবা করিব, যেখানে পুরুষ যায় না, এমন জায়গায় থাকিব।"

সকলে একেবারে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—আর গায়িকা দুই জন ঘৃণাচ্ছলে মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "মরণ আর কি? কোত্থেকে এ সাবিত্রী দময়ন্তী এল রে।"

রমা দরিদ্রা, কাঙ্গালিনী—নিরাশ্রয়া—তথাপি তাহার মনে ঘৃণা হইল—ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল। বলিল—"যদি ভিক্ষা না দেন, আমি চলিয়া যাই।" দুর্ভাগ্যবশত এই সময় একটী বাবু "এস বাবা এস, আর কেন জ্বালাও?" বলিয়া রমাকে ভিতরে আনিতে অগ্রসর হইল—রমা একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "খপরদার ছুঁইও না।" বাবু "বটে বটে" বলিয়া রমাকে ধরিলেন। রমা আবার ভীষণা হইল— বাবুর গণ্ডে সেই পাহাড়ি চপেটাঘাত লাগাইল, বাবু ঘুরিয়া পড়িলেন। তাই দেখিয়া বাড়ীর বাবু ও আর এক বাবু রমাকে অপমান করিতে অগ্রসর হইলেন—রমা দ্বারদেশে একগাছি যষ্টি পাইয়া এক বাবুর স্কন্ধে বিষম প্রহার করিল—অপর বিস্মিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রমা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। পরদিন হইতে সে আর কাহারও বাড়ী যাইত না, যদি দুই দিন খাইতে না পাইত, তাহাও স্বীকৃত, তথাপি অপমানের ভয়ে কাহারও বাড়ী যাইত না। একটা আখড়া বা গরিব গৃহস্থের বাড়ীতে রাত্ কাটাইত।

এই অবস্থায় কিছু দিন কাটাইয়া তাহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবৃত হইয়া পড়িল, মনে করিল অন্য স্থানে যাই, তাহা পারিল না। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য-

বশত একটা আখড়ায় জ্বর ও বসন্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। একজন হিন্দুস্থানি গোয়ালার সহিত ইহার পূর্ব্বেই রমার খালাপ হইয়াছিল— কেননা গোয়ালা কুস্তি করিতে প্রায়ই ঐ আখড়ায় আসিত। সেই গোয়ালার নাম গোকুলদাস। গোকুলদাস দয়া করিয়া তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া গেল এবং বহুদিনে বহু অর্থ ব্যয় ও বহু শুশ্রূষায় রমাকে ভাল করিল। রমা গোকুলের উপর বড়ই কৃতজ্ঞ হইল—গোকুল এক দিন রমার হাত ধরিয়া কান্দিয়া বলিল "তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী আমি হারাইয়াছি, আমি বড় দুঃখী, যদি তুমি দয়া কর, তবে সেইরূপ যত্নে তোমাকে আমি গৃহে রাখি। আমার দুধের কারবার, অনেক উপার্জ্জন, আমার হাতেও অনেক টাকা আছে, সকলই তোমার।"

রমা বড় সন্তুষ্ট হইয়া গোকুল দাসের গৃহিণী হইল। উভয়ে উভয়কে বড় ভাল বাসিল। এই সময়ে ভুতনাথের সঙ্গে একদিন রমার দেখা হয়—রমা তাহাকে তাহার কাছে থাকিতে বলে। ভুতনাথ তাহা না থাকিয়া বলে যে 'আগামী কল্য আমি যাঁর কাছে আছি, তিনি এলাহাবাদ যাইবেন, আমিও যাইব।'

রমা বলিল "এখানে থাকিয়া পড়, টাকা কাপড় বই যত লাগে, আমি দিব—আর এখানে অতি যত্নে খাইতে ও থাকিতে পারিবে— এবং তোমার মা ঠাকুরাণীকেও মাস মাস কিছু কিছু খরচ পাঠাইতে পারিবে।"

ভুতনাথ বলিল "না রমা, আমি বরং এলাহাবাদ গিয়া আবার আসিব তথাপি এমন মুহূর্ম্মুহু কালে বলিতে পারিব না, যে যাইব না। তিনি এক দিন আগে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

রমা বড় দুঃখিতা হইল; তথাপি পঞ্চাশটী টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "ভুতোবাবু দাসীকে ঘৃণা করো না গ্রহণ কর—আর যদি না আস, তবে তোমার ঠিকানা লিখিও, আমিই যাইব।"

ভুতনাথ অবাক হইয়া রমার মুখপানে চাহিল—রমা কান্দিয়া বলিল— "ভুতনাথ দুঃখিনী মায়ের খবর লইয়ো, লীলা নাই।"

ভুতনাথ রমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া "আমার প্রাণের লীলা নাই"

বলিয়া অনেক কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই রমার নিকট বিদায় লইল—রমাও কাঁদিয়া বিদায় দিল।

গোকুলদাসের গৃহিণী হইয়া রমা ছয় বৎসর ছয় দিনের মত কাটাইল। এ ছয় বৎসর রমা যথা রীতি মাস মাস বিনোদের জন্য ১০৲ টাকা করিয়া রামা চণ্ডালের বরাবর পাঠাইয়াছেন এবং ভুতনাথের ঠিকানা জানিতে পারিয়া তাহাকেও মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। ছয় বৎসর পরে গোকুল দাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যু হইলে রমা তাহার গরু ও অস্থাবর জিনিস পত্র সকল বেচিয়া সাত শত টাকা পায় এবং তাহার নিকট নগদ তিন হাজার তিন শত ছিল—এই চারি হাজার টাকার মধ্যে দুই হাজার টাকা গোকুলের শ্রাদ্ধে ও গরিব দুঃখীকে তাহার নামে দান করিয়া ব্যয় করিয়া গেল। অবশিষ্ট দুই হাজারের এক শত টাকার সিকি আধুলি দোয়ানী আর উনিশ শত টাকার ব্যাঙ্ক হইতে গিয়া কার নোট ক্রয় করে; তৎপর একটী ঝোলা বানাইয়া বৈরাগিণীর বেশে বহির্গত হয়। ছয় বৎসরে রমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বসন্তে তাহাকে বিবর্ণ ও কুৎসিত করিয়াছে এবং ছয় বৎসর পতি সেবায় তাহাকে একেবারে প্রৌঢ়া করিয়া তুলিয়াছে—তাই আয়নাতে মুখ দেখিয়া ভাবিয়াছে, ভুতনাথের মায়ের কাছে থাকিলে, এখন আর তাহাকে সহসা কেহ চিনিতে পারিবে না।

রমা ভুতনাথের মায়ের কাছেই চলিল—তিন চারি দিন হাঁটিয়া গ্রামে উপস্থিত হইল, কিন্তু সহসা গ্রামে প্রবেশ করিতে লজ্জা হওয়ায় গ্রামের নিকটবর্ত্তী মাঠের একটা বট গাছের তলায় বসিয়াছে। তখন বেলা ঠিক দুইটা; ভয়ঙ্কর রৌদ্র; মাধব সেই দিন দুলাল পাটনীর বাড়ী যাইতে ছিলেন; মাধবকে দেখিয়া রমা চিনিল—কিন্তু রমাকে মাধব চিনিল না। শেষে রমা ডাকিয়া মাধবকে আত্ম পরিচয় ও অবস্থা বলিল। উভয়েই উদার, উভয়েই পরের জন্য পৃথিবীর সুখ তুচ্ছ করিয়াছে—সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ———

মাধব বলিলেন "সুসময়ে তোমার দেখা পাইয়াছি, তোমা দ্বারা আমার বড় উপকার হইবে"—রমা বলিল "ঠাকুর আমার প্রাণ, আমার টাকা, অদ্য হ'তে তোমার হাতে দিলাম।" মাধব বলিলেন—"টাকা

নিজের ইচ্ছা মত খরচ করিও; কিন্তু হৃদয় [illegible] মতে চালাইতে হইবে।”

“তাহা চালাইলে কি উপকার হইবে?”

“শত শত সহস্র নিরপরাধ লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে; শত শত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সতীর সতীত্ব মানীর মান—রক্ষা হইবে।”

রমা দাসী মহোল্লাসে নৃত্য করিয়া বলিল—“প্রভু আমি প্রস্তুত, আমায় ঐ মহাপূজার বলি দিন।

সেই দিন অবধি রমা ও মাধবের এক প্রাণ, একাত্মা হইল। যত দিন আম্র কাননে নির্জ্জন বাস রচিত না হইল, তত দিন রমা পাটনী গৃহে কাল যাপন করিল।

রমা সারা দিন ছদ্মবেশে সকল গৃহে ও সকল স্থানে বেড়ায়, কাহারো আর্থিক বিপদ দেখিলে নিজে উদ্ধার করে, কৌশলে বলে আবশ্যক হইলে, মাধবকে বলে। মাধব না চাহিলেও, রমা মাধবের মুখে অন্যের দুঃখ শুনিলে, তাহাকে টাকা দেয়। ইহা ছাড়া নিত্য রজনীতে রমা চণ্ডালের গৃহে পুরুষের বেশে যাইয়া বিনোদের সহিত আলাপ করে—ও তাহাকে টাকা দেয়। রমাদাসী আসিয়াই রমা চণ্ডালকে টাকা দিয়া এলাহাবাদ পাঠাইয়া দিয়াছে। সে ভূতনাথকে আনিতে গিয়াছে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রজনী প্রভাত হইলে রমার হাতে রোগীর ভার দিয়া মাধব গ্রামে আসিলেন। প্রথমেই নরহন্তার সহিত মাধবের দেখা হইল—মাধব রক্ষদৈত্য হইয়াছে মনে করিয়া, সে পলাইবার উপক্রম করিল। মাধব তাহাকে ধরিয়া বলিলেন—আমি তোকে চিনিয়াছি—যদি আমার কথামত কার্য্য না করিস, তবে সর্ব্বনাশ করিব, তোর বাড়ী ঘর সবই আমি জানি।”

নরহন্তা “দোহাই—দোহাই আল্লাতাল্লার।” বলিয়া মাধবের পা জড়াইয়া ধরিল।”

মাধব বলিলেন—"আমার ঘর হ'তে রক্ত মাখা বিছানার চাদর বালিশ ও মাদুর প্রভৃতি কোথায় ফেলেচিস বল্।"

"দোহাই ঠাকুর, দোহাই দেবতা আমি ফেলি নাই—দেওয়ানজী সেগুলি তাঁহার নিজের ঘরের তক্তপোষের নীচে মাটীতে পুতিয়া রেখেছেন," বলিয়া নরহন্তা আরো পা জড়াইয়া ধরিল।

মাধব বলিলেন "যদি প্রাণে বাঁচিতে চাস্, তবে আমি যত দিন না বলি, ততদিন দেওয়ানজী বা তাঁর লোকের সঙ্গে দেখা করিস না—অথবা আমার সঙ্গে যে কথা হ'লো, তাহা মুখের বাহির করিস না। তাহা করিলে, সর্ব্বনাশ করিব।"

নরহন্তা প্রাণভয়ে এবং মাধবকে নিশ্চয়ই ভূত মনে করিয়া তাহাই স্বীকার করিল—এবং—মাধব যাইতে বলিলে—সে উর্দ্ধশ্বাসে নিজ বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল।

তাহার পর মাধব কাছারিতে গিয়া উপবেশন করিলেন—দেওয়ান আমলা মুচ্ছুদ্দি সকলেই তথায় ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেওয়ানজীর মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল। মাধব কিছুকাল বসিয়া ধীরে উঠিয়া দেওয়ানজীর নিকট গেলেন। দেওয়ানজীর গলদঘর্ম্ম হইল—তখন মাধব তাহার কানে কানে বলিলেন—'আমাকে মারিবার ষড়যন্ত্র করিলে—ব্যর্থ হইল। এক জন অতিথি ব্রাহ্মণ আমার বিছানায় শুইয়াছিল, প্রমাদবশত তাহাকেই খুন করিয়াছ। সে এখনও একেবারে মরে নাই। এবং তুমি ফাঁসি কাষ্ঠে উঠিবার আগে মরবেও না। এ কার্য্য আমি ছাড়া আরো অনেকে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই আমাপেক্ষা তোমার প্রবল শত্রু। তোমার বিচারের দিনে দয়ানন্দও দলে বলে উপস্থিত হইবেন, তিনি আমার হাতে আছেন।"

বঙ্কচন্দ্র শুনিয়া জড়ভরত, স্তব্ধ ও স্পন্দ-রহিত হইয়া রহিল—মাধব চলিয়া গেলেন।

তিনি কাছারি হইতে নামিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি সেলাম করিয়া, তাঁহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামে সংবাদ এই "চোর ধরা প'ড়ে পুলিসের হাতে আছে—সে বলে কৈলাশ তাকে নোট দেয়।"

করেন্‌সী আপিস হ'তে এই তারের সংবাদ পাইয়া মাধব সন্তুষ্ট হইলেন—খবরটী সঙ্গে করিয়া তখনই কৈলাশনাথ বাবুর নিকট চলিলেন—কৈলাশ বাবু দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন—মাধব হাসিয়া বলিলেন—"Well, Sir Knight of 25000, here is a message for you," এবং কাগজ খানি তাহার হাতে দিলেন।

কৈলাশচন্দ্রের কম্পিত হস্ত হইতে কাগজ ভূমিতে পড়িয়া গেল। কৈলাশ করজোড়ে বলিলেন—"আমি আর নাই, আমায় রক্ষা করুন"।

মাধবের উদারহৃদয়ে দয়া হইল। বলিলেন—"রক্ষা করিব, অকৃতজ্ঞ হইও না।" কৈলাশ উৎসাহে যেন দেহে প্রাণ পাইয়া বলিলেন—"এ জনমে না।"

মাধব বলিলেন—I don't care for your কৃতজ্ঞতা। What I promised, must needs be redeemed, Sir"—বঙ্গচন্দ্রকে রক্ষা করেছিলাম—গতরাত্রে তার সব কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে—Are not dogs better than you human brutes?"

কৈলাশ মৃতবৎ স্পন্দ রহিতভাবে অনেক্ষণ থাকিয়া আবার বলিলেন—"রক্ষা হইবে?"

মাধব বলিলেন—"পুলিসে আপনাকে ধরিলে বলিবেন, 'নোট আমার নয়, আমি দিইও নাই—আমার ভ্রাতৃবধূর নোট আমার নিকট ছিল, তাহা খোয়া যাওয়ায় করেন্‌সি আপিসে সংবাদ দেওয়া হয়।' আর গোল হইবে না—বংশী অসৎলোক, সেই আপনার চরিত্রে কলঙ্ক ঢালিয়াছে, আপনাকে ফাকি দিয়া অনেক টাকা নিয়াছে, অন্তত তার শাস্তি হউক, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হউন।"

কৈলাশচন্দ্র বুঝিলেন অসৎ সংসর্গের কি ফল—বলিলেন "আর আমি এখানে থাকিব না—আর আসিব না, কালই কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

মাধব বলিলেন—"ভয় নাই, আর চারদিন থাকিতে হইবে, আপনার অনেক কাজ আছে।" এই বলিয়া কানে কানে কি বলিলেন—কৈলাসের বদন প্রসন্ন হইল। তিনি বলিলেন—"আপনি মহাপুরুষ, আপনার ব্রত পালন হউক—আমি আপনার ভৃত্য।"

মাধব হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "বন্ধুর হাত গ্রহণ করুন।"

কৈলাশ সেই হাত ভক্তিভাবে ধরিয়া বলিলেন "বন্ধু এবং রক্ষাকর্ত্তার পবিত্র হস্ত হৃদয়ে ধারণ করি।" এই বলিয়া মাধবের হাত হৃদয়ে ধারণ করিলেন—মাধবের করুণাপূর্ণ প্রশস্ত কোমল নয়নে আনন্দের অশ্রু বহিল।

* * * *

রজনী আসিল—মাধব ধীরে ধীরে রমার কুটীরে গমন করিলেন। রোগী একটু সুস্থির, একটু আরোগ্য হইয়াছে। রক্তবন্ধ হইয়াছে; জ্বরও অনেক ভাল হইয়াছে। মাধব রোগীর জন্য নূতন ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন "রমা আমি চলিলাম, আবার গভীর রজনীতে আসিব।" রমা চাহিয়া দেখিল, মাধবের বদন আজ চিন্তা-লাঞ্ছিত। অতিবড় বিপদের সময়ও মাধবের বদনে এরূপ চিন্তার রেখা পাত হয় নাই; রমা বলিল "মাধব তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—আজ তুমি বড় চিন্তিত ও বড় ভীত হইয়াছ—আজ তুমি কোথা যাবে, যেও না।" রমার স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া মাধব হাসিয়া বলিলেন "রমা শত্রু ভয়ে আমি চিন্তিত ও ভীত নহি—কিন্তু আজ আমার মনে একটা চিন্তা হইয়াছে।" মাধবের চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখাদিল। রমা মাধবের হাত দুটী ধরিয়া বলিল—"বল মাধব বল, আমায় খুলিয়া বল, হঠাৎ তোমার মনে কিসের চিন্তা হইল?"

মাধব কাতরস্বরে বলিলেন—"রমা পৃথিবীর কীটপতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই জীবনের একটা লক্ষ্য, একটা উদ্দেশ্য আছে—আমার লক্ষ্য নাই—আমি কি উদ্দেশ্যে জীবনের তিন ভাগ ক্ষয় করিলাম, কি উদ্দেশ্যে শেষ ভাগ ক্ষয় করিব।"

রমা বলিল—"মহাযজ্ঞ—মহাপূজা—মহাব্রত—তোমার জীবনের উদ্দেশ্য—তবে কেন চিন্তা কর—আমিও ত তোমারই কাছে এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি"।

মাধবের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল—যে মাধব দৃঢ় ও হিমালয় তুল্য অটল, আজি সেই মাধব অধীর হইলেন, করুণস্বরে বলিলেন—"রমা তুমি পবিত্র তুমি গগনতুল্য উচ্চ—পার্থিব পাপ বায়ু, তোমার চরণ স্পর্শ করিতে পায়

না—তুমিই মহাব্রত পালনের উপযুক্ত। আমি পাপী—আমি নরাধম, আমি মনুষ্য নামের অযোগ্য। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তুষ্টি সাধন। আমার উদ্দেশ্য—আমার লক্ষ্য—মহাপাপ। তুমি মহাযজ্ঞ শান্তিকামনা করিয়া কর—আমি পাপ কামনা করিয়া করি, দেখ তোমায় - আমায় কত ব্যবধান।"

রমা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল—পরে একটু হাসিল—হাসিয়া মাধবের মুখপানে তীব্র কটাক্ষ করিল। মাধব ভাবিলেন, রমা তাঁহার হৃদয়ে কি আছে, সকলই দেখিতে পাইতেছে। রমা ক্ষণকাল পরে বলিল—"বুঝিয়াছি মাধব, তুমি বুঝি কারে ভাল বাসিয়াছ।" মাধব চমকিয়া উঠিলেন—মাধবের বদন ভয়ঙ্কর হইল—উন্মাদের লক্ষণ তাহাতে দৃষ্ট হইল—নয়ন বিস্ফারিত ও ললাট রেখাকৃত হইল—রমা ভীতা হইয়া সরিয়া বসিল।

মাধব প্রলাপের ন্যায় বলিতে লাগিল—"ভালবাসা? না রমা ভালবাসা কারে কয় জানি না। জানি পূজা—জানি সেবা—জানি ধ্যান—ভক্তি।—বাল্যকাল রূপের পূজা—গৌরীর পূজায় গত করিয়াছি—যৌবনে সেই উৎসাহে সেই ভক্তিযোগে সতী সেবা, সতী পূজা করিয়াছি আর কিছু চাই নাই—আর কিছু করি নাই—এখন সেই মহারূপে সেই প্রজ্বলিত আগুন—সেই অনিবার্য্য, অনির্ব্বাপীয় ভয়ঙ্কর প্রখর মহানল—আমায় পোড়াইয়া ছারখার করিল— রমা তুমি আমায় রক্ষা কর—আমি সামান্য মানব, তুমি দেবী—আমি রিপু দল-পদে দলিত, তুমি মহাযোগিনী। মাতঃ তুমি আমায় রক্ষা কর। মা জ্ঞানহীন বালককে কোলে কর।" রমা বিস্মিত হইল—ভাবিল, একি মাধব কি উন্মাদগ্রস্ত হইল? মাধব আর কিছু বলিলেন না। দাঁড়াইলেন—রমা বলিল "বসো, যাও কোথা"?—মাধব উত্তর দিলেন না; ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

রমাও কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল। যেন করুণাময়ী মাতা ক্ষিপ্ত সন্তানের রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

অষ্টাত্রিংশ—অধ্যায়।

পাঠক তুমি বলিবে শ্যামার চরিত্রে, কৈলাশের চরিত্রে এ গ্রন্থ কলুষিত করিয়াছে—তাহা হইতে মাধব চরিত্রে আরো বিস্মিত হইবে; লেখককে গালি বর্ষণ করিবে। সুরুচি কুরুচির বিচার না করিয়া, একবার মানব প্রকৃতি দর্শন কর—দেখিতে পাইবে, ইহার অন্তস্তলে কি রহিয়াছে! ভূমিকম্প উল্কাপাত—যে দেখিয়াছে, সে পৃথিবীর ক্ষণিক শান্তি মূর্ত্তি দেখিয়া নিশ্চিন্ত নহে। তুমি সাধু, তুমি মহৎ, তুমি বৃহৎ বলিয়া জগৎ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে, একবার আপনার অন্তস্তল নিরীক্ষণ কর, দেখিবে—তুমি কত বড় অসাধু, কত ক্ষুদ্র ও কত নীচ—প্রশংসায় লজ্জিত হইবে। শ্যামা ও কৈলাস মানব সংসারে জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ। এই সংসারে কত লক্ষ শ্যামা, কত লক্ষ কৈলাস লালসার দীপ্তি ভোগ করিতে গিয়া অহরহ দগ্ধ হইতেছে। সুরুচির কাল্পনিক আবরণ উন্মোচন কর—সভ্যতার উজ্জ্বল পোষাক পরিত্যাগ কর, আপনি আপনাকে একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর—দেখিবে তুমি কেমন কুরুচি পূর্ণ—তুমি কেমন কদাকার উলঙ্গ!

মাধবও মানব—সামান্য মানব। দেবতা নহে—স্বর্গের নহে এই পৃথিবীর—এই পাপ রাজ্যের প্রজা। মাধব চিরকাল মহা পরীক্ষায় পেষিত ও দণ্ডিত। বাল্যে—যৌবনে—পরিণত বয়সে—তিনি একভাবে অবিরাম অবিশ্রাম—রূপের ধ্যান, রূপের পূজা, রূপে আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন—সেই রূপের পূর্ণ জ্যোতি—সেই রূপের উদ্বেলিত তরঙ্গ—হঠাৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল—চির-লালসা-ময়—চির-তৃষা দগ্ধ-হৃদয়ে—সে আঘাত—সে পার্থিব চিত্তবিকারের মহৌষধের গুণ কে সহিতে পারে? সাগর হইলে শুকাইয়া যায়—পাষাণ হইলে গলিয়া যায়, দেবতা হইলে পিশাচ হয়!—মাধব ত মানুষ, সামান্য মানুষ, সে চকিৎ, সে তড়িৎ সে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব আক্রমণ হইতে কিরূপে আত্মোদ্ধার করিবে? তাই মাধব

পতঙ্গবৎ সেই বিশাল অনলের গলিত স্বর্ণশিখা দুহাতে বেড়িয়া হৃদয়ে লইলেন। ভাবিলেন—তখন ভাবিলেন—এতদিনে রূপপূজা রূপধ্যান সার্থক হইল।

কিন্তু মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে বুঝিলেন "এরূপ" নহে অজগর ফণা; ইহার মহা দংশনে সপ্ততল মহা নিরয়ে ঘূর্ণিত হইয়া পড়িবেন। মনে ভয় হইল—হৃদয়ে আঘাত লাগিল, বুঝিলেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন "আর না"। মানবের প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা করিলেন "দূর হইতে দেখিব, ছুঁইব না"। তথাপি রূপের তৃষ্ণা, রূপের মোহ ভাঙ্গিল না।

রমার কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মাধব ভাবিলেন—"যাই--যেখানে দাঁড়াইয়া এত কাল শ্যামা সুন্দরীকে এক একবার দেখিয়া আসিয়াছি—আজিও সেই খানে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।"

মাধব ধীরে ধীরে সেই ঘোরা রজনীতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। রমাও ঠিক সেই স্থানে আসিয়া কায়ক্লেশে প্রাচীর পার হইল—মাধব সেই কাঁটাল গাছে উঠিলেন—রমা তাহার তলায় দাঁড়াইল—মাধব বৃক্ষ হইতে ছাত ও ছাত হইতে থাম ও কর্ণিস ধরিয়া বারান্দায় আসিলেন। রমা বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া দেখিল—জানালা দিয়া সব দেখা যায়, সুতরাং আর মাধবের অনুসরণ করিল না।

* * * * * *

হায় একি দৃশ্য—কি প্রেত দৃশ্য!—দূর হইতে দেখিয়া রমা শিহরিল। শ্যামার পর্য্যঙ্কে এক যুবা পুরুষ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে—আর শ্যামা বাতায়ন বক্ষে দাঁড়াইয়া আলোকে কি দেখিতেছে। দীপালোকে তাহা জ্বলিতেছে। শ্যামার মুক্ত কেশ-পৃষ্ঠ, অনাবৃত-অঞ্চলে কটি দৃঢ় করিয়া বান্ধা—শ্যামা ভয়ঙ্করী হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে শ্যামার কোমল বাহু দৃঢ় মুষ্টিসহ উর্দ্ধে উঠিল। রমা প্রাণপণে চীৎকার করিল—কিন্তু বিস্ময়ে স্বর ফুটিল না। মাধবও এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, যখন দেখিলেন, শ্যামা বীভৎস ক্রিয়ার চরম সীমায় উপনীত—তখন সিংহের ন্যায় অগ্রসর হইয়া এক মুষ্টিতে শ্যামার কেশ গুচ্ছ আর এক মুষ্টিতে তাহার দক্ষিণ হস্ত মহাবলে ধারণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পিশাচিনি! নরঘাতিনি! একি।"

শ্যামা স্পন্দ-রহিত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া মাধবের গায়ে এলাইয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণধার ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। শয্যায় নিদ্রিত যুবা ভয়-ব্যাকুলিত অন্তরে জাগিয়া বলিলেন, " একি ! "

মাধব বলিলেন "পালাও কৈলাস—দেখ ঐ শাণিত ছুরিকা তোমার বক্ষে বিদ্ধ হইত। পিশাচিনীর হাতে তোমার প্রাণ যাইত—পালাও—পালাও।"

কৈলাস ভয়ে একাকী যাইতে পারিলেন না; বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্যামার চমক ভাঙ্গিল—বলিলেন, "মাধব কেন আমায় বাধা দিলে? চোর, বিশ্বাস-ঘাতক, নরহন্তা, আজ আমার হাতে উচিত শাস্তি পাইতেছিল, কেন বাধা দিলে?"

মাধব তাহার কেশ ও হস্ত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—" পিশাচিনি! মানিলাম, কৈলাস অপরাধী, অপরাধের শাস্তি পাইতেছিল—কোন্ অপ-রাধে স্বামী বধের কল্পনা করিয়াছিলে—কোন্ অপরাধে এই ব্রহ্মরক্ত (নিজের প্রতি) পাতে এই ক্ষুদ্র জীবন নাশের যুক্তি করিয়াছিলে?"

শ্যামাসুন্দরী বুঝিলেন—রজনী প্রভাতে তাঁহার কলঙ্কে দেশ ভাসিবে—পুলিশের হাতে অপমান হইবেন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবেন। তাঁহার মাথা ঘুরিল—তাঁহার বোধ হইল পৃথিবী অতলে ডুবিয়া গেল। শ্যামা ধীরে ধীরে পাগলিনীর মত দেয়াল ঠেশ দিয়া ধুলায় বসিলেন—বসিয়া বলিলেন—উন্মাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, " মাধব, কাল কলঙ্কে দেশ ভাসিবে—আমাকে কনষ্টবলে ধরিয়া জেলে পুরিবে। যাও মাধব এখনই খবর দাও, এখনি আমায় নিয়ে যাক্, এখন অন্ধকার কেউ দেখিবে না—যাও মাধব, যাও—আমি তোমার জন্য কুসুমমালা গাঁথিতে ছিলাম, তুমি আমার জন্য লৌহ শৃঙ্খল প্রস্তুত করিলে—যাও মাধব! যাও দেরি করো না—আমার পায়ে বেড়ি পরাইয়া সুখী হও। আমি তবু তোমার হাসি মুখ দেখি। তুমি চিনিলে না—কি সুখ পায়ে ঠেলিলে—যাও মাধব—যাও—যাও।" শ্যামার স্বর ভঙ্গ হইল—এখন কঠিনা শ্যামায় নারী-কোমলতা আসিয়া মিশিল—শ্যামা বালিকার ন্যায় কান্দিয়া ফেলিলেন।

শ্যামার অবস্থা দেখিয়া কৈলাসের মনও নরম হইল—কিন্তু সেই মাধব

যিনি এতদিন নত-জানু হইয়া শ্যামার কৃপা কণার জন্য করজোড়ে কাঁদিয়াছিলেন, আজ তিনি অটল তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"শ্যামা ভয় নাই, কৈলাস তোমায় ক্ষমা করিবেন—আমি তোমায় ক্ষমা করিব। ভয় নাই, তোমার কলঙ্ক এই রজনীর অন্ধকারের সঙ্গেই মিশিয়া যাইবে। রজনী প্রভাতে মানুষে তাহা জানিতে পারিবে না—এ ঘটনা এইখানে শেষ হইল—আমি তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম। কিন্তু বল ঈশ্বরকে কি জবাব দিবে?" শ্যামাসুন্দরী কিছু বলিতে পারিলেন না—কেবল দুইবার করুণস্বরে বলিলেন "মাধব—মাধব"।

মাধব ও কৈলাস—বিরাট পুরুষ ও বামন নীরবে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রমা শিহরিত কলেবরে অতি কষ্টে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া কুটীরে গমন করিল। মনে মনে বলিল, মাধব বুঝিয়াছি, 'কে তোমার প্রাণে গরল ঢালিয়া দিয়াছিল!'

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

অরুণোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে একটী যুবক ও একটী ইংরেজ আসিয়া রমার কুটীরে প্রবেশ করিলেন। যুবক মাধবকে প্রণাম করিয়া কাণে কাণে কি কহিলেন। মাধব তাড়াতাড়ি নৌকা করিলেন, সেই নৌকায় ইংরেজ, যুবক, মাধব, রমা ও রোগী (এখন অনেক ভাল হইয়াছেন) ঊষা যাত্রা করিয়া দুলাল পাটনীর বাড়ী চলিলেন। যুবকের সঙ্গে এক জন লোক ছিল, সে মাধবের আদেশে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিল।

* * * * * *

থানায় পুলিশের বড় সাহেব আসিয়াছেন—ইনস্পেক্টর, সবইনস্পেক্টরও আছেন। আর তাঁহাদের সঙ্গে বজ্রচন্দ্রের লোকও আছেন—জমীদারের অপর শরীক নীলমাধব বাবুর কর্ম্মচারীও রহিয়াছেন। বাহিরের তদারক ও কাজ কর্ম্ম প্রচলিত ধুমধামের সহিত চলিতেছে। কেবল আসামী-দিগকে চালান দেওয়ার অপেক্ষা। অপেক্ষা কেন, পাঠক বুঝিতে পারি-

য়াছেন। ইনস্পেক্টর বাবু দেওয়ান বঙ্গচন্দ্রকে বলিয়াছেন "মহাশয়, আপনার যত এজাহার, গোপন অনুসন্ধানে দেখা যায়, সকলই আপনার প্রতিকূলে। উপরন্তু আপনার উপর দুইটী খুনের প্রমাণ ও মোকদ্দমা তৈয়ার করিবার জন্য আপনার লোক শাসন করা ও মপস্বলের কাছারি জ্বালাইয়া দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাধব মাষ্টার অত্যুৎকৃষ্ট ইংরেজি ভাষায় আপমার সকল অত্যাচারের বিবরণ লিখিয়া বড় সাহেব ও জেলার মাজেষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা উহা পড়িয়া এত সন্তুষ্ট এবং তাঁহার লেখা এত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, আপনি শুনিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। এখন আমরা এ মোকদ্দমা আপনার অনুকূলে চালাইলে বড় সাহেব ছাড়িবেন না। সুতরাং বড় বিপদ। তবে টাকায় সকলই হয়, বড় সাহেবের বড় টাকার দরকার, টাকা দিতে পারেন, তবে সব ঠিক্ হয়। পুলিশের খাতায় এজাহার লেখা হইয়াছে, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রোজনামচা সাদা রাখা গিয়াছে সুতরাং দেখুন টাকা দিলে, যাহা চান, তাই করা যাইতে পারে; না দিলে উচিত কাজ হইবে, আপনি চিরদিনের জন্য যাবেন।"

কুটচক্রী বঙ্গচন্দ্র জানেন যে এত টাকা দেওয়া অসম্ভব। তথাপি একটু সাহস সহকারে বলিলেন "মহাশয় ধর্ম্মত বলিতে পারি এজাহারের কথা মিথ্যা নয়। যদি পুলিশের তদারকে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়—তবে উপরে মাজিষ্ট্রেট্—তার উপরে শেষণ, তার উপরে হাইকোর্ট ত আছে—সে যা হউক, তজ্জন্য আমার কিছুই ভয় নাই। তবে টাকা চাহিতেছেন, সে কথা স্বতন্ত্র; সকলেই যখন উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন—তখন সকলেরই কিছু কিছু পাওয়াই উচিত—আর আমার মুনীবেরও তজ্জন্য খোলা হুকুম রহিয়াছে—আমি ইচ্ছা করিলে নিজ ক্ষমতায়ই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারি—তবে কিনা আমাদের সকল প্রজা বিদ্রোহী; আজ ৩।৪ বৎসর কেবল ঘর থেকে সদর খাজনা ও আর আর নিত্য নৈমিত্তিক খরচ চলিতেছে—হঠাৎ আজ কালই যে একযোগে অত টাকা দিতে পারি, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে আজ পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিব—আর ৪৫০০০৲ হাজার টাকা তিন চার দিনের মধ্যে পাইবেন; কলিকাতার ব্যাঙ্ক হইতে

টাকা আনিতে হইবে। আমি তজ্জন্য আজই কর্ত্তার নিকট টেলিগ্রাফ পাঠাইব—টাকা সম্বন্ধে কোন গোল হইবে না—আপনারা এদিককার আপিস বহি দুরস্ত করিতে থাকুন।”

বঙ্গচন্দ্র মনে করিলেন উপর চাল চালিলাম—কিন্তু পুলিষ বড় শেয়ানা; তাহারা অনেক বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে কারবার করিয়া থাকে। যাহাহউক পুলিষ কর্ম্মচারির দল পরামর্শ করিয়া স্থির করিল তাড়াতাড়ির অত কি প্রয়োজন—টাকাটা হাতে আসুক না। খাতাপত্র রোজনামচা সকলইত আমাদের হাতে। সুতরাং অন্তত দুই তিন দিনের জন্য উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত রহিল।

কিন্তু এ দিকে উভয় দল হইতে প্রভূত বুদ্ধিবল—জ্ঞান-বল ও লোক-বল সম্পন্ন এক পরাক্রান্ত ব্যক্তি কি করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা এখনও জানিতে পারেন নাই। যাহা পোড়া দেশে এক প্রকার অসম্ভব তাহা তিনি করিয়াছেন—পুলিষে না জানিতে পারে—জমীদারে না জানিতে পারে—এরূপ ভাবে জেলার খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গোপনে আনাইয়াছেন।—যে ইংরেজ রজনীর তিমিরে লুকাইয়া রমার কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তিনিই মাজিষ্ট্রেট।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া রমার জবানবন্দী, রোগীর ক্ষত পরীক্ষা ও জবানবন্দী, হরানন্দের জবানবন্দী, তাহার স্ত্রীকন্যা ও দুলাল পাটনীর জবানবন্দী—ইহা ছাড়া প্রায় দুই শত ইতর ও ভদ্র সাক্ষির, (সংবাদ পাইলেই দুলাল পাটনীর বাড়ীতে যাইবে বলিয়া ইহারা মাধব কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল) সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন।

মাধব পুলিষের কুকীর্ত্তি এবং উপস্থিত মোকদ্দমার আরো প্রমাণ প্রদর্শন জন্য সাহেবকে লইয়া রজনীযোগে হঠাৎ থানায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই রোজনামচা ও পুলিষের অনুসন্ধান রিপোর্টের নকলাদি দেখিতে চাহিলেন। পুলিষ কর্ম্মচারী যাহা দেখাইল, তাহাতে সাহেব ক্রোধে দন্ত কটমট করিয়া বলিলেন “I shall send every one of you to Jail” ‘সব্বাইকেই জেলে দিব।’ পুলিষের বড় সাহেব পুলিষের দোষ ঘাড়ে লইয়া অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল কথাই মাধব সুতীব্র যুক্তি ও সুরসাল বক্তৃতায় খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মাধবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "You are a worthy fellow."—"তুমি দক্ষ লোক বট।"

এই সময়ে যে ব্যক্তি মাধবের আদেশানুসারে গ্রাম মধ্যে ছুটিয়াছিল, সে আরো অনেকগুলি সাক্ষী ও কৈলাস বাবুকে আনিয়া উপস্থিত করিল। এই ব্যক্তির নাম রামা চণ্ডাল—মাধবের একজন প্রধান সহায়। পাঠক ইহার নাম আরো অনেক বার শুনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা মাধবের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আর সন্দেহ রহিল না।

মাধবের কথামত সাহেব বঙ্গচন্দ্রের বাসায় গমন করিলেন, এবং তাহার ঘরের মাঝিয়া খুড়িয়া সেই সকল শোণিতযুক্ত বস্ত্র ও বিছানা বাহির করিলেন। বঙ্গচন্দ্রের হাতকড়ি দিয়া বান্ধিলেন। এবারে বঙ্গচন্দ্রের একবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

* * * *

মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই মকদ্দমার তদারক করিয়া, বড় সন্তুষ্ট হইলেন। কেন না তিনি পুলিষকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া এজন্য স্বয়ং বাহবা লইতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট অতি আনন্দে আসামী সাক্ষি ও পুলিষের লোক—অবশ্য পুলিষের সাহেবকে নয়—জেলায় চালান দিয়া স্বয়ং প্রস্থান করিলেন।

বিল্ব-পঞ্চানন।

কোনদেশে ছিল, এক তাঁতীর কুমার।
অতিশয় দৈনাবস্থা, আছিল তাহার॥
জাতীয় ব্যবসা নাহি, করিত সে জন।
বনে গিয়া করিত সে, কাষ্ঠ আহরণ॥
বাজারে বিক্রয় করি, যা কিছু পাইত।
স্ত্রীপুরুষ দুই জন, চলিয়া যাইত॥
এক দিন, তাঁতী-সুত, অরণ্যেতে গিয়া।
কুঠার স্কন্ধেতে বৃক্ষ, বেড়ায় খুঁজিয়া॥
বেলগাছ দেখি এক, করি মনোনীত।
কাটিতে লাগিল তাঁতী, হয়ে পুলকিত॥

বিল্ববৃক্ষে বাস করি, রন পঞ্চানন।
তন্তুবায়ে সম্ভাষিয়া, কহেন বচন॥
"ওহে ভাই, এই বৃক্ষে, নিবাস আমার।
ইহাতে করিও না ক, পাখুরা প্রহার॥
আরো ত অনেক তরু, আছে এই বনে।
কেটে লযে যাও তাই, প্রফুল্লিত মনে॥"
তাঁতী কহে, "কে হে তুমি? দেহ পরিচয়।"
শিব কন, "পঞ্চানন নাম মোর হয়॥"
এ কথায় তাঁতী জন, কহিতেছে বাণী!
"পঞ্চানন, 'ফঞ্চানন', আমি নাহি মানি॥
এই গাছে আমার, আছয়ে প্রয়োজন।
ইহাই কাটিব আমি, স্থির নিরূপণ॥"
এতবলি করে সেই, বাইশ প্রহার।
শিব কন "বর মাগো, তাঁতীর কুমার॥
কি আশয়ে, করিতেছ বৃক্ষের ছেদন।
মনের বাসনা মোরে, করহ জ্ঞাপন॥"
তাঁতী কহে, "তোমার, চালাকী দেহ রাখি।
তোমার ও সব কথা, গায়ে নাহি মাখি॥"
বাইশ প্রহার, সেই করে, পুনঃ পুনঃ।
ত্রিলোচন, কহিছেন, "ক্ষান্ত হও, শুন॥
প্রসন্ন তোমার পরে, হইলাম আমি।
মনোবাঞ্ছা, পুরাইব, হও বর-কামী॥"
তাঁতী কহে, "একান্তই, বর যদি দিবে।
অন্নের সংস্থান মোর, এখনি করিবে॥
পেটের দায়েতে শুধু, এই কর্ম্ম করি।
একদণ্ড সুখী নই, দুঃখ পেয়ে মরি॥"
এতবলি দাঁড়াইল তাঁতীর নন্দন।
বৃক্ষ হতে, শিলাখণ্ড, পড়িল তখন॥

চন্দ্রচূড়, কহিছেন, "শুন তাঁতী ভাই।
তোমার অন্নের কষ্ট, আর রবে নাই॥
স্নান করি আসি নিত্য, শিলাখণ্ডে কবে।
'ক্ষুধা পাইয়াছে মোর, অন্ন দিতে হবে॥'
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সহ, পাবে তুমি অন্ন।
দিলাম, এই ত শিলা, হইয়া প্রসন্ন॥"
তাঁতী কহে, "এইমত যদি নাহি হয়।
গাছ কেটে ফেলিবই, জানিও নিশ্চয়॥"
এতেক বলিয়া সেই, তাঁতীর নন্দন।
আপন আবাসে ফিরে, প্রফুল্লিত মন॥
স্নান করি শিলাখণ্ডে, কহিলেক বাণী।
'ক্ষুধা পাইযাছে মোর, ভাত দেহ আনি॥'
পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ভাত, সুবর্ণ থালায়
গৃহ মধ্যে তাঁতীজন, দেখিবারে পায়॥
স্ত্রীপুরুষ খায় দোঁহে, উদর ভরিয়া।
আহারান্তে গেল থালা অদৃশ্য হইয়া॥
এইরূপে, দুই মাস, থাকে তাঁতীজনা।
শালীর সম্বন্ধ তার, হইল যোটনা॥
সস্ত্রীক সে তাঁতীজন, ইহার কারণ।
শ্বশুর ভবনে সুখে, করিবে গমন॥
শিলা খানি বেখে যেতে, বিশ্বাস না হয়।
চোর এসে, ঘরে ঢুকে, পাছে হরি লয়॥
(চোর এসে শিলাখণ্ড, লইবেক হরি।
তন্তুবায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মরি ক্ষুরে মরি!॥)
এইরূপ মনে তর্ক, করি তাঁতীজন।
নাপিত বন্ধুর বাড়ী, করিল গমন॥
বলে, "ভাই, শালী-বিভা, উপলক্ষ্য করে।
জায়া সহ, যাব আজি, শ্বশুরের ঘরে॥

দুই দিন, আসিবাবে, বিলম্ব হইবে।
শিলাখণ্ড খানি মোর, যতনে রাখিবে॥
স্নান করি শিলাখণ্ডে, বলিও না বাণী।
'পাইয়াছে ক্ষুধা মোর, অন্ন দেহ আনি॥'
নাপিত বলিছে, "কেন, সে কথা বলিব?
তোমাব জিনিষ আমি, যতনে বাখিব॥"
মনে মনে, ভাবিলেক, সে নবসুন্দর।
এমনত বোকা নাহি, জগত ভিতর!
'হাবা তাঁতী' ব'লে, কথা জগতে প্রসিদ্ধ।
এ কথা নহেক মিথ্যা, বটে যুক্তিসিদ্ধ॥
হৃষ্টচিত্তে, তাঁতীপুত্র, যাইল চলিয়া।
অতঃপব যে ঘটনা, কহি বিস্তাবিয়া॥
স্নান কবি, আসিয়া সে, নাপিত-নন্দন।
শিলাখণ্ডে, "ভাত দেহ," কহিল বচন॥
পঞ্চাশব্যঞ্জন ভাত, দেখিলেক ঘবে।
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাইলেক, হরিষ অন্তবে॥
তাঁতীজনে, ফাকি দিতে, তখন ভাবনা।
অনুরূপ শিলা আনে, সে নাপিত জনা॥
সে তাঁতী তৃতীয় দিনে, উপনীত আসি।
চাহিল প্রস্তব খানি, নাপিতে সম্ভাষি॥
ঝুটা শিলা, আনি সেই, নাপিত তখন।
তাঁতী-জোলা হাতে তাহা, করিল অর্পণ॥
শিলা পেয়ে, তাঁতীজন, ফিরে গেল ঘরে।
স্নান করি আসি, অন্ন আকিঞ্চন করে॥
পূর্ব্বমত অন্ন আর, ঘরে না দেখিয়া।
পঞ্চাননঁ উপরেতে, উঠে সে রুষিয়া॥
বলিতেছে, "মোর সঙ্গে, পেয়েছ তামাসা।
উঠাইব আজি তোব, বেল গাছে বাসা॥"

বাইশেতে ধার করি, সে তাঁতী তখন।
বেলগাছ কাটিবারে, করিল গমন॥
গপাগপ্ কোপ তাঁতী, বেলগাছে মারে।
শঙ্কর শিহরি কন, তাঁতীর কুমারে॥
"কি লাগিয়া গাছে কোপ, মারিছ আবার ?"
তাঁতী কহে, "মোর সঙ্গে, চালাকী তোমার ?॥"
বিভূতি-ভূষণ কন, "বলহ ভাঙ্গিয়া।"
তাঁতী কহে, "বেলগাছ, ফেলিব কাটিয়া॥"
শিব কন, "বাক্যে, মোর, দেহ তুমি কর্ণ।
এই গাভী লয়ে যাও, নাদিবেক স্বর্ণ॥
স্বর্ণ বিক্রয়েতে তুমি, মহাধনী হবে।
এরূপ দুঃখের দশা, আর নাহি রবে॥"
ক্ষান্ত দিয়া, তাঁতীসুত, গাভী লয়ে যায়।
হইতে লাগিল নিত্য, স্বর্ণ লাভ তায়॥
মাসেক দুমাস পরে, পুনঃ তাঁতীজন।
সস্ত্রীক শ্বশুরালয়, করিল গমন॥
নাপিত নিকটে গেল, গাভীটী রাখিয়া।
'নাদিতে কহে না যেন, নিষেধ করিয়া॥
তন্তুবায় চলে গেল, নাপিত-নন্দন।
নাদিবারে, সে গাভীরে, করে আকিঞ্চন॥
স্বর্ণনাদ দরশন, করিয়া নাপিত।
ধনাঢ্য হইবে ভাবি, হলো পুলকিত॥
অনুরূপ গাভী এক কিনিয়া বাধিল।
তাঁতী এলে, সেই গাভী, প্রদান করিল॥
নাদ-আকিঞ্চনে, তার গোবর দেখিয়া।
একেবারে তাঁতীসুত, উঠিল জ্বলিয়া॥
রাগেতে তাহার অঙ্গ, থর থর কাঁপে।
বলে, "আজি বেলগাছ, রাখে কার বাপে॥"

দুই দিন, আসিবারে, বিলম্ব হইবে।
শিলাখণ্ড খানি মোর, যতনে রাখিবে॥
স্নান করি শিলাখণ্ডে, বলিও না বাণী।
'পাইয়াছে ক্ষুধা মোর, অন্ন দেহ আনি॥'
নাপিত বলিছে, "কেন, সে কথা বলিব?
তোমার জিনিষ আমি, যতনে রাখিব॥"
মনে মনে, ভাবিলেক, সে নরসুন্দর।
এমনত বোকা নাহি, জগত ভিতর!
'হাবা তাঁতী' ব'লে, কথা জগতে প্রসিদ্ধ।
এ কথা নহেক মিথ্যা, বটে যুক্তিসিদ্ধ॥
হৃষ্টচিত্তে, তাঁতীপুত্র, যাইল চলিয়া।
অতঃপর যে ঘটনা, কহি বিস্তারিয়া॥
স্নান করি, আসিয়া সে, নাপিত-নন্দন।
শিলাখণ্ডে, "ভাত দেহ," কহিল বচন॥
পঞ্চাশব্যঞ্জন ভাত, দেখিলেক ঘরে।
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাইলেক, হরিষ অন্তরে॥
তাঁতীজনে, ফাকি দিতে, তখন ভাবনা।
অনুরূপ শিলা আনে, সে নাপিত জনা॥
সে তাঁতী তৃতীয় দিনে, উপনীত আসি।
চাহিল প্রস্তর খানি, নাপিতে সম্ভাষি॥
ঝুটা শিলা, আনি সেই, নাপিত তখন।
তাঁতী-জোলা হাতে তাহা, করিল অর্পণ॥
শিলা পেয়ে, তাঁতীজন, ফিরে গেল ঘরে।
স্নান করি আসি, অন্ন আকিঞ্চন করে॥
পূর্ব্বমত অন্ন আর, ঘরে না দেখিয়া।
পঞ্চাননী উপরেতে, উঠে সে রুষিয়া॥
বলিতেছে, "মোর সঙ্গে, পেয়েছ তামাসা।
উঠাইব আজি তোর, বেল গাছে বাসা॥"

বাইশেতে ধাব করি, সে তাঁতী তখন।
বেলগাছ কাটিবারে, করিল গমন॥
গপাগপ্ কোপ তাঁতী, বেলগাছে মারে।
শঙ্কর শিহরি কন, তাঁতীর কুমারে॥
"কি লাগিয়া গাছে কোপ, মারিছ আবার?"
তাঁতী কহে, "মোর সঙ্গে, চালাকী তোমার?॥"
বিভূতি-ভূষণ কন, "বলহ ভাঙ্গিয়া।"
তাঁতী কহে, "বেলগাছ, ফেলিব কাটিয়া॥"
শিব কন, "বাক্যে, মোর, দেহ তুমি কর্ণ।
এই গাভী লয়ে যাও, নাদিবেক স্বর্ণ॥
স্বর্ণ বিক্রয়েতে তুমি, মহাধনী হবে।
এরূপ দুঃখের দশা, আর নাহি রবে॥"
ক্ষান্ত দিয়া, তাঁতীসুত, গাভী লয়ে যায়।
হইতে লাগিল নিত্য, স্বর্ণ লাভ তায়॥
মাসেক দুমাস পরে, পুনঃ তাঁতীজন।
সস্ত্রীক শ্বশুরালয়, করিল গমন॥
নাপিত নিকটে গেল, গাভীটী রাখিয়া।
'নাদিতে কহে না যেন, নিষেধ করিয়া॥
তন্তুবায় চলে গেল, নাপিত-নন্দন।
নাদিবারে, সে গাভীরে, কবে আকিঞ্চন॥
স্বর্ণনাদ দরশন, করিয়া নাপিত।
ধনাঢ্য হইবে ভাবি, হলো পুলকিত॥
অনুরূপ গাভী এক কিনিয়া রাখিল।
তাঁতী এলে, সেই গাভী, প্রদান করিল॥
নাদ-আকিঞ্চনে, তার গোবর দেখিয়া।
একেবারে তাঁতীসুত, উঠিল জ্বলিয়া॥
রাগেতে তাহার অঙ্গ, থর থর কাঁপে।
বলে, "আজি বেলগাছ, রাখে কার বাপে॥"

বাইশ চুকায়ে তাঁতী, মহা রুষ্ট মনে।
বেলগাছ কাটিবারে, দ্রুত গেল বনে॥
বৃক্ষেতে বাড়িল কোপ, তাঁতীর নন্দন।
শিব কন, "পুনঃ বাপু কিসের কারণ?
তাঁতী কহে, "তামাসা, পেয়েছ বারবার।
বেলগাছে বাসা আজি, উঠাব তোমার॥"
শিব কন, "ওহে বাপু, না করিও কোপ।
বৃক্ষের মূলেতে আর না মারিও চোপ॥"
"কোন কথা শুনিব না," কহে তাঁতীজন।
"আজি বেলগাছ আমি, করিব ছেদন॥"
কহিছেন মহাদেব, "এই যষ্টি লও।
করিতে ইহার কাম, বাড়ী গিয়া কও॥"
আশা পেয়ে তাঁতী, যষ্টি ঘরে লয়ে গিয়া।
করিতে তাহার কাম, কহে সম্ভাষিয়া॥
সে কথায় লাঠি পড়ে, দমাদম্ ঘাড়ে।
"বাপ রে গেলাম বলে, তাঁতী ডাক ছাড়ে॥
স্বামীরে বিপদাপন্ন, নিরখি তখন।
তাঁতী-জায়া, ছুটে এল, ব্যাকুলিত মন॥
তখন তাঁতীর নিজ, বিপদ ঘুচিল।
তাঁতীরে ছাড়িয়া তার, জায়ারে ধরিল॥
মারের চোটেতে ধনি, কান্দিয়া ব্যাকুল।
এ বিপদ সাগরের, দেখিল না কূল॥
'চাচা গো আপন বাঁচা,' আছে এক কথা।
তাঁতীর সম্বন্ধে তাহা, ঘটিলেক তথা॥
স্ত্রীর দশা কি হইবে, কেবা তার ভাবে?
আপনি বাঁচিলে, পিতৃনাম রক্ষা পাবে॥
পুন লাঠী, তারে ধোঁকে, এই ভাবনায়।
বাটী থেকে বা'র হয়ে, ছুটে সে পলায়॥

আপনার প্রাণ চেয়ে, কিছু প্রিয় নাই।
'মহাবিঘ্নে' দম্পতির, প্রেম টের পাই॥
লোকত, ধর্ম্মত, তাঁতী, সেই অবকাশে।
অরণ্যের অভিমুখে, ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
বিল্ব-বৃক্ষ-তলে গিয়া, কহিছে কান্দিয়া।
"রক্ষা কর পঞ্চানন! গেলাম মরিয়া॥
যষ্টির আঘাতে জায়া, মৈল এতক্ষণ।
ছুটিয়া এসেছি প্রভো, করিতে জ্ঞাপন॥
দোষ বহু করিয়াছি, ক্ষম নিজ গুণে।"
দয়াময় কন তারে, এই কথা শুনে॥
"ভয় নাই, তন্তুবায়, ঘরে যাও চলে।
নাপিত-আলয়ে লাঠী, রাখ 'তাই' বলে॥"
এ কথায় আবাসে, ফিরিয়া তাঁতীজন।
লাঠী লয়ে, যাইলেক, নাপিত সদন॥
যে কথা বলিতে হবে, বলে তারে দিয়া।
সট্‌করে, তাঁতীজন, পড়িল সরিয়া॥
দুইবারে, নাপিতের বাড়িয়াছে লোভ।
জানে না যে অদৃষ্টেতে তোলা আছে "ক্ষোভ॥"
বার বার লোভ করে বনে গেছে বুক।
জানে না যে তোলা আছে, "ধর্ম্মের চাবুক॥"
খেয়ে খেয়ে, সোণা পেয়ে, নামিয়াছে ভুঁড়ি।
ঠিক যেন, দুগ্ধ এক, তেঁতুলের গুঁড়ি॥
মোটা হয়ে গেছে বুদ্ধি, দেহের মতন।
সাদরে সে লাঠী করে, লন যাদুধন॥
নাপিতেরে যষ্টি দিয়া, তাঁতী দৌড় মারে।
তাঁতী গেলে, নাপিত হুড়্‌কা দিল দ্বারে॥
যষ্টি পেয়ে, অতিশয়, হয়ে হরষিত।
"করিতে তাহার কাম," কহিল নাপিত॥

এ বাবেতে নাপিতের, লাভ বিলক্ষণ।
বুকে, পিঠে, মাথে, লাঠী পড়ে ঘনে ঘন॥
উচ্চৈঃস্বরে কহে 'নাই', কান্দিতে কাঁন্দিতে।
'রক্ষা কর, মরিলাম, কে আছ বাড়ীতে॥"
ভীমমত, দুই পুত্র, তার বলবান।
পিতার সাহায্যে তারা, হলো আগুয়ান॥
নাপিতের পুত্রদ্বয়ে, যষ্টি তবে দেখে।
দুজনে বেদম মারে, নাপিতেরে রেখে॥
তন্তুবায় ঘরে রহে, করি কাণ খাড়া।
কখন নাপিতালয়ে, পাবে কান্না সাড়া॥
কাণ পেতে, বেশী ক্ষণ, হয়নি থাকিতে।
অচিরেই, মহাকান্না, পাইল শুনিতে॥
স্ত্রীপুরুষে আদ মরা, হইল আসিয়া।
ঘরেতে রহিল বসি, দ্বারে খিল দিয়া॥
'যত হাসি, তত কান্না,' বেদের বচন।
শেষে হাসি হইলেই, সুখের কারণ॥
পূর্ব্বে যত কেন্দে ছিল, দুঃখ-নীরে ভাসি।
নাপিতের দুঃখ হেরে, এবে তত হাসি॥
হাসি, কান্না লয়ে আর, হেথা থাকা নয়।
কি কাণ্ড ঘটেছে দেখি, নাপিত নিলয়॥
মহা কোলাহল সেই, নাপিতের বাড়ী।
গিন্নী, পুত্রবধূগণ, এলো কর্ম্ম ছাড়ি॥
নাতি, নাত্নী, যে যে থানে, ছিল সে বাড়ীতে।
সকলেই ছুটে এল, সে কাণ্ড হেরিতে॥
দেখিয়া লাঠীর বুক, আরো বনে' যায়।
লাগিল বিষম রোকে, মারিতে সবায়॥
গোষ্ঠী শুদ্ধ মারা যায়, উপক্রম দেখে।
তাঁতী বাড়ী ছুটে নাই, সব ফেলে রেখে॥

বলে, "ভাই, গাভী, শিলা, দিতেছি তোমার।
ঝাড়ে বংশে, লাঠী খেয়ে, মরিল আমার॥
প্রতারণা করেছিনু, আচ্ছা তার ফল।
কি আছে উপায় ভাই, বাঁচি কিসে বল্?"
বোকা তাঁতী, এবারেতে, হয়েছে শেয়ান।
বলে, "তবে, গাভী, শিলা, এখনই আন্॥"
তাঁতীর প্রস্তাবমত, গাভী, শিলা, দিল।
নিজ গাভী লয়ে যেতে, কিন্তু না ভুলিল॥
আদমরা নাপিতের, পরিবারগণ।
'নিজ কাম করি' যষ্টি, আইল তখন॥
দৃঢভক্তি তাঁতীর, হইল পঞ্চাননে।
শিলা, গাভী, পেয়ে হলো, পুলকিত মনে॥
শিব হইলেক তার, শিবের ইচ্ছায়।
ঘুচিয়া যাইল তাব, দৈন্যদশা তায়॥
আমাদের সদা, শিব-কামনা যাঁহার।
এস সবে তাঁর পদে, করি নমস্কার॥
তাঁহার করুণা হলে, যাব মোক্ষধাম।
দিবানিশি, এস সবে, করি শিব-নাম॥

শ্রীরাধাজীবন রায়।

ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার ও গামার ভারতে আগমন।

ইয়ুরোপীয় জাতীর মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। অতি প্রাচীন কালে রোমান প্রভৃতি কতিপয় জাতি স্থল পথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত। কিন্তু ক্বচিৎ তাঁহারা এদেশে আসিতেন। ভারতের পণ্য এসিয়া-মাইনরে নীত হইত; এবং রোমানেরা এসিয়া-মাইনর হইতে সেই দ্রব্য স্বদেশে লইয়া যাইত। এইরূপে প্রথমত ইয়ুরোপ ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের বিষয় জ্ঞাত হয়। সেই অবধি য়ুরোপীয়ারা ভারতবর্ষের এই বিপুল বিভবের জন্য লালায়িত। কেবল লাঞ্ছনা সহ্য করাইবার জন্য বুঝি প্রকৃতি ভারতকে আপনার ধন ভাণ্ডার ও ধান্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। হায়! যদি স্বর্ণপুরীর পরিবর্ত্তে ভারত পাষাণময় হইত, যদি রত্নপ্রসূ না হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইত, যদি অনায়াস লভ্য সুখ সেব্য দ্রব্যাদি না পাইয়া ভারতবাসীকে উদরান্নের জন্য অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা হইলে হয়ত আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। যদি নির্ধন হইয়াও ভারত সন্তান স্বদেশকে স্বদেশ বলিতে পারিতেন, তাহা হইলেও আজ তাঁহাদের সুখের বাসনা একেবারে উৎপাটিত হইত না। এখন আমরা মাতৃভূমিকে আপনার বলিতে ভয় করি; আমাদের গৃহ থাকিয়াও নাই—আমরা আশ্রয় দান করি, আমাদের আশ্রয় নাই।

য়ুরোপে পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্ব প্রথমে নৌ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে; কোম্পাস সৃষ্টির পর সমুদ্র পথে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইল। কলম্বসের কৃতকার্য্যতায় নাবিকদিগের মনে অধিকতর সাহসের সঞ্চার হইল। সকলেই স্ব স্ব ব্যয়ে জাহাজ প্রস্তুত ও সজ্জা করিতে লাগিল। কেহই ভাবে নাই যে নৌবিদ্যায় পর্ত্তুগাল অপরাপর য়ুরোপীয় জাতির সহিত সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ইহারাই নৌবিদ্যায় উচ্চতম যোগ্যতা লাভ করিল।

পর্ত্তুগাল-রাজ দ্বিতীয় জন সর্ব্ব প্রথম আফ্রিকা মহাদেশ বেষ্টন করিয়া

আসিবার জন্য প্রভৃত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাও অনেকে অনেকবার দেশ আবিষ্কারের নিমিত্ত তরী সজ্জা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উদ্যম নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। বারথোলোমিউ ডায়াজ নামক জনৈক কাপ্তেনের হস্তে জন তিন খানি জাহাজের ভার ন্যস্ত করিলেন। ১৪৮৬ খ্রীঃ ডায়াজ পর্ত্তুগাল হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি আফ্রিকার চারিটী নিগ্রো স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে মনোহর পরিচ্ছদে ও বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। যেস্থানে তাঁহার জাহাজ লাগিত, সেই স্থানে তাহাদিগের একটীকে নামাইয়া দিতেন; এইরূপে তাহারা পর্ত্তুগালের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের মহিমা প্রচার করিত।* তিনি অনেক ভূভাগ আবিষ্কার করিলেন; কঙ্গো হইতে ১৮০ ক্রোশ দূরে সেণ্ট য়াগো নামক স্থানে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিলেন; তিনি ল্যাণ্ডিং, আইলস্, ওয়াইভিংস্ উপসাগর পার হইয়া চলিলেন। পরিশেষে প্রবল বায়ু বশাৎ তাঁহার জাহাজ সকল দক্ষিণাভিমুখে চালিত হইল, স্থলভাগ হইতে বহুদূরে যাইয়া পড়িল—বোধ হইল, যে আর রক্ষা নাই; তাঁহার ক্ষুদ্র তরী সমূহ তরঙ্গ গর্ভে প্রবেশ করিবে। পুনশ্চ এতাবৎকাল তিনি উপকূলের উষ্ণ বায়ু সেবন করিতে ছিলেন, এখন আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের প্রখর শীতল বায়ু তাঁহাদের কলেবর কম্পিত করিতে লাগিল। তাঁহাদের আশঙ্কা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল, এবং জীবনের আশা আর রহিল না। কিন্তু ত্রয়োদশ দিবস অতীত হইলে প্রকৃতি পুনর্ব্বার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল—পুনরায় তরঙ্গ-বিক্ষোভিত অর্ণব বক্ষঃ সংহারমূর্ত্তি সম্বরণ করিল। ডায়াজ ও তাঁহার নাবিকেরা স্থল প্রাপ্তির আশায় পূর্ব্বাভিমুখে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন: কিন্তু অনবরত জাহাজ চালাইয়াও স্থলভাগ তাঁহাদের নয়ন গোচর হইল না, কেবল সমন্তাৎ নীলাম্বুরাশি ও নীল-নভোমণ্ডল। ভীত হইয়া উত্তরদিকে জাহাজের মুখ ফিরাইলেন, এবং অবশেষে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে বহুদূরে এক প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই উপসাগরের নাম "গাভী উপসাগর" রাখিলেন। পুনরপি ডায়াজ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে উপনীত হইয়া তথায়

* Murray's History of British India.

আর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ রোপণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নাবিকদিগের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখা দিল; স্বদেশ প্রত্যাগমনের নিমিত্ত তাহারা জেদ করিতে লাগিল। তাহাদের খাদ্যদ্রব্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহাদের আবিষ্ক্রিয়াও নিতান্ত ন্যূন হয় নাই। ইতি পূর্ব্বে উপকূল উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু এখন পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দেখিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, যে মধ্যে অবশ্য কোন অন্তরীপ থাকিবে। এই অন্তরীপ আবিষ্কার করিলেই তাহাদের নাম চিরস্থায়ী হইবে। সকলেই এই প্রকার জেদ করাতে ডায়াজ অনন্যোপায় হইয়া অনিচ্ছায় গৃহাভিমুখে জাহাজ ফিরাইলেন এবং অল্প দিন পরেই তাঁহারা সেই বহুকালের কল্পিত অন্তরীপে উপনীত হইলেন। ডায়াজ ইহার "প্রভঞ্জন অন্তরীপ" নাম রাখিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর, রাজা জন ইহার "উত্তমাশা অন্তরীপ" নাম রাখিলেন এবং অদ্যাপিও এই অন্তরীপ উক্ত নামে খ্যাত।

যৎকালে আটলাণ্টিক মহাসাগর পথে ডায়াজকে প্রেরণ করেন, তৎকালে রাজা জন পিড্রো কবিল্‌হ্যাম ও এলোন্সো ডি পায়ব নামক দুই ব্যক্তিকে লোহিতসাগর পথে প্রেরণ করেন। এলোন্সো ঈজিপ্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু কবিল্‌হ্যামের চেষ্টা ফলবতী হইল। তিনি কানানোর, কালিকট, গোয়া এই তিনটী নগর দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি আবিসিনিয়ার রাজা প্রেষ্টর জনের সভায় উপস্থিত হইলে, তথায় বহুল সম্মান পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ দেশের পদ্ধতি অনুসারে স্বদেশ প্রত্যাগমনে অনুমতি পাইলেন না। স্বীয় রাজাকে ভ্রমণবৃত্তান্ত সমস্ত লিখিয়া পাঠান।

জনের রাজত্বকালে আর নূতন তরীসজ্জা হইল না। তিনি ১৪৯৫ খ্রীঃ কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর ইমানুয়াল পর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি অধিকতর উদ্যম সহকারে আয়োজন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সচিববর্গ তাঁহাকে নিরস্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন; তথাপি তিনি নবীন আশায় উত্তেজিত হইয়া অতীব আগ্রহের সহিত সজ্জা করিতে লাগিলেন। অর্ণবযান নির্ম্মাণের ভার ডায়াজের উপর

অর্পিত রহিল; কিন্তু বাস্কো ডি গামা নামক জনৈক রাজবংশ সম্ভূত নৌবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির হস্তে জাহাজের অধ্যক্ষতা ন্যস্ত হইল।

১৪৯৭ খৃঃ ৮ই জুলাই তারিখে শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভমন্ত্রে বিশুদ্ধ হইয়া সাশ্রুলোচনে স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পৌরজনকে কাঁদাইয়া, গামা ও তাঁহার ভ্রাতা পলো ও নাবিকগণ তরী আরোহণ করিলেন। তাঁহাদের সহিত তিনখানি জাহাজ ছিল; সেণ্ট গেবিএল ও সেণ্ট রাফিল নামক দুইখানি বৃহদাকার ও বেরিও নামক একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন। তাঁহাদের গতি অপ্রতিহত হয় নাই; প্রতিকূল বায়ুবশে জাহাজের গতি রোধ হইতে লাগিল। চারিমাস অতীত হইল, তথাচ গামা উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছিতে পারিলেন না। এই সময়ে জল সংগ্রহ ও জ্যোতিষিক পরিদর্শন মানসে একটি উপদ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন ও ইহার নাম সেণ্টহেলেনা রাখিলেন। তীরে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা দুইজন নিগ্রোকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিলেন। কিন্তু তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চলিবার কোন উপায় ছিল না। তাহারা ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইলে, গামা তাহাদিগের প্রতি বন্ধুতা ভাব প্রদর্শন করিলেন ও ভোজন করাইবার জন্য তাঁহার দুইজন নিগ্রো ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। পান ভোজনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাহাদের আশঙ্কা অপসৃত হইল, এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আপনাদের বাসস্থান একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিয়া দিল। আর্ণ্যাণ্ডো বেলোসো নামক জনৈক পর্ত্তুগীস তথায় যাইয়া গ্রামবাসীদের রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার অনুমতি পাইলেন। প্রথমে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল; কিন্তু বৈরভাবের সন্দেহ হওয়ায় তিনি ধাবমান হইলেন এবং গ্রামবাসীরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তিনি নৌকায় আসিয়া আরোহণ করিলেন; তাঁহার মাঝিরা দুই একজন আঘাত পাইয়াছিল।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া গামা দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। গভীর সুনীল আদৃষ্টি বিস্তৃত অর্ণবের উপর দিয়া জাহাজ হেলিতে দুলিতে তরঙ্গমালা উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। আশা ও ভয় ক্রমান্বয়ে গামার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮ নবেম্বর উত্তমাশা অন্তরীপ

তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, বিপদ পাতের আশঙ্কায় নাবিকেরা অতি-মানুষিক সাহসে আপনাদের হৃদয় বদ্ধ করিল। কিন্তু তাহাদিগের আশঙ্কা শীঘ্রই তিরোহিত হইল। দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে মৃদু মন্দ বায়ু সঞ্চারে জাহাজ বাহির সমুদ্র দিয়া চলিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে সেই ভীতি উৎপাদক অন্তরীপ তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। নাবিকদিগের হৃদয় আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল এবং তাহাদের আনন্দধ্বনি ও গগনস্পর্শী তুরী নিনাদ দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিল। এই ঘটনায় য়ুরোপের সৌভাগ্য লক্ষ্মী অচলা হইল, ও য়ুরোপের বাণিজ্য নূতন বলে বলীয়ান হইল। এতদিন গামা যাহা জনরবে শুনিয়াছিলেন, এখন তাহা চক্ষে দেখিলেন। কিন্তু তথায় প্রকৃতির ভীষণ আকৃতি কিছুই দেখিলেন না। জনশ্রুতি উত্তমাশা অন্তরীপে যে নানাপ্রকার বিভীষিকা আরোপ করিত, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কিন্তু কথিত আছে যে তিনি এই স্থানে এক অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি জলধির উপর দণ্ডায়মান এক দেবাকৃতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন।* দৃশ্য আর একবার মাত্র আর এক মহাত্মার নয়নে পতিত হইয়াছিল; রোমান রাজ্য আক্রমণ মানসে যখন জুলিয়স্ সীজর রুবিকন উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায়ে প্রত্যূষে ইহার তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং রুবিকন পার হইবেন কি না, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক দেবমূর্ত্তি একখণ্ড উচ্চ ভূমিতে উপবেশন করিয়া বংশী বাদন করিতেছে। সীজার ইহারদিকে যাইবামাত্র ইহা জলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সন্তরণ দিয়া অপর পারে উঠিল এবং উষার ক্ষীণালোকে মিশাইয়া গেল। জুলিয়স ইহাকে দৈব ঘটনা মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ রুবিকন পার হইলেন। বাস্কো ডি গামার অদৃষ্টেও এইরূপ মনোহর মূর্ত্তি দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। গামা দেখিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ এক উন্নত শৈলখণ্ড; নানা জাতীয় বনরাজি উপকূলকে মনোহর নয়নরঞ্জন হরিদ্বর্ণে সুশোভিত করিয়াছে; বিবিধ প্রকার চতুষ্পদেরা শ্যামল মালভূমিতে বিচরণ করিতেছে, সম্মুখে ভারতসাগর; তাহার সীমা নাই, কেবল চতুর্দ্দিকে অম্বুরাশি সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু গামা এস্থানে জাহাজ লাগাই-

* According to the narrative of Camoeus.

লেন না, ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে সান ব্লাস (মোসল) উপসাগরে উপস্থিত হইলে, তথায় জল ও খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত নঙ্গর করিলেন। জাহাজ তীরে লাগিবামাত্র তাঁহারা দেখিলেন যে ৯০ জন নিগ্রো নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি আসিয়া দর্শন দিল। গামা তাঁহার নাবিক-দিগকে অতি সাবধানে কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি খেলানা ফেলিয়া দিবামাত্র উহারা নিশঙ্কচিত্তে জাহাজের নিকট আগমন করিল ও যুরোপীয় খেলানা দেখিয়া মোহিত হইয়া তদ্বিনিময়ে আপনাদের পশু দিতে স্বীকার করিল। এইরূপে বিনিময় কার্য্যে ও নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদে তিন দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের মধ্যে বৈরভাবসূচক সন্দেহের কারণ দেখা গেল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহারা দলে দলে নানা স্থানে গোপন ভাবে থাকিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে গামা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া গুলি ছুড়িয়া ভয় দেখাইলেন ও তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ছিলেন। এই ঘটনার পর অবিলম্বে গামা সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে ভীষণ-বেগে প্রভঞ্জন আসিয়া দর্শন দিল। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই অজ্ঞাত বারি-রাশির মধ্যে কোন বিপদে পতিত হন নাই। অকস্মাৎ এইরূপ বিপৎপাতে তাঁহাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল; আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় অব-লম্বন না করিয়া, কেবল বিপদ ভঞ্জন, বিঘ্ন হারী জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, প্রলয় থামিল—জাহাজ সকল রক্ষা পাইল।

নেটাল উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা একটি স্নিগ্ধ-সলিলা নদী দেখিতে পাইলেন, এবং সেই নদীমুখে নঙ্গর করিলেন। তীরে অবতরণ করিয়া বহু সংখ্যক তদ্দেশীয় লোক দেখিতে পাইলেন, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। ইহাদের বসন ভূষণ দর্শনে নিগ্রোদিগের অপেক্ষা ইহাদিগকে সভ্য বলিয়া প্রতীতি হইল। এই স্থান অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান; এবং তন্নিমিত্তই অত্রত্য অধিবাসীরা শ্রমশীল। ইহাদের সুন্দর আচার ব্যবহার, সভ্য জাতির রীতি নীতি অপেক্ষা নিন্দনীয় নহে। মার্টিন এলোন্সো নামক একজন নাবিক কোন প্রকারে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইলে, তাহারা

তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল। তিনি তাহাদের গ্রামে গমন করিলেন। গৃহ সকল খড়ের নির্ম্মিত, কিন্তু উত্তমরূপে সজ্জিত। এতদ্দর্শনে প্রতীয়মান হইল—যে তাহারা সভ্য জীবনের সুখ ও সচ্ছন্দতায় বঞ্চিত ছিল না। অধিবাসীরা এলোঙ্গোর অভ্যর্থনা করিতে কোনই ত্রুটি করিল না; পর দিবস দুই শত অনুচর সমভিব্যাহারে জাহাজে পাঠাইয়া দিল। তৎপরে তাহাদের দলপতি অনুচরবর্গের সহিত জলযান সন্দর্শনে আসিলেন। এইরূপ সৌম্যভাবে পাঁচ দিন অতীত হইলে, গামা সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রীত হইয়া সেই নদীকে শান্তিময়ী আখ্যা প্রদান করিলেন (River of peace).

এই সময়ে স্থলভাগ ক্রমশ পশ্চিম দিকে বক্রভাব ধারণ করাতে কোন অপবিজ্ঞাত হ্রদমধ্যে বেষ্টিত হইবার আশঙ্কায় বাহির সমুদ্র দিয়া জাহাজ চালাইবার আদেশ দিলেন; সামুদ্রিক স্রোতও তাঁহার প্রতিকূলে ছিল। বাহির সমুদ্রে যাওয়ায় সোফালা আবিষ্কার তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। কিয়দ্দিবস অন্তরে পুনশ্চ এক নদীমুখে উপস্থিত হইলেন। তথায় দুকূলবাস ও নীলবর্ণ কার্পাস বস্ত্র পরিহিত লোক দেখিতে পাইলেন। গামার সহিত মার্টিন নামে এক দোভাষী ছিল। অধিবাসিরা মার্টিনের সহিত আরবী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইল। ইহাদের নিকট গামা অবগত হইলেন, যে পূর্ব্বদেশ হইতে শ্বেতকায় এক জাতি সর্ব্বদা বাণিজ্যার্থ পর্ত্তুগীসদিগের ন্যায় অর্ণবপোতে যাতায়াত করিয়া থাকে। এই সংবাদে গামার হৃদয় আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল; প্রাচ্য সভ্যতা যে য়ুরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা তৎকালে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল, অনতিবিলম্বে সভ্যতার সমভূমিতে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহারা পোত সকলের জীর্ণ সংস্কার করিবার মানসে এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু এই সময়ে দৈব দুর্ঘটনাবশত তাঁহার হর্ষে বিষাদ হইল। স্কার্ব্বি নামে এক প্রকার অভিনব অশ্রুতপূর্ব্ব রোগ তাঁহার নাবিকদিগকে আক্রমণ করিল; অনেকে ইহাতে কালগ্রাসে পতিত হইল, এবং সৌভাগ্যক্রমে অনেকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ও বলকারক আহার প্রাপ্তে স্বাস্থ্য লাভ করিল।

১৪৯৮ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারি তিনি এই স্থান হইতে যাত্রা করিলেন;